ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ
আল-গাযালি (র)-এর অমর রচনা

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন

১১

কৃপণতা-ধনাসক্তি ও অহংকার-আত্মপ্রীতি

ভাষান্তর

মুফতি নূরে আলম

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

কৃপণতা-ধনাসক্তি ও অহংকার-আত্মপ্রীতি

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১১

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ
ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮ - ১১১১ খ্রি.)

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

ভাষান্তর
মুফতি নূরে আলম
সাবেক মুহাদ্দিস, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া,
ত-ব্লক, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬

দারুত তাকবীর

কৃপণতা-ধনাসক্তি ও অহংকার-আত্মপ্রীতি

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১১

ISBN No : 978-984-558-026-7

প্রকাশক
প্রকৌ. মেহেদী হাসান
দারুত তাকবীর
৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা)
ভি আই পি রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

রচনা
ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে
মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮-১১১১ খ্রি.)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ডক্টর এম. শরীফ উল আলম

নিরীক্ষণ ও সম্পাদনা
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
লেখক ও সম্পাদক, দারুত তাকবীর

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
জিলহজ ১৪৪১ হিজরি
শ্রাবণ ১৪২৭ বাংলা

ভাষান্তর
মুফতি নূরে আলম
সাবেক মুহাদ্দিস, জামিয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া,
ত-ব্লক, মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬

প্রচ্ছদ ডিজাইন
দারুত তাকবীর ডিজাইন সেকশন

স্বত্ব : সংরক্ষিত

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২৬০.০০ (দুইশত ষাট টাকা মাত্র)

সতর্কীকরণ

প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের যেকোনো অংশ
পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো সম্পূর্ণ বেআইনি

KRIPONOTA-DHONASOKTI O OHONKAR-ATTOPRITI (Ihyau Ulumiddeen Series, V. : 11), Written by Emam Gazali (R), Translated by Mufti Nure Alom, Published by Eng. Mehedi Hasan. Darut Takbeer, Corporate Office : 30/A Sattara center (14th Floor), V.I.P Road, Naya Paltan, Dhaka-1000, Phone : +8809610666006, 01938-855992,01938-855979, 01991-181204, E-mail : info@daruttakbeer.com, Website : www.daruttakbeer.com, Publishing Date : August 2020, **Price : 260.00** Taka Only.

প্রকাশকের কথা

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' বাংলা অনুবাদ দশম খণ্ডের সফল প্রকাশের পর একাদশ খণ্ড প্রকাশ পেতে যাচ্ছে।

ইতঃপূর্বে সংক্ষিপ্ত আকারে এ গ্রন্থ বাংলাভাষায় প্রকাশিত হলেও এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ হচ্ছে। এজন্য মহান আল্লাহর শোকর আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ!

মহান আল্লাহ মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর বুকে তাঁরা দীন-শরিয়ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মানুষকে তাঁর প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমনের মধ্য দিয়ে নবী ও রাসূল আগমনের ধারার সমাপ্তি ঘটেছে।

নবীদের পর উম্মতের পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ওলামায়ে কেরামকে। সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ-সহ আলেম সমাজ সর্বযুগে এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁদের ইখলাসপূর্ণ মেহনতের বদৌলতে মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধি যেমন অর্জিত হয়েছে, তেমনি তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানও ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে গেছে। সমুদ্র সমান যে ইসলামি জ্ঞানভান্ডার আজ আমাদের সামনে বিদ্যমান, মহান আল্লাহর অনুগ্রহে তার সবটুকুই সাহাবা, তাবেয়ী ও তৎপরবর্তী ওলামায়ে কেরামের ইখলাসপূর্ণ মেহনতের ফল।

তাঁদের একদল দীনের খেদমতের পাশাপাশি উম্মতের বিশুদ্ধরূপে এবং বিস্তৃত পরিসরে ইসলামি জ্ঞান লাভ করার লক্ষ্যে যুগে যুগে ছোটো-বড় বিষয়ভিত্তিক অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। কেউ কেউ মহান আল্লাহর

দেওয়া তাওফীক ও যোগ্যতা বলে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখাকে গভীর পাণ্ডিত্য, গবেষণা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন করে উপস্থাপন করেছেন।

মহান মুসলিম মনীষী ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র) তাঁদের অন্যতম। তাঁর দার্শনিকোচিত গভীর অনুধাবনি ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিশ্লেষণ ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাঁর লেখা প্রতিটি বই-ই এর প্রমাণ। এ পর্যন্ত তাঁর অধিকাংশ বই বাংলাভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' তাঁর লেখা সবচেয়ে বড় গ্রন্থ। ইতঃপূর্বে বাংলাভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত অনুবাদ সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে 'দারুত তাকবীর' সম্পূর্ণ গ্রন্থ সূত্র উল্লেখসহ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। একদল অভিজ্ঞ আলেমেদীন তা অনুবাদে এগিয়ে এসেছেন, আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের নেক চেষ্টা-প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং এই গ্রন্থটিকে আমাদের পরকালীন নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন। আমিন!

প্রকাশক

১০.০৮.২০২০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

অনুবাদকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ أَمَّا بَعْدُ.

ইমাম গাযালি (র) হিজরি ষষ্ঠ শতকের একজন বিদগ্ধ মুসলিম মনীষী। পুরো নাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আততুসী আল-গাযালি (র)। অনন্য দর্শন-চিন্তা, প্রাজ্ঞচিত মেধা-মনন ও জ্ঞানের অধিকারী এ মহান বুজুর্গ অসংখ্য কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা। ফিকহ, উসূলে ফিকহ, তাসাউফ, দর্শন ও ইসলামি নীতিশাস্ত্র বিষয়ে তাঁর গ্রন্থগুলো রচিত। তিনি জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত হাদিসের পাঠদানে নিয়োজিত ছিলেন।

তাঁর সমকাল থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ জনগোষ্ঠী বিশেষত মুসলিম সমাজ তাঁর চিন্তা, দর্শন ও গ্রন্থাবলি দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন। 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' তাঁর লেখা সবচেয়ে বড় এবং সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে কাশফুয যুনুন গ্রন্থকার হাজী খলিফা (র) বলেন,

إِنَّهَا مِنْ أَجَلِّ كُتُبِ الْمَوَاعِظِ وَأَعْظَمِهَا حَتّٰى قِيْلَ فِيْهِ : إِنَّهُ لَوْ ذَهَبَتْ كُتُبُ الْاِسْلَامِ وَبَقِيَ "الْاِحْيَاءُ" أَغْنٰى عَمَّا ذَهَبَ.

ওয়াজ-নসিহত বিষয়ে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্ববৃহৎ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের ব্যাপারে এমনও বলা হয়েছে, (কুরআন, হাদিস, তাফসির গ্রন্থাদির বাইরে) যে সকল ইসলামি গ্রন্থ আছে, সব যদি হারিয়ে যায় এবং 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' বিদ্যমান থাকে, তবে তা হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থাদির স্থান পূরণ করতে সক্ষম। (কাশফুয যুনুন : ২৩)

বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাফেজ ইরাকি (র) বলেন, হালাল ও হারামের পরিচয় জানার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি জাহেরি হুকুম-আহকাম সংকলনের পাশাপাশি সেগুলোর সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দিকও উল্লেখ করেছেন, যে সূক্ষ্ম বিষয়গুলো মানুষের বোধগম্যের বাইরে। তিনি এ গ্রন্থে কেবল মাসআলা-মাসায়েল ও শাখা-প্রশাখা উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি বরং

তিনি এতে ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেনকেও সমন্বিতরূপে পেশ করেছেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন)

আলী ইবনে আবু বকর সাক্কাফ (র) বলেন, কোনো অমুসলিম যদি ইহয়াউ উলূমিদ্দীনের পাতাও ওলটায়, সে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কারণ, এতে এমন এক সূক্ষ্ম রহস্য আছে, যা অন্তর চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে।

এমন আরও অনেক মনীষী উক্ত মহান গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আলেমদের একদল উক্ত গ্রন্থের প্রশংসার পাশাপাশি সমালোচনাও করেছেন। সমালোচনার কারণ মূলত দুটি : ১. কিতাবের মধ্যকার কিছু জটিল ও দুর্বোধ্য বক্তব্য, যেগুলোর বাহ্যদিক স্পষ্ট নয়। ২. কিতাবে উল্লিখিত জয়িফ ও মওজু হাদিস-আসার।

প্রথমোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে কথা হলো, ইমাম গাযালি (র) নিজেই اَلْاَجْوِبَةُ (আজবিবাহ) নামের একটি গ্রন্থে সেই জটিল ও দুর্বোধ্য স্থান ও বক্তব্যগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি অর্থাৎ 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন'-এ জয়িফ ও মওজু হাদিস-আসার রয়েছে, এ বিষয়টি বিভিন্নজন ব্যাখ্যা করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফেজ ইরাকি (র) বলেন,

إِنَّ أَكْثَرَ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ لَيْسَ بِمَوْضُوْعٍ كَمَا بُرْهِنَ عَلَيْهِ فِي التَّخْرِيْجِ وَهُوَ فِيْ غَايَةِ الْقِلَّةِ رَوَاهُ عَنْ غَيْرِهِ أَوْ تَبِعَ فِيْهِ غَيْرَهُ مُتَبَرِّئًا بِنَحْوِ صِيْغَةِ "رُوِيَ" وَأَمَّا الْاِعْتِرَاضُ عَلَيْهِ أَنَّ فِيْمَا ذَكَرَهُ الضَّعِيْفُ بِكَثْرَةٍ فَهُوَ اِعْتِرَاضٌ سَاقِطٌ فِيْمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْفَضَائِلِ، وَكِتَابُهُ فِي الرَّقَائِقِ فَهُوْ مِنْ قَبِيْلِهَا وَلِأَنَّ لَهُ أُسْوَةً بِأَئِمَّةِ الْأَئِمَّةِ الْحُفَّاظِ فِيْ اِشْتِمَالِ كَثِيْرٍ عَلَى الضَّعِيْفِ بِكَثْرَةِ الْمَنِيْهِ عَلَى ضُعْفِهِ تَارَةً وَالْمَسْكُوْتِ عَنْهُ أُخْرٰى. وَهٰذِهِ كُتُبُ الْفِقْهِ لِلْمُتَقَدِّمِيْنَ وَهِيَ كُتُبُ الْأَحْكَامِ لَا الْفَضَائِلِ يُوْرِدُوْنَ الْأَحَادِيْثَ الضَّعِيْفَةَ سَاكِتِيْنَ عَلَيْهَا.

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে ইমাম গাযালি (র)-এর উল্লিখিত অধিকাংশ হাদিসই মওজু নয়, তাখরীজ থেকে তা প্রমাণিত। মওজু থাকলেও তা খুবই স্বল্পসংখ্যক। সেগুলোও তিনি বর্ণনা করেছেন অন্য কারও থেকে অথবা অন্য কারও অনুসরণে এবং নিজেকে নির্দোষ রাখার জন্য সেগুলোতে رُوِيَ (বর্ণিত আছে) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তিনি

অধিকহারে দুর্বল বা জয়িফ হাদিস উল্লেখ করেছেন বলে যে অভিযোগ করা হয়, তা-ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এটি গৃহিত সিদ্ধান্ত যে, ফাজায়েল ও আমলের ক্ষেত্রে জয়িফ হাদিসের ওপর আমল করা যায়। তাঁর লিখিত 'কিতাবুর রাকায়েক' এর অন্তর্ভুক্ত। আরও একটি কারণ হলো, এক্ষেত্রে তিনি বড় বড় হাফেজে হাদিস ও ইমামদের অনুসরণ করেছেন। কেননা, তাঁদের কিতাবসমূহেও অধিক পরিমাণে জয়িফ হাদিস রয়েছে। যেগুলো জয়িফ হওয়ার ব্যাপারে কখনো তাঁরা অবহিত করেছেন আর কখনো নীরব থেকেছেন। পূর্ববর্তীদের রচিত যে সকল ফিকহ গ্রন্থ আছে- যেগুলো আহকামের গ্রন্থ, ফাজায়েলের নয়, সেগুলোতেও তাঁরা অনেক জয়িফ হাদিস উল্লেখ করেছেন এবং সেগুলোর (জয়িফ হওয়ার) ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন)

মোটকথা, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন অত্যন্ত উপকারী একটি গ্রন্থ। কিছু কারণে এতে কতিপয় মওজু ও জয়িফ হাদিস এবং কিছু দুর্বোধ্য বক্তব্য এসেছে। একারণে ওলামায়ে কেরামের একাংশ তার প্রশংসার পাশাপাশি কিছুটা সমালোচনাও করেছেন। কেউ কেউ এ মহান গ্রন্থের তাখরীজ করেছেন এবং দুর্বোধ্য ও জটিল স্থানগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর ব্যাখ্যাও করেছেন।

বাংলাভাষায় এটি প্রথম পরিপূর্ণ অনুবাদ হয়ে প্রকাশ হচ্ছে বলে এতে উল্লিখিত হাদিসগুলোর তাখরীজ (উদ্ধৃতি ও সনদমান) উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া জটিল স্থানগুলোর বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ইমাম গাযালি (র) শাফেয়ী মতাবলম্বী হওয়ার কারণে ফিকহী মাসআলাগুলো তদনুযায়ী লিখেছেন। হানাফী মাযহাবের সঙ্গে যে মাসআলাগুলো নিয়ে বিরোধ আছে, আমরা যথাস্থানে সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছি।

অনুবাদ যথাসাধ্য মূলানুগ ও সাবলীল রাখার চেষ্টা করেছি। একদল বিজ্ঞ আলেমেদীন তা সম্পাদনা ও যাচাই-বাছাই করেছেন। তথাপি ভুল চোখে পড়লে সদয় অবগতি কামনা করছি। মহান আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি অনুবাদের এ সামান্য খিদমত কবুল করুন!

এ গ্রন্থের অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশসংশ্লিষ্ট সকলকে দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম বিনিময় দান করুন!

নূরে আলম

১০.০৮.২০২০

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি আমাদের মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং মুহাম্মদ (স)-এর উম্মত হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক! মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবিদের প্রতি।

পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া ওলামায়ে উম্মতের দায়িত্ব। সর্ব যুগে একদল মহান আলেম একনিষ্ঠভাবে এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। কেবল ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, কুরআন-হাদিস সামনে রেখে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগপথ বিশ্লেষণ ও সময়োপযোগী বহুবিধ ভাবনাও তাঁরা নির্মাণ করে গেছেন।

তাঁদের নির্মিত পথ ধরেই পরবর্তীকালের পৃথিবী, সমাজ, রাষ্ট্র ও মানুষ এগিয়ে গেছে। ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)-ও এ সকল পথিকৃৎ চিন্তাশীল মহীরুহদের একজন। জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন ও চিন্তার পরিমণ্ডলে যিনি অসামান্য উজ্জ্বল এক নক্ষত্র।

হাদিস, তাফসীর, ফিকহ, দর্শন, তাসাউফ ও তাঁর সময়ের প্রায় সকল অভিজ্ঞানেই তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রতিটি গ্রন্থই এর সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর গ্রন্থগুলোতেই তাঁর অসীম বিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' তাঁর লেখা গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাদিক প্রসিদ্ধ, সমাদৃত ও কালজয়ী গ্রন্থ। ওয়াজ-নসীহত, আখলাক ও ইসলামি নীতিশাস্ত্র বিষয়ে এটি সর্বাধিক সমৃদ্ধ ও উপকারী গ্রন্থ বলা যায়।

এ মহান গ্রন্থের প্রতি বাংলাভাষাভাষী মানুষের প্রয়োজন উপলব্ধি করেই খ্যাতনামা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দারুত তাকবীর এ গ্রন্থের যথাযোগ্য অনুবাদে এগিয়ে এসেছে। আরবি ও প্রমিত বাংলায় দক্ষ একদল আমানতদার বিজ্ঞ আলেমেদীন এ গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। ইতঃপূর্বে আরও কিছু বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলেও সবগুলোই ছিল সংক্ষিপ্ত

পরিসরে। দারুত তাকবীরই এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যভিত্তিক অনুবাদ প্রকাশের কাজ করছে। কোথাও সামান্য বাক্য বা বক্তব্যও যাতে অনুবাদে ছুটে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখা হয়েছে। গ্রন্থের মধ্যকার জটিল দুর্বোধ্য আলোচনা এবং তাতে প্রবিষ্ট মওজু ও জয়িফ হাদিস-আসার থাকার কারণে একদল বিশেষজ্ঞ আলেম আপত্তি করেছেন। এছাড়া গ্রন্থকার ফিকহের ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় ফিকহী মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ শাফেয়ী মত অনুসরণে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়গুলোর সমাধানে সম্পাদনা পরিষদ নিম্নোক্ত কাজগুলো করেছেন।

- প্রতিটি হাদিস ও আসারের তাখরীজ, উদ্বৃতি ও সনদমান উল্লেখ। যাতে পাঠক সহজে কোন হাদিসটি সহিহ আর কোন হাদিসটি জয়িফ বা মওজু তা চিহ্নিত করতে পারেন।
- জটিল ও দুর্বোধ্য স্থান ও বক্তব্যসমূহের যথাযোগ্য বিশ্লেষণ। একাজটি করতে গিয়ে এবং এবক্তব্যগুলোর পর্যালোচনায় কুরআন-হাদিস, সাহাবা-তাবেয়ীদের উক্তি ও ওলামায়ে উম্মতের মতকে সামনে রাখা হয়েছে।
- বাংলাভাষী মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের অনুসারী হওয়ায় তাঁদের সুবিধার্থে ফিকহি মাসআলায় গ্রন্থকারের বক্তব্যের পাশে হানাফী মত উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে সাধারণ মানুষের কাছে বিষয়গুলো স্পষ্ট থাকে।

এছাড়াও প্রমিত বাংলায় গ্রন্থের প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও বক্তব্যের যথাযথ মূলানুগ অনুবাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এজন্য সম্পাদনা পরিষদের প্রত্যেক সদস্য দায়িত্ব নিয়ে মূল আরবি গ্রন্থের সঙ্গে অনুবাদ সম্পূর্ণ মিলিয়ে দেখেছেন। তথাপি ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই আমরা পাঠক ভাই-বোনের কাছে ভুল শুধরে প্রকাশের নতুন আঙ্গিক নির্মাণে পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

মহান আল্লাহ এ গ্রন্থের পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশসংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
১০.০৮.২০২০

সম্পাদনা পরিষদ

- **মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ**
  শিক্ষাসচিব, মারকাযুল কুরআন বাংলাদেশ, ঢাকা

- **মাওলানা শফীকুল ইসলাম**
  শিক্ষাসচিব, কদম রসূলপুর মাহমুদুল উলূম মাদরাসা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
  সাবেক সহসম্পাদক, মাসিক মদীনা ও সাপ্তাহিক মুসলিমজাহান

- **মুফতি মাহদী হাসান**
  উস্তায, মাদরাসা কাসেমিয়া, জামতলা, ময়মনসিংহ

- **মুফতি নূরে আলম**
  মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, মিরপুর-১২, ঢাকা

- **মাওলানা ইয়াসিন বিন ইউসুফ**
  উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম, শ্যামলী, ঢাকা

মিরপুর-২ বড়বাগ মসজিদের ইমাম ও খতিব, দারুল উলুম মিরপুর-৬ ঢাকা-এর সম্মানিত সিনিয়র মুহাদ্দিস **মুফতি নজিরুল ইসলাম দা.বা.-এর**

দুআ ও বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَحْمُوْدِ بِنِعْمَتِهٖ، اَلْمَعْبُوْدِ بِقُدْرَتِهٖ، اَلْمُطَاعِ الْمَرْهُوْبِ مِنْ عَذَابِهٖ وَسَطْوَتِهٖ، اَلنَّافِذِ اَمْرُهٗ فِيْ سَمَائِهٖ وَأَرْضِهِ الَّذِيْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهٖ وَمَيَّزَهُمْ بِأَحْكَامِهٖ وَأَعَزَّهُمْ بِدِيْنِهٖ وَأَكْرَمَهُمْ بِنَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى صِفْوَتِهٖ مِنْ خَلْقِهٖ وَخَاتَمِ اَنْبِيَائِهٖ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهِ الْمُكَرَّمِيْنَ وَأَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ.

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালি (র) রচিত 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' ওয়াজ-নসিহত, প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ও আত্মশুদ্ধির দিকনির্দেশনা বিষয়ে রচিত সর্ববৃহৎ ও সর্বজনীন গ্রন্থ। এ গ্রন্থে দার্শনিকোচিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইসলামি শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি এক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। রচনার পর থেকেই এ গ্রন্থ মুসলিম সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়ে আসছে। ইমাম গাযালি (র) তাঁর দর্শন-চিন্তা ও রচনাকর্মের অনন্যতা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব।

ইমাম সালাহুদ্দীন সাফাদী (র) বলেন, ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ইমাম গাযালি (র)-এর এক অনবদ্য মহাগ্রন্থ। এর সম্পর্কে বলা হয়, যদি ইসলামি সকল গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়ে যায় আর ইহয়াউ উলুমিদ্দীন অবশিষ্ট থাকে তাহলে তা বিলুপ্ত সকল গ্রন্থের জন্য যথেষ্ট।

বাংলাভাষাভাষী মানুষের জন্য তাঁর রচনাকর্ম অনুবাদ হওয়া অত্যন্ত জরুরি। বাংলাভাষায় ইতঃপূর্বে তাঁর লেখা অনেকগুলো গ্রন্থই অনূদিত হয়েছে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত ও বৃহৎ রচনাকর্ম 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' এর অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু তা একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এ কারণে দারুত তাকবীর এই প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এটি মহত্তম একটি উদ্যোগ।

প্রথম থেকে নিয়ে দশম খণ্ড প্রকাশের পর একাদশ খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। আমার স্নেহভাজন মুফতি নূরে আলম এ খণ্ড অনুবাদ করেছে। তার অনুবাদের বেশ কিছু অংশ পড়ার সুযোগ হয়েছে। অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় লেখকের মূল বক্তব্য উঠে এসেছে তার অনুবাদে। তার সাথে হাদিস ও আসারের তাখরীজ, জটিল ও দুর্বোধ্য স্থান ও বাক্যসমূহের যথাযোগ্য ব্যাখ্যা এবং মাযহাবগত সমস্যার সমাধানও তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি সর্বশ্রেণির মানুষ এ থেকে ব্যাপক উপকৃত হবেন। দুআ করি, মহান আল্লাহ তার এ অনুবাদ কবুল করুন! দুনিয়া ও আখেরাতে উত্তম জাযা দান করুন।

দারুত তাকবীর তার যাত্রার সূচনায় এত বিশাল কাজের উদ্যোগ নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের এ উদ্যোগ কবুল করুন এবং এ গ্রন্থের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জগতে সফলতা দান করুন। আমিন!

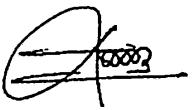

(মুফতি নজিরুল ইসলাম)

মাদরাসায়ে দারুল উলুম মিরপুর-৬ ঢাকা-এর সম্মানিত সিনিয়র মুহাদ্দিস,
উস্তাযুল আসাতিযাহ মুফতি আবু বকর কাসেমী দা.বা.-এর

দুআ ও বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَ أُولِي الْعِلْمِ عَلٰى مَنْ سَوَاهُمْ تَفْضِيْلًا وَرَفَعَهُمْ إِلَى الْعَلْيَاءِ وَسَلَكَ بِهِمُ الْمَحَجَّةَ الْبَيْضَاءَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ سَيِّدِنَا الْاَمِيْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ الْاَكْرَمِيْنَ وَأَصْحَابِهِ الْمُكَرَّمِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، اَمَّا بَعْدُ.

ইমাম গাযালি (র) রচিত ইতিহাসখ্যাত গ্রন্থ 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের সারনির্যাস। আরবি ভাষায় রচিত চার খণ্ডের এই কিতাবে ইবাদত, মুআমালাত, আদাব ও আখলাক বিষয়ক আলোচনা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি আত্মিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদিও এতে আলোচিত হয়েছে। যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণে তিনি প্রত্যেকটি আলোচনা সমৃদ্ধ পরিসরে পেশ করেছেন। ইসলামি শরিয়তের মৌলিক বিষয়াদির পাশাপাশি মনোজগতের বিভিন্ন অবস্থার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা, আত্মার রোগব্যধি ও প্রতিকার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে রচনার পর থেকেই উক্ত মহান গ্রন্থ বিগত নয়শ বছর যাবৎ সকল শ্রেণির মুসলমানের কাছে ইসলামি জ্ঞানবিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ গ্রন্থের বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতাই এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

ইমাম সুবকী (র) বলেন, যদি মানুষের জন্য ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থ রচনা করা না হয় তাহলে ইহয়াউ উলুমিদ্দীনই তাদের জন্য যথেষ্ট। আমি কুরআন-হাদিস, দর্শন, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে ইহয়াউ উলুমিদ্দীনের সদৃশ কোনো গ্রন্থ দেখিনি।

দারুত তাকবীর এ মূল্যবান গ্রন্থটি সিরিজ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিরিজের একাদশ খণ্ড অনুবাদ করেছে আমার স্নেহভাজন তরুণ আলেম মুফতি নূরে আলম। আলহামদুলিল্লাহ! অনুবাদ গ্রন্থটি আমার সম্পাদনা ও নিরীক্ষণের সুযোগ হয়েছে। সরল প্রমিত বাংলায় মূল কিতাবের

বক্তব্য যথাযথভাবে এসেছে। জটিল শব্দ, বাক্য ও বক্তব্য বাদ দিয়ে অথবা কোনোরকম ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য দিয়ে দায়সারা গোছের অনুবাদ করলে মূল লেখকের বক্তব্যের যথাযোগ্য অনুবাদ হয় না এবং তাতে বক্তব্যের প্রাণ অবশিষ্ট থাকে না।

তাই এ অনুবাদ গ্রন্থে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে এ প্রবণতা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে পাঠক এতে মূল বক্তব্যের প্রাণ যেমন পাবেন, তেমনি সমগ্র গ্রন্থের প্রতিটি বক্তব্যের সরল মূলানুগ অনুবাদ পাবেন বলে আশা করি। তার সাথে হাদিসের রেফারেন্স, জটিল বাক্যের বিশ্লেষণও উল্লেখ করা হয়েছে।

দুআ করি, মহান আল্লাহ তার এ অনুবাদের খিদমতকে কবুল করুন! মূল আরবি গ্রন্থ যেমন সবার কাছে সমাদৃত, এ অনুবাদকেও মহান আল্লাহ সর্বজন সমাদৃত করুন! এ গ্রন্থের প্রকাশনাসংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন!

(মুফতি আবু বকর কাসেমী)

সূচিপত্র

বিষয়.....পৃষ্ঠা

কৃপণতা ও ধনসম্পদে আসক্তির নিন্দা

ধনসম্পদের নিন্দা..... ২০
সম্পদ উপার্জনের প্রশংসা ও নিন্দা এবং এদুটির মধ্যে সমন্বয় ২৫
ধনসম্পদের উপকারিতা ও অপকারিতা..... ২৯
লোভ-লালসার নিন্দা এবং অল্পেতুষ্টির প্রশংসা..... ৩৪
লোভ-লালসার প্রতিকার এবং অল্পেতুষ্টি হাসিলের পন্থা..... ৪৩
দানশীলতার মাহাত্ম্য ৪৯
দানশীলতার ঘটনাবলি ৫৭
কৃপণতার নিন্দা ৭২
কৃপণতার কিছু ঘটনা..... ৮১
আত্মোৎসর্গ ও তার গুরুত্ব..... ৮৪
দানশীলতা ও কৃপণতার কারণ..... ৯০
কৃপণতার অন্য একটি স্তর..... ৯৩
কৃপণতার প্রতিকার..... ৯৬
ধনসম্পদ সম্পর্কে জরুরি নির্দেশনা..... ১০২
প্রাচুর্যের ভর্ৎসনা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা ১০৪

অহংকার ও আত্মপ্রীতির নিন্দা

অহমিকার নিন্দা..... ১২৮
পোশাক ঝুলিয়ে বা দর্প ভরে চলা ১৩৩
বিনয় ও নম্রতা ১৩৬
অহংকারের প্রকৃতি ও লাভ-ক্ষতি ১৪৫
যার সাথে অহংকার করা হয়, তার মর্যাদা এবং অহংকারের ফলাফল ১৫০
মানুষ কেন অহংকার করে? ১৫৬

অহংকারের প্রথম কারণ ইলম ১৫৬
অহংকারের দ্বিতীয় কারণ আমল..... ১৬০
অহংকারের তৃতীয় কারণ বংশ-মর্যাদা ১৬৭
অহংকারের চতুর্থ কারণ রূপ-লাবণ্য..... ১৬৯
পঞ্চম কারণ ধনসম্পদ ১৬৯
অহংকারের ষষ্ঠ কারণ দৈহিক শক্তি..... ১৭০
সপ্তম কারণ অনুগামী, সাহায্যকারী, শাগরিদ, চাকর-বাকর,
পরিবার ও আত্মীয়বর্গের আধিক্য..... ১৭০
অহংকারের প্রতি প্রবৃত্তকারী বিষয়সমূহ..... ১৭০
বিনয়ীদের চরিত্র এবং বিনয় ও অহংকার প্রকাশকারী কাজ..... ১৭৩
অহংকারীর আলামত ১৭৭
অহংকার রোগ দূর করা ও বিনয়ের গুণ অর্জনের উপায়..... ১৮২
যে সকল বিষয়ে মানব সম্প্রদায় অহংকার করে
প্রথম : বংশ মর্যাদা..... ১৯০
দ্বিতীয় : রূপ-লাবণ্য ১৯২
তৃতীয় : শক্তি ও ক্ষমতা..... ১৯৩
চতুর্থ ও পঞ্চম : ধনসম্পদ ও অনুসারীর আধিক্য..... ১৯৪
ষষ্ঠ : ইলম..... ১৯৫
সপ্তম : তাকওয়া ও ইবাদত ২০৩
বিনয় অর্জনের চূড়ান্ত সীমা ২১২
আত্মতৃপ্তি..... ২১৩
আত্মোৎফুল্লতার কুফল ২১৬
আত্মতৃপ্তির পরিচয়..... ২১৭
আত্মোৎফুল্লতা থেকে বাঁচার উপায় ২১৯

[একাদশ খণ্ড সমাপ্ত]

কৃপণতা ও ধনসম্পদে আসক্তির নিন্দা

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। যিনি সর্বব্যাপি রিযিক প্রদান ও নিরাশার পরে আশা প্রদানের কারণে প্রশংসা পাওয়ার দাবিদার। যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। সবার কাছে রিযিক পৌঁছে দিয়েছেন। সম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে তিনি পৃথিবীকে পূর্ণ করেছেন।

তিনি ধনীকে গরিব, গরিবকে ধনী বানিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেন। মানুষকে তিনি বিপরীতমুখি দুটি অবস্থার মধ্যে আবর্তন করান। মানুষের জীবন কাটে কখনো সুখ কখনো দুঃখ, কখনো আশা কখনো নিরাশা, কখনো লোভ কখনো অল্পেতুষ্টির মাঝে।

তাই মানুষ কখনো সম্পদশালী হয়, কখনো হয় হতদরিদ্র। কখনো সে কৃপণ, কখনো বা দানশীল। কখনো অক্ষম, কখনো সক্ষম। কখনো উপস্থিত বস্তু নিয়ে তুষ্ট থাকে, কখনো হারানো জিনিসের কারণে শোক করে। মানুষ কখনো নিজে না খেয়ে অন্যকে দান করে। কখনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই সবটা ব্যবহার করে। এসব অবস্থার মাঝে আল্লাহ মানুষকে আবর্তিত করান পরীক্ষা করার জন্য। তিনি দেখতে চান, কে পুণ্য কর্ম করে। কে আখেরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দেয়।

দরুদ ও সালাম নবীজি (স)-এর ওপর, যার দীনের আগমন অন্য ধর্মকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। যার শরিয়ত অন্য সকল শরিয়তকে রহিত করে দিয়েছে। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার ও সাহাবায়ে কেরামের ওপর, যাঁরা আনুগত্যের সঙ্গে তাদের প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করেছেন।

দুনিয়া ফিতনার আকর। সবচেয়ে বড় ফিতনা হচ্ছে ধনদৌলত। এতে দুঃখকষ্টও বেশি। অধিকাংশ ক্ষতির কারণ হচ্ছে, ধনসম্পদ থেকে কেউ ভ্রুক্ষেপহীন নয় এবং নিরাপত্তারও কোনো উপায় নেই। ধনদৌলত না থাকলে যে অসচ্ছলতা আসে, তা মানুষকে কুফরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে দেয়। অপরদিকে ধনদৌলত থাকলে তাতে অবাধ্যতার কারণ হয়ে যায়। যার পরিণাম ক্ষতি ছাড়া কিছুই নয়। মোটকথা, ধনদৌলত উপকার ও অনিষ্ট কোনোটা থেকেই মুক্ত নয়। এর উপকারগুলো নাজাত দানকারী এবং অপকারগুলো ধ্বংসকারী। কোন ধনদৌলত উত্তম এবং কোনগুলো মন্দ, তা চেনা বেশকঠিন। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেম ও ধার্মিক ছাড়া কেউ তা বুঝতে পারে না। তাই স্বতন্ত্রভাবে এটিকে আলোচনা করা খুবই জরুরি।

দুনিয়ার সাধারণ মন্দ দিকসমূহ আলোচনা করা হয়েছে পূর্বের পর্বে। মানবজীবনের অনেকগুলো ভাগ নিয়েই দুনিয়া গঠিত। তন্মধ্যে ধনসম্পদও তার একটি অংশ। এ পর্বে আমরা কেবল ধনসম্পদের বিষয় বর্ণনা করব। কারণ, এতে বিপদাপদ ও ক্ষতি অনেক বেশি। ধনসম্পদের অভাবে মানুষ দারিদ্র্যের বিশেষণে বিশেষিত হয় এবং এর উপস্থিতিতে ধনাঢ্যতার বিশেষণ এসে যায়। এই উভয় বিশেষণ দ্বারাই মানুষের পরীক্ষা হয়ে থাকে।

গরীব মানুষের দুই অবস্থা— অল্পেতুষ্টি ও লোভ লালসা। প্রথম অবস্থাটি প্রশংসনীয় এবং দ্বিতীয় অবস্থাটি নিন্দনীয়। লোভী ব্যক্তির দুই অবস্থা। এক, মানুষের ধনদৌলতে লোভ করা এবং দুই, অপরের ধনদৌলত থেকে হাত গুটিয়ে কারিগরি ও অন্যান্য পেশায় আত্মনিয়োগ করা। সর্বাবস্থায় অন্যের ধনসম্পদে লোভ করা মহাবিপদ। ধনাঢ্য ব্যক্তিরও দুই অবস্থা— অপচয় ও মিতব্যয়িতা। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে— মিতব্যয়িতা। এসব বিষয় খুব সূক্ষ্ম ও কঠিন বিধায় এগুলো ব্যাখ্যার দাবি রাখে।

এটা পরস্পর সদৃশপূর্ণ বিষয়। তাই এর ওপর থেকে অজানার পর্দা উন্মোচন করার গুরুত্ব অনেক। এসবকিছু এখানে চৌদ্দটি শিরোনামে বর্ণনা করা হবে। ইনশাআল্লাহ!

শিরোনাম চৌদ্দটি হলো,

১. ধনসম্পদের নিন্দা

২. সম্পদ উপার্জনের প্রশংসা ও নিন্দা এবং এদুটির মধ্যে সমন্বয়

৩. ধনসম্পদের উপকারিতা ও অপকারিতা

৪. লোভ লালসার নিন্দা ও অল্পেতুষ্টির প্রশংসা

৫. লোভ লালসার প্রতিকার এবং অল্পেতুষ্টি হাসিলের পন্থা

৬. দানশীলতার মাহাত্ম্য

৭. দানশীলতার ঘটনাবলি

৮. কৃপণতার নিন্দা

৯. কৃপণতার কিছু ঘটনা

১০. আত্মোৎসর্গ ও তার গুরুত্ব

১১. দানশীলতা ও কৃপণতার কারণ

১২. কৃপণতার প্রতিকার।

১৩. ধনসম্পদ সম্পর্কে জরুরি নির্দেশনা

১৪. প্রাচুর্যের ভর্ৎসনা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা

ধনসম্পদের নিন্দা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থসম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আল্লাহর স্মরণ থেকে তোমাদেরকে উদাসীন না করে। যারা উদাসীন হবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা মুনাফিকুন : ৯)

اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ .

তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো এক মহাপরীক্ষা এবং আল্লাহরই কাছে আছে মহাপ্রতিদান। (সূরা আনফাল : ২৮)

যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুত সম্পদ ত্যাগ করে দুনিয়ার ভোগ বিলাস ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে মগ্ন থাকবে, তারা বৃহৎ ক্ষতির মুখোমুখি হবে।

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ.

যে পার্থিবজীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের ফল পূর্ণরূপে দান করি এবং এক্ষেত্রে তাদের কম দেওয়া হবে না। (সূরা হুদ : ১৫)

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى.

বস্তুত মানুষ তো সীমালঙ্ঘন করেই থাকে। কারণ, সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা আলাক : ৬-৭)

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ .

প্রাচুর্যের লালসা তোমাদের গাফেল রাখে। (সূরা তাকাছুর : ১)

হাদীস শরীফে বলা হয়েছে, ধনসম্পদ ও আভিজাত্যের ভালোবাসা অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে। যেমন পানি দিয়ে শস্য উৎপন্ন হয়। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ১৪৪)

হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে, যদি বকরির পালে দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে তারা এতটুকু ক্ষতি করবে না, যতটুকু ধনসম্পদ ও আভিজাত্যের ভালোবাসা মুসলমানের দীনের অনিষ্ট করে। (জামে তিরমিযী : ২৩৭৬)

একবার সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক দুষ্কৃতিকারী কারা? তিনি বললেন, ধনীরা। (আল ওসায়া, মুহাসিব : ৭০)

অন্য এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে— তোমাদের পরে অচিরেই এমন লোক আসবে, যারা চিকন ও রকমারি খাদ্য খাবে, উন্নতমানের দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহণ করবে, সুন্দরী মহিলাদের বিয়ে করবে, আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে, সামান্য জিনিসে তাদের পেট ভরবে না এবং অনেক পেয়েও তুষ্ট হবে না। তারা দুনিয়ার গোলাম হয়ে থাকবে। চোখের সামনে সকাল-সন্ধ্যায় শুধু দুনিয়া থাকবে এবং দুনিয়াকেই উপাস্য ও প্রতিপালক মনে করবে। আল্লাহর রবুবিয়্যাতের কথা তারা ভুলে যাবে। তোমাদের অথবা তোমাদের পরবর্তী লোকদের মধ্যে যে কেউ সেই যুগে থাকে, তাকে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে কসম! সে যেন এমন লোকদের সালাম না করে, তাদের রোগীদেরকে দেখতে না যায়, তাদের জানাযায় যোগদান না করে এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করে। কেননা, এরাই আসলে ইসলামের ভিত ধ্বংস করার মূল হোতা ও মদদদাতা। (আল ওসায়া, মুহাসিব : ৯৬)

আরও বলা হয়েছে, দুনিয়াকে দুনিয়াদারদের জন্য ছেড়ে দাও। কারণ, যে কেউ প্রয়োজনের বেশি দুনিয়া হাসিল করবে, সে নিজের মৃত্যু হাসিল করবে অথচ টেরও পাবে না। (মুসনাদুল বাযযার : ৫৪৪৪)

এক হাদীসে আছে,

يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ : مَالِيْ، مَالِيْ، قَالَ : وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ.

অর্থাৎ, আদম সন্তান বলে, আমার মাল! আমার মাল! অথচ তোমার মাল তাই, যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ অথবা পরে ছিন্ন করে দিয়েছ অথবা খয়রাত করে হস্তান্তর করেছ। (সহিহ মুসলিম : ২৯৫৮)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরয করল, আমি মৃত্যু চাই না। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি কোনো ধনসম্পদ আছে? সে বলল, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার এই ধনসম্পদ পরকালের জন্য খরচ করে ফেলো। যেহেতু মুমিনের অন্তর তার ধনসম্পদের সাথে থাকে, পরকালের জন্য দিয়ে দিলে সে নিজেও তার ধনদৌলতের সাথে মিলিত হতে চাইবে। আর যদি ধনসম্পদ পেছনে রেখে যায়, তাহলে সে-ও তার সাথে দুনিয়ায় থাকতে ইচ্ছা করবে। (কিতাবুয যুহদ, ইবনে মুবারক : ৬৩৪)

রাসূলে আকরাম (স) আরও বলেন, মানুষের বন্ধু তিনটি। এক বন্ধু মৃত্যু পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। দ্বিতীয় বন্ধু কবর পর্যন্ত এবং তৃতীয় বন্ধু কিয়ামত পর্যন্ত সঙ্গে থাকে। মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধু হচ্ছে ধনসম্পদ। কবর পর্যন্ত বন্ধু হচ্ছে পরিবারের লোকজন এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধু হচ্ছে তার আমল। (মুসনাদুল বাযযার : ৮৩৫৬, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৯৯৯৩)

একবার ঈসা (আ)-কে তাঁর সহচরবৃন্দ প্রশ্ন করল, আপনি পানির উপর দিয়ে চলেন অথচ আমাদের দ্বারা তা হয় না– এর কারণ কী? তিনি বললেন, তোমাদের কাছে দীনার ও আশরাফীর কোনো মূল্য আছে কি? তারা জওয়াব দিল, হ্যাঁ, আমরা এগুলোকে মূল্য দিয়ে থাকি। তিনি বললেন, আমার কাছে এদুটি মাটির ঢিলার সমান। (আল-ইয়াকিন, ইবনু আবিদ দুনিয়া : ৪০)

সালমান ফারসি (রা) আবু দারদা (রা)-এর কাছে এই কথা লিখে পত্র প্রেরণ করলেন, প্রিয় ভাই! এতটা দুনিয়া জমা করো না, যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো না। আমি নবী কারিম (স)-কে বলতে শুনেছি— যে সম্পদশালী তার সম্পদ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী খরচ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে মালসহ উপস্থিত করা হবে। সে যখন পুলসিরাতের এদিক-ওদিক ঝুঁকে পড়বে, তখন তার সম্পদ বলবে, চলতে থাকো। তুমি তো আমার মধ্যে থেকে আল্লাহর হক দিয়ে দিয়েছ। এরপর এমন ধনী ব্যক্তি পুলসিরাতের সামনে আসবে, যে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সম্পদ খরচ করেনি। তার সম্পদ তার কাঁধে চাপানো থাকবে। যখন সে পুলসিরাতে

হেলতে দুলতে থাকবে, তখন তার সম্পদ বলবে, তোর জন্য দুর্ভাগ্য! তুই আল্লাহর হক আদায় করিসনি। শেষ পর্যন্ত সে হায়! হায়! করতে থাকবে। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১১ : ৯৬; আয যুহদ, ইবনু আবিদ দুনিয়া : ৩৪০; হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ২১৪; বায়হাকি, শুআবুল ঈমান : ১০১৭৪)

দুনিয়ার মহব্বত না থাকা ও দারিদ্র্য অধ্যায়ে আমরা ধনাঢ্য হওয়ার নিন্দা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। সেগুলোর সারমর্মও ধনসম্পদের নিন্দা। এখানে তার পুনরাবৃত্তির দরকার নেই। দুনিয়ার নিন্দায় যা বর্ণিত হয়েছে, তাও ধনসম্পদের নিন্দার শামিল। এ অধ্যায়টি বিশেষভাবে ধনসম্পদ সম্পর্কিত। সে মতে হাদীসে আছে–

إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ النَّاسُ مَا خَلَّفَ.

অর্থাৎ, বান্দা যখন মৃত্যুমুখে পড়ে যায় তখন ফেরেশতারা বলে, সে পূর্বে কী পাঠিয়েছে? আর মানুষ বলে, সে পেছনে কী রেখে গেল? (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৫৮৫১, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৯৯৯২)

আসার : একবার এক লোক আবু দারদার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! যে আমার সাথে খারাপ আচরণ করেছে, তাকে সুস্থ রাখো। তার হায়াত বৃদ্ধি করো এবং তাকে প্রচুর ধনসম্পদ দান করো। (হিলয়াতুল আউলিয়া) এখানে দেখা উচিত যে, শারীরিক সুস্থতা ও হায়াত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধনসম্পদের প্রাচুর্যকে অত্যধিক পরীক্ষা মনে করা হয়েছে। কারণ, অবশ্যই এতে নাফরমানি হয়ে যায়।

আলী (রা) হাতের তালুতে একটি দিরহাম রেখে বললেন, তুই এমন জিনিস যে, আমার নিকট থেকে না যাওয়া পর্যন্ত আমার কোনো কাজেই লাগবে না। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ১৪৭)

বর্ণিত আছে, উমর (রা) তাঁর খেলাফতকালে উম্মুল মুমিনীন যয়নব বিনতে জাহাশের খেদমতে কিছু অর্থ পাঠান। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই অর্থ কীসের? লোকেরা বলল, খলিফা উমর (রা) আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা উমর (রা)-কে ক্ষমা করুন! এরপর তিনি একটি পর্দা খুলে সেটাকে টুকরা টুকরা করে থলে সেলাই করলেন এবং সমুদয় অর্থ আত্মীয়স্বজন ও এতিমদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। এরপর

হাত তুলে দুআ করলেন, ইলাহী! এ বছরের পর যেন আমার কাছে উমর (রা)-এর দান না আসে। তাই হলো। পবিত্র বিবিগণের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইন্তেকাল করলেন। (আত তাবাকাত, ইবনু সাদ : ১০ : ১০৬)

হাসান (রা) বলেন, অর্থকড়ি যাকে সম্মান দান করে, তাকে আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছিত করেন। (আয যুহদুল কাবির, বায়হাকি : ২৮১)

বর্ণিত আছে, প্রথম যখন আশরাফী মুদ্রা তৈরি হলো, তখন শয়তান তাকে নিজের মাথার উপর রেখে চুমু খেয়ে বলে— যে তোমাকে ভালোবাসবে, সে আসলেই আমার দাস হবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ৩২৮)

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুআয (রা) বলেন, টাকাপয়সা হচ্ছে বিষাক্ত কীট, বিচ্ছু। যে এর মন্ত্র জানে না, সে যেন এটা গ্রহণ না করে। কারণ, ছোবল দিলে এর বিষক্রিয়ায় মারা যাবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এর মন্ত্র কী? তিনি বললেন, হালাল পন্থায় উপার্জন করা এবং সৎপথে খরচ করা। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ৬০)

আলা ইবনে যিয়াদ (র) বললেন, আমার সামনে দুনিয়া সামগ্রিক সৌন্দর্য নিয়ে মূর্তমান হলো। আমি বললাম, আমি তোমার মন্দত্ব থেকে পানাহ চাই। দুনিয়া বললো, যদি চাও আল্লাহ আমার মন্দত্ব থেকে তোমাকে মুক্ত রাখুক তাহলে তুমি টাকাপয়সা, দীনার-দিরহামের প্রতি বিদ্বেষী হও। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩১১৫৮)

দুনিয়ার এই উত্তর দেওয়ার কারণ হলো, টাকাপয়সাই হলো দুনিয়ার শেষ কথা। টাকাপয়সা দিয়ে যে-কোনো জিনিস অর্জন করা যায়। কাজেই মন থেকে যে টাকাপয়সার মোহমায়া দূর করতে পারবে, দুনিয়ার মহব্বত তার অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে।

মাসলামা ইবনে আবদুল মালেক (র) উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর নিকট তাঁর অন্তিম মুহূর্তে গিয়ে বললেন, আপনি এমন কাজ করেছেন, যা ইতঃপূর্বে কেউ করেনি। আপনি নিজের সন্তানদের জন্য কোনো ধনসম্পদ রেখে যাননি। তিনি বললেন, আমি তাদের কোনো হক নষ্ট করিনি এবং অন্যজনের হকও তাদের দেইনি। এমনকি আমার সন্তানরা দু'প্রকারের হতে পারে। তারা আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ করবে অথবা অবাধ্য হবে। যদি তাঁর হুকুমের অনুসারী হয়, তাহলে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট।

আল্লাহ্ বলেন, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ অর্থাৎ, তিনি নেককারদের অভিভাবক। (সূরা আরাফ : ৯৬)

আর যদি তারা গুনাহগার হয়, তাহলে তাদের জন্য আমার কোনো কিছু করার নেই; যা হবার তাই হবে।

একবার মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী অনেক ধনদৌলত লাভ করেন। লোকেরা বলল, এই অঢেল ধনসম্পদ আপনার পুত্রের জন্য রেখে দিলে ভালো হয়। তিনি বললেন, না। বরং এই ধনসম্পদ নিজের জন্য আল্লাহর ভান্ডারে জমা রাখব আর আমার পুত্রের জন্য রেখে যাব আল্লাহকে। (আয যুহ্দুল কাবির, বায়হাকি : ৪৩৬)

এক ব্যক্তি আবু আবদির রব (র)-কে বলেন, প্রিয় ভাই! তুমি মন্দটা নিয়ে কবরে গিয়ে সন্তানদের জন্য উত্তমটা রেখে যাওয়ার চিন্তা করো না। একথা শুনে আবু আবদির রব (র) এক লক্ষ দীনার দান করে দিলেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ১৬০)

ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (র) বলেন, সম্পদশালী ব্যক্তি মৃত্যুর সময় এমন ভয়ানক দুটি বিপদের কথা শুনবে, যা আগে পরে কেউ কোনোদিন শোনেনি।

বলা হলো, কী সেই বিপদ? তিনি বললেন, মৃত্যুর সময় সম্পদশালীর সব সম্পদ কেড়ে নেওয়া হবে এবং অর্জিত সম্পদের সবকিছুর পূর্ণাঙ্গ হিসাব তাকে দিতে হবে। (খতিব : কিতাবুয যুহদ : ১১)

সম্পদ উপার্জনের প্রশংসা ও নিন্দা এবং এদুটির মধ্যে সমন্বয়

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধনসম্পদকে কয়েক স্থানে "খায়র" (কল্যাণ) শব্দে ব্যক্ত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে اِنْ تَرَكَ خَيْرًا .. الخ — যদি খায়র অর্থাৎ, ধনসম্পদ ছেড়ে যায়। (সূরা বাকারা : ১৮০)

ধনসম্পদের প্রশংসা করে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ.

অর্থাৎ, নেককারের জন্য নেক ধনদৌলত কতই না উত্তম! (মুসনাদে আহমাদ : ৪ : ১৯৭; সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩২১০)

তাছাড়া দানখয়রাত ও হজের যে নেকী বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও ধন-সম্পদেরই প্রশংসাস্বরূপ। কারণ, ধনসম্পদ ছাড়া দানসদকা হয় না এবং হজও হয় না। কুরআন মাজীদের এক স্থানে ধনসম্পদকে বান্দার প্রতি অনুগ্রহ বলা হয়েছে,

وَّ يُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا.

তিনি তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে সমৃদ্ধ করবেন এবং তোমাদের জন্য উদ্যানসমূহ স্থাপন করবেন এবং নদীনালা প্রবাহিত করবেন। (সূরা নূহ : ১২)

এক হাদীসে আছে, كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَّكُوْنَ كُفْرًا অর্থাৎ, দরিদ্রতা কুফর হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। (আবু দাউদ)

এ হাদীসের সারমর্মের দিকে তাকালে ধনসম্পদেরই প্রশংসা বোঝা যায়।

আবার অনেক জায়গায় ধনসম্পদের নিন্দাও করা হয়েছে। এই প্রশংসা ও নিন্দার মধ্যে সমন্বয় বোঝা যাবে না, যে পর্যন্ত ধনসম্পদের রহস্য, উদ্দেশ্য, বিপদাপদ ও প্রয়োজন জানা না যায়। এ বিষয়টি কারও জানা থাকলে তার জন্য বোঝা সহজ, ধনসম্পদ কোন কারণে উত্তম এবং কোন কারণে নিকৃষ্ট। এক কথায় এটা উত্তম হওয়ার দিক দিয়ে প্রশংসনীয় এবং নিকৃষ্ট হওয়ার দিক দিয়ে নিন্দনীয়। কেননা, ধনসম্পদ সম্পূর্ণই কল্যাণ নয় এবং সম্পূর্ণই অকল্যাণ নয়। বরং এটা কল্যাণ ও অনিষ্ট উভয়ের সমন্বিত রূপ। যে বস্তু উভয়ের কারণ হবে, তার কখনো প্রশংসা এবং কখনো নিন্দা করা হবে।

এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কিতাবুশ শুকরের কল্যাণ ও নিয়ামতের বিস্তারিত বিবরণ অধ্যায়ে। তবে এ বিষয়ে কিছু কথা এখানেও তুলে ধরা হলো।

জ্ঞানী ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য থাকতে হবে পরকালের সৌভাগ্য। বাস্তবেও তা অক্ষয় সম্পদ ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। জ্ঞানীগণ এর জন্যই আগ্রহী। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে আরয করলেন, সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন,

أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا.

অর্থাৎ, যে মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২৫৯)

তিনটি ওসীলা ছাড়া দুনিয়াতে পরকালীন সৌভাগ্য হাসিল হতে পারে না । এক, ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন ইলম ও সচ্চরিত্রতা। দুই, দৈহিক শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন সুস্বাস্থ্য। তিন, শরীর বহির্ভূত শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন ধনসম্পদ, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

মোটকথা, অর্থসম্পদও বহির্ভূত শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে অন্যতম। এর মধ্যে নিম্নতম হচ্ছে দীনার-দিরহাম, টাকাপয়সা। এগুলো খাদেম তথা সহযোগী। এদের খাদেম কেউ নেই। অন্য বস্তুর কারণে এগুলো কামনা করা হয়। স্বয়ং এগুলোর সত্তা উদ্দেশ্য নয়।

উপরে বর্ণিত বিষয়াবলি সম্পর্কে যার সম্যক ধারণা থাকবে, সে সম্পদের সম্মানিত ও মর্যাদাবান হওয়ার দিকসমূহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করতে পারবে। কারণ, মানুষের সত্তাগত পূর্ণতা অর্জন করার জন্য দরকার শারীরিক বিদ্যমানতা। মানুষের শারীরিকভাবে মওজুদ থাকা নির্ভর করে আহার গ্রহণ ও পোশাক পরিচ্ছদের পর্যাপ্ততার ওপর। আর তার জন্য দরকার হয় সম্পদ।

আর যে ব্যক্তি বস্তুর লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয় এবং বস্তুকে সে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যেই ব্যবহার করে, তার কর্ম সুন্দর ও ফলদায়ক হবে এবং তা দ্বারা অর্জিত উদ্দেশ্য প্রশংসিত বলে বিবেচিত হবে।

তাহলে আমরা বলতে পারি, সম্পদ দ্বারা দুটি জিনিস অর্জন করা যায়। সম্পদকে যদি কল্যাণ কর্মের সহায়ক হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে সেটা হয় প্রশংসিত। আর যদি সম্পদ ব্যয় করা হয় অকল্যাণ কর্মের পেছনে তাহলে সেটা মন্দ বলে বিবেচিত হয়।

কাজেই যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনে অভিলাষি, হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী সে যেনো নিজের অজান্তে ধ্বংসের দিকে পথ চলতে শুরু করেছে।

স্বাভাবিকভাবে মানুষের অন্তর মন্দ প্রবৃত্তির দিকে ঝুঁকে থাকে আর সম্পদ তার কামচরিত্রকে চরিতার্থ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, তাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ সঞ্চয় করা ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়। তাই সকল নবী রাসূলগণ সম্পদের অপকারিতা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! আলে মুহাম্মদকে তুমি এতটুকু উপার্জনের ক্ষমতা দাও, যতটুকু তাদের প্রয়োজন। (সহিহ বুখারী : ৬৪৬০, সহিহ মুসলিম : ১০৫৫, সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬৩৪৩)

রাসূলুল্লাহ (স) আরও দুআ করেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি মিসকিনের মতো জীবিত রাখো। মিসকিন করে মৃত্যু দান করো এবং কেয়ামত দিবসে তুমি মিসকিনদের জামাতে অন্তর্ভুক্ত করে নিও। (জামে তিরমিযী : ২৩৫২; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১২৬)

ইবরাহিম (আ) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে বলেন,

وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ.

আমাকে ও আমার পুত্রদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখুন। (সূরা ইবরাহিম : ৩৫)

এখানে ইবরাহিম (আ) পাথরের মূর্তি বলে মূলগতভাবে উদ্দেশ্য নিয়েছেন ধনসম্পদ। কারণ, তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগে থেকেই মূর্তিপূজা থেকে বিরত ছিলেন। আর মর্যাদাবান একজন নবী হয়ে কী করেই বা তিনি নিজের ক্ষেত্রে পাথুরে মূর্তিকে প্রভু বানিয়ে নেওয়ার সাহস করতে পারেন যখন একজন নবীকে ছোটোবেলা থেকেই মূর্তি পূজা থেকে বিরত রাখা হয়েছে?

তাই এই আয়াতে মূর্তির উপাসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে মূর্তির প্রতি আস্থাশীল হওয়া। ইবরাহিম (আ) এসব বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দীনার-দিরহামের পূজারীরা হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। তারা আর উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারবে না। তাদের দ্বারা সৌন্দর্যপূর্ণ কোনো কিছু করাও সম্ভব হবে না। (সহিহ বুখারী : ২৮৮৭; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৩৬; তাসহিফাতুল মুহাদ্দিসিন, আল আসকারি : ১ : ২৯৯)

এই হাদিসে দীনার-দিরহামের পূজারি বলতে শাব্দিক অর্থে পূজারি উদ্দেশ্য নয়। বরং যাদের মনে দীনার-দিরহাম অর্থাৎ সম্পদের মোহ প্রবল আকার ধারণ করেছে, তারাই হলো এই হাদিসের উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। কারণ, পাথরের সামনে মাথা নতকরণেই শুধু তার পূজারি হয় না। বরং যাদের মনে পাথরের মূর্তির ভক্তি থাকে, শ্রদ্ধা থাকে, তারাও মূর্তিপূজক হিসেবে গণ্য হবে।

অর্থাৎ, যে-কোনো বস্তুর প্রীতি আল্লাহ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্কের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, আল্লাহর অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে মনোবেদনার কারণ হয়, তাকে সেই বস্তুর পূজারি বলা হবে। এটাও শিরকের এক প্রকার।

তবে শিরক দুই ধরনের। ১. শিরকে খফি বা প্রচ্ছন্ন শিরক। এই প্রকারের শিরক থেকে খুব কম মানুষই মুক্ত থাকতে পারে। এই শিরকের কারণে অনন্তকাল জাহান্নামে জ্বলতে হবে না।

২. শিরকে জলি বা প্রকাশ্য শিরক। এর কারণে বান্দাকে অনন্তজীবন জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হতে হবে।

আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন!

ধনসম্পদের উপকারিতা ও অপকারিতা

ধনসম্পদে সাপের বিষও আছে এবং বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্টকারী গুণও আছে। বিষের প্রতিক্রিয়া ধ্বংসকারী গুণ হচ্ছে তার উপকারিতা। যার উপকারিতা ও বিপদাপদ দুটোই জানা আছে, তার পক্ষে ধনসম্পদের অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা এবং কল্যাণপ্রার্থী হওয়া সম্ভব।

ধনসম্পদের দুনিয়াবী ফায়দা বর্ণনা করার দরকার নেই। কেননা, সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যেই এর ফায়দা রয়েছে। যদি তারা এতে ফায়দা না দেখত, তবে এর তালাশে আপ্রাণ চেষ্টা কেন? কিন্তু এর ধর্মীয় উপকারিতা তিন প্রকারে সীমিত।

প্রথম প্রকার, ধনসম্পদকে নিজের জন্য খরচ করা অথবা ইবাদতে খরচ করা কিংবা ইবাদতে সাহায্য গ্রহণের জন্য খরচ করা। ইবাদতে খরচ করা যেমন হজ কিংবা জিহাদে ব্যয় করা। কারণ, এ দুটি মৌলিক ইবাদত ধন-সম্পদ ছাড়া সম্পন্ন হয় না। নিঃস্ব ও দরিদ্র ব্যক্তি এসব ইবাদত আদায়ের সওয়াব পাবে না। ইবাদতে সাহায্য গ্রহণের জন্য খরচ করার অর্থ পোশাক, খাদ্য ও বাসস্থানের জন্য খরচ করা। এতে ইবাদতের শক্তি হাসিল হয়। কেননা, এসব প্রয়োজন অর্জিত না থাকলে অন্তর ধর্মকর্মের সময় ও সুযোগ পায় না। যে জিনিস ব্যতীত ইবাদত সম্পন্ন হয় না, তা লাভ করাও ইবাদত। সুতরাং প্রয়োজন পরিমাণে ধনসম্পদ লাভ করা

ধর্মীয় উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত। তবে একে বিলাসিতায় খরচ করা দুনিয়াদারির শামিল।

দ্বিতীয় প্রকার, যা অন্যান্য মানুষের জন্য খরচ করা হয়। তা চার ধরনের, সদকা দেওয়া, মানবিক কারণে দেওয়া, সম্মান রক্ষার্থে দেওয়া এবং চাকর-বাকরকে মজুরি দেওয়া। সদকা করলে আল্লাহ তাআলার ক্ষোভ প্রশমিত হয়।

মানবিক কারণে খরচ করার অর্থ হলো ধনী ও কুলীন লোকদের দাওয়াতে, উপঢৌকন ইত্যাদিতে খরচ করা। একে সদকা বলা হয় না। সদকা যা অভাবগ্রস্তকে দেওয়া হয়। এ ধরনের ব্যয় ধর্মীয় উপকারিতার মধ্যে গণ্য। যেহেতু মানুষ এই ব্যয় দ্বারা অপরকে বন্ধু ও ভাই বানিয়ে নেয় এবং এতে দানশীলতার গুণ হাসিল হয় সুতরাং এ ধরনের ব্যয়েও অনেক সওয়াব। এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে।

মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে খরচ করার অর্থ সদকার মাধ্যমে কাউকে নিন্দা, গীবত ও শত্রুতা থেকে বিরত রাখা। এর উপকারিতা দুনিয়াতেও পাওয়া যায়। তারপরও এটা ধর্মীয় উপকারিতার অন্যতম। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَاوَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

অর্থাৎ, মানুষ যার মাধ্যমে তার মর্যাদা রক্ষা করে, তা তার জন্য সদকা হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হবে। (আস সুনান, দারাকুতনি : ৩ : ২৮; মুসতাদরাকে হাকেম : ২ : ৫০)

এ ব্যয়ের জন্য গীবতকারী গীবত থেকে বিরত থাকে। বৈরিতা ও হিংসাবশত যে সব কথা মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়, সেগুলোও এরূপ খরচের ফলে বন্ধ থাকে।

কর্মচারীকে মজুরি দেওয়ার অবস্থা এই যে, মানুষ তার সাজসরঞ্জাম তৈরিতে যে সকল কাজের মুখাপেক্ষী হয়, সেগুলো অনেক। এ যাবতীয় কাজ নিজে করলে অনেক সময় ব্যয় হয়ে যায় এবং পরকালের চিন্তা ও ফিকির করা কঠিন হয়। আর যার কাছে সম্পদ নেই তাকে নিজের কাজগুলো নিজেকেই করতে হবে। তাকে বাজার করতে হবে। রান্না করতে হবে। তাকে ঘরদোর পরিষ্কার করতে হবে। এসব কাজ করতে গিয়ে তার অনেক আমল ছুটে যাবে।

তবে কারও যদি কাজের লোক রাখার সামর্থ্য থাকে তাহলে তার উচিত হবে নিজের কাজকর্ম সমাধা ও সবকিছুর দেখভালের জন্য একজন কর্মী নিয়োগ দেওয়া। সামর্থ্য সত্ত্বেও যে এসব কর্মে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, সে ধোঁকায় পড়ে আছে বলে মনে করা হবে। কারণ, ঘরের কাজকর্ম তো যে কেউ করতে পারে। কিন্তু তার মনোজগৎ যে কল্যাণ চিন্তা, আল্লাহর স্মরণে তার একাগ্রতা অন্য কেউ তার হয়ে করে দিতে পারবে না। তাই সেবক রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সেবক না রেখে নিজে সব কাজ করলে শুধু সময়ই নষ্ট হবে।

তৃতীয় প্রকার, যে খরচ কোনো নির্দিষ্ট মানুষের জন্য নয়। বরং তাতে জনগণের ব্যাপক উপকার হয়। যেমন; মসজিদ, সেতু, সরাইখানা, হাসপাতাল, মাদরাসা, কূপ খনন করা অথবা সদকার জন্য ভূমি ও বিষয় সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করা। এ ধরনের ব্যয় দ্বারা মৃত্যুর পরও সওয়াব হয় এবং যে ব্যয় করে, তার জন্য অনেকদিন পর্যন্ত দুআ হতে থাকে। সুতরাং এর চেয়ে অধিক কল্যাণকর কাজ আর কী?

এই হলো দীনি ক্ষেত্রে সম্পদের সামগ্রিক উপকারিতা। এখানে দুনিয়ার উপকারিতার কথা বলা হয়নি। যেমন, হাত পাতার অপদস্থতা ও দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা থেকে মুক্ত থাকা, মানুষের মাঝে সম্মান ও খ্যাতি লাভ করা, বন্ধু বান্ধব বেড়ে যাওয়া। সম্পদ থাকলে দুনিয়ার এসব ফায়দাও মানুষ লাভ করে থাকে।

ধনসম্পদের বিপদাপদ

ধনসম্পদ যেমন কল্যাণকর তেমনি তার বিপদও রয়েছে। দু'ভাবেই বিপদ হতে পারে, যেমন- ধর্মীয় ও জাগতিক। ধর্মীয় বিপদ তিনটি।

এক. ধনসম্পদের কারণে মানুষ ধীরে ধীরে গুনাহ করতে শুরু করে। কেননা, মানুষের মধ্যে খাহেশের দাবি সর্বদা অগ্রগণ্য থাকে। তবে নিঃস্বতার কারণে কিছু করতে পারে না। কিন্তু যখন নিজের মধ্যে আর্থিক ক্ষমতা থাকে, তখন আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। খাহেশ অনুযায়ী গুনাহ করতে শুরু করলে ধ্বংস অনিবার্য। আর সবর করলে দুঃখ ভোগ করে। কারণ, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ধৈর্য ধরা কঠিন। আর দারিদ্র্যের পরিক্ষা ধনাঢ্যতার পরিক্ষার চেয়ে কঠিন।

দুই. ধনসম্পদ থাকলে মুবাহ্ জিনিস দ্বারা বিলাসিতা শুরু হয়। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ধনী, তার জন্য যবের রুটি খাওয়া, মোটা বস্ত্র পরিধান করা এবং সুস্বাদু খাদ্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা সম্ভব হয়ে উঠে না। কাজেই সে উত্তম খাবারই খাবে এবং উত্তম পোশাক পরবে। তার অভ্যাস এভাবেই গড়ে উঠবে। এর ব্যতিক্রম সে সহ্য করতে পারবে না। এমনিভাবে ক্রমশ এক অভ্যাস থেকে অন্য অভ্যাস দেখা দিতে থাকবে। কারও মনে যদি মুবাহ জিনিস উপার্জনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন অনেক ক্ষেত্রে তার পক্ষে হালাল সম্পদ উপার্জন করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।

দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ বিলাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য সে সন্দেহপূর্ণ বিষয় অর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে লৌকিকতা, চাটুকারিতা, মিথ্যাচার, কপটতার মতো মন্দ স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

কারণ, যার সম্পদ বেশি মানুষের কাছে তার মুখাপেক্ষিতাও বেশি। এ কারণে তাকে কপট আচরণ করতে হয়। মানুষের মন রক্ষা করতে গিয়ে আল্লাহর অবাধ্য হতে হয়। তাই সম্পদশালী ব্যক্তি যদিও সরাসরি অন্যায় কর্ম করা থেকে বেঁচে যায়, তবে তার পক্ষে উপর্যুক্ত বিষয়াবলি পরিহার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আর অতিরিক্ত মুখাপেক্ষিতা কখনো হৃদ্যতা কখনো বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে। যার ওপর ভিত্তি করে জন্ম নেয় হিংসা, বিদ্বেষ, লৌকিকতা, অহংকার, মিথ্যা, পরচর্চা, চোগলখুরির মতো দুরারোগও এ সব চারিত্রিক ব্যাধি। এই ব্যাধি এক সময় সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সবকিছুর একমাত্র কারণ হলো, সম্পদপ্রীতি ও সম্পদ সংরক্ষণ ও দেখভালের প্রয়োজনীয়তা।

তিন. এমন আপদ যা থেকে কেউ মুক্ত নয়। তা হলো, মানুষ ধনসম্পদের সংশোধন করার কাজে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়ে যায়। আল্লাহর স্মরণে যা অসুবিধার সৃষ্টি করে, তা ক্ষতির বিষয় ছাড়া কিছুই নয়। এ কারণেই ঈসা (আ) বলেন, ধনসম্পদের মধ্যে তিনটি বিপদ। এক, হালাল উপার্জন না করা। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, যদি কেউ হালাল উপার্জন করে তাহলে? তিনি বললেন, তাহলে সে দ্বিতীয় বিপদের সম্মুখীন হয় অর্থাৎ, সেই উপার্জন সৎ পথে খরচ না করা। লোকেরা বলল, যদি সৎ পথে খরচও করে? তিনি বললেন, তাহলে তৃতীয় বিপদ সামনে আসবে।

অর্থাৎ, তা সামলাতে গিয়ে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী হয়ে যাবে। (আয যুহদুল কাবির, বায়হাকি : ২৪৮)

এটা এক দুরারোগ্য ব্যাধি। কারণ, সকল ইবাদতের মূল হচ্ছে আল্লাহর যিকির ও তাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে ফিকির। এই যিকির ও ফিকিরের জন্য অবসর সময় থাকা দরকার। অথচ ধনী লোকেরা দিন-রাত নানা ঝুটঝামেলার মধ্যে থাকে। শরিকদের সাথে তাকে পানি বণ্টন ও সীমানা নির্ধারণ নিয়ে লড়তে হয়। খাজনা দিতে গিয়ে রাজ কর্মচারীদের সাথে সময় ব্যয় করতে হয়। ভবন নির্মাণে তাকে রাজমিস্ত্রিদের মজুরি দিতে হয়। অসৎ কৃষকদের বিষয়ে তাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। শরিকদারের খেয়ানত নিয়ে চিন্তায় থাকতে হয়। শরিক একাই সব মুনাফা কুক্ষিগত করলো কি না সে দিকে খেয়াল রাখতে হয়। সে কাজে ফাঁকি দিচ্ছে কি না, টাকা অযথা খরচ করছে কি না, সব দিকের চিন্তা তাকে একাই করতে হয়।

এমনই অবস্থা পশুপালনকারীর এবং সম্পদ উপার্জনের সকল ক্ষেত্রের অবস্থাও এই। জমিনের নিচে সম্পদ পুঁতে রাখার মতো নিশ্চিত তারা হতে পারে না। সম্পদ নিয়েই সব সময় চিন্তা ব্যয় করে যায়। কীভাবে তা খরচ করবে। কীভাবে সম্পদ বেহাত হওয়া থেকে বাঁচাবে। মানুষের লোভদৃষ্টি থেকে দূরে রাখবে। এমন বিভিন্ন পার্থিব চিন্তা তার মাথায় এসে ভীর করে। যার থেকে সহসা সে মুক্ত হতে পারে না। আর যে ব্যক্তি দিন আসে দিন খায়, সে নিশ্চিন্তে ইবাদতে মগ্ন থাকতে পারে।

এই হলো পার্থিব সম্পদ অর্জনের আপদ। তবে সম্পদশালী ব্যক্তি দুনিয়াতে যে ভয়-ভীতি, দুঃখ-দুশ্চিন্তা, হিংসা দমনের ক্লান্তি, সম্পদ ব্যয় ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে আরও যত বিপদাপদ আছে, সে সবকিছুর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

সম্পদের বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকার উপায় হলো, নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের জন্য সামান্য কিছু রেখে সম্পদের বাকিটা কল্যাণ কর্মে ব্যয় করা। তা না হলে পদে পদে বিপদের মুখোমুখি হতে হবে।

আল্লাহ আমাদের হেদায়াত দান করুন ও নিরাপদে রাখুন! আমিন।

লোভ-লালসার নিন্দা এবং অল্পেতুষ্টির প্রশংসা

দরিদ্র অবস্থাই সবচে নিরাপদ। দরিদ্র ব্যক্তির উচিত, অল্পেতুষ্ট থাকা এবং অন্যের ধনসম্পদের প্রতি লোভ না করা। ধনীদের নিকট কোনো কিছুর আশা না করা। এটা তখন হাসিল হবে; যখন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান থেকে যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে। এক্ষেত্রে নিজের আশাকে একদিন অথবা এক মাসের চেয়ে বেশি লম্বা না করাও উচিত। যদি কেউ অধিক ধন ও দীর্ঘ আশায় আগ্রহী হয়, তাহলে সে অল্পেতুষ্টির সম্মান থেকে মাহরূম থাকবে এবং লোভের অপবিত্রতা দ্বারা কলঙ্কিত হবে। লোভ-লালসা মানুষকে মন্দ কাজ ও অমানবিক কর্মকাণ্ডের প্রতি প্রলুব্ধ করে। আর মানুষের সামনে লোভ-লালসা আকর্ষণীয় বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত হয়। হাদীসে আছে,

لَوْ أَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ تَابَ.

অর্থাৎ, আদম সন্তানের যদি দুটি সোনার পাহাড় থাকে, তাহলে সে এগুলোর পরও তৃতীয়টি কামনা করবে। মাটিই শুধু মানুষের পেট ভরতে পারে। আর যে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। (সহিহ বুখারী : ৬৪৩৯, ৬৪৩৬, সহিহ মুসলিম : ১০৪৮, ১০৪৯)

আবু ওয়াকিদ লাইসি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যখন ওহি নাযিল হতো, আমরা তাঁর কাছে ওহির বাণী শিখতে যেতাম। একদিন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, নামায আদায় ও যাকাত প্রদানে সহায়তার জন্য আমি সম্পদ সৃষ্টি করেছি। আদম সন্তানকে যদি একটি স্বর্ণের উপত্যকা দেওয়া হয়, সে দ্বিতীয়টা পেলে তৃতীয়টা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করবে।

আদম সন্তানের (কামনার) উদর মাটিই ভরতে পারবে। আর আল্লাহ তাওবাকারীর তওবা কবুল করেন। (ফাযাইলুল কুরআন, আবু উবাইদ : ৩২২; মুসনাদে আহমদ : ৫ : ২১৫; আল-মুজামুল কাবির, তাবারানী : ৩ : ২৪২; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৯৮০০)

আবু মুসা আশআরি (রা) বলেন, সূরা বারাআহ (তাওবা)-এর মতো অন্য একটি সূরা অবতীর্ণ করা হয়েছিলো, পরে সেটা রহিত হয়ে যায়। তবে

সেই সূরার একটি আয়াত এখনো আমলযোগ্য হিসেবে আছে। সেটা হলো, আল্লাহ অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দিয়ে এই দীনের সহায়তা করবেন। মানুষকে যদি স্বর্ণের পূর্ণ দুটি উপত্যকা দান করা হয় তাহলে সে তৃতীয় আরেকটি পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষী হবে।

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَنْهُوْمَانِ لَايَشْبَعَانِ مَنْهُوْمُ الْعِلْمِ وَمَنْهُوْمُ الْمَالِ.

অর্থাৎ, দুই লোভী কখনোই তৃপ্ত হয় না– জ্ঞানের লোভী ও অর্থের লোভী। (মুসতাদরাকে হাকেম : ১ : ৯২)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ : اَلْاَمَلُ وَحُبُّ الْمَالِ.

অর্থাৎ, আদম সন্তান বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, আর তার আশা ও অর্থের লোভ যুবক হতে থাকে। (সহিহ বুখারী : ৬৪২১, সহিহ মুসলিম : ১০৪৭)

অর্থের প্রতি মানুষের এই স্বভাবগত লোভ-লালসার ফলেই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (স) অল্পেতুষ্টির প্রশংসা করেছেন। রাসূলে আকরাম (স) বলেন,

طُوْبٰى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ بِهِ.

অর্থাৎ, তার জন্য সাধুবাদ, যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়, যার জীবন জীবিকাধারণ পরিমাণে সীমিত হয় এবং তাতেই সে তৃপ্ত থাকে। (জামে তিরমিযী : ২৩৪৯; আস সুনানুল কুবরা, সুনানে নাসায়ী : ৯৭৯৩)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ধনী-গরিব সকল মানুষ কিয়ামতের দিন দুনিয়ার সামান্য আহার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৪০)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যার সম্পদের প্রাচুর্য আছে, সে সচ্ছল নয়। প্রকৃত সচ্ছল সে, যে প্রকৃত হৃদয়ের অধিকারী। (সহিহ বুখারী : ৬৪৪৬, সহিহ মুসলিম : ১০৫১)

রাসূলুল্লাহ (স) অতিলোভী পীড়াপীড়ি করে যাচনাকারীদের বলেন, লোক সকল! সভ্য উপায়ে তোমরা যাচনা করো। কারণ, ভাগ্যে যা আছে, মানুষ তাই পাবে। বাধ্য করে হলেও মানুষ দুনিয়াতে তার প্রাপ্য রিযিক ভোগ করে মৃত্যুবরণ করবে। (অনুরূপ অর্থে : মুসতাদরাকে হাকেম : ২ : ৪)

বর্ণিত আছে, মূসা (আ) আল্লাহ তাআলাকে প্রশ্ন করলেন, ইয়া ইলাহী! তোমার বান্দাদের মধ্যে কে অধিক ধনী? ইরশাদ হলো, যে আমার দানে অধিকতর তুষ্ট থাকে। আবার প্রশ্ন করা হলো, অধিক ন্যায়পরায়ণ কে? উত্তর দেওয়া হলো, যে নিজের সাথে ইনসাফ করে। (আয যুহদ, হান্নাদ : ৪৮৯)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, রুহুল কুদূস আমার অন্তরে এ বিষয়টি প্রবিষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষ তার নির্ধারিত রিযিক ভোগ না করে মৃত্যুবরণ করবে না। কাজেই তোমরা সকলে আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দরভাবে যাচনা করো। (মুসতাদরাকে হাকেম : ২ : ৪, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২১৪৪)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলেছেন, হে আবু হুরায়রা! যখন তুমি প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত হও, তখন একটি রুটি ও এক পেয়ালা পানিকে যথেষ্ট মনে করো এবং দুনিয়াকে লাথি মারো। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৯৮৮১)

তিনি আরও বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পরহেযগারি অবলম্বন করো; সর্বাধিক ইবাদতকারী হয়ে যাবে। অল্পেতুষ্ট থাকো; সর্বাধিক শোকরকারী হবে। অন্যের জন্য তা-ই কামনা করো, যা নিজের জন্য কামনা করে থাক। এতে খাঁটি মুমিন হয়ে যাবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২১৭, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৫৩৬৬)

রাসূলুল্লাহ (স) লোভ করতে নিষেধ করেছেন। আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বর্ণনা করেন- এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কোনো সংক্ষিপ্ত উপদেশ দিন। তিনি বললেন, বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়ো। এমন কথা বলো না, আগামীকাল যার ওযর পেশ করতে হয়। অন্যের হাতে যা আছে, তার প্রতি লোভ করো না। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৭১)

আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রা) বলেন, আমরা সাত অথবা আট অথবা নয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে হাজির ছিলাম। তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর রাসূলের হাতে বাইআত করো না কেন? আমরা আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি বাইআত করিনি? তিনি বললেন, তোমরা আল্লাহর রাসূলের হাতে বাইআত করোনি। এরপর

আমরা বাইআতের জন্য হাত বাড়ালাম। এমন সময় আমাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, আমরা তো পূর্বে বাইআত করেছি। এখন আবার কোন বিষয়ের জন্য এই বাইআত? তিনি বললেন, এ বিষয়ের জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। আগ্রহের সাথে কারও আনুগত্য করবে। এরপর একটি কথা আস্তে বললেন, মানুষের নিকট কিছু কামনা করবে না। বর্ণনাকারী বলেন, এই লোকদের মধ্যে অনেকেই এই বাইআতটি এমনভাবে পালন করেন যে, তাদের চাবুক মাটিতে পড়ে গেলেও কাউকে তুলে দিতে বলতেন না। (অর্থাৎ, তারা চাওয়া থেকে এতটুকু বিরত থাকতেন।) (সহিহ মুসলিম : ১০৪৩; সুনানে আবু দাউদ : ১৬৪২; সুনানে নাসায়ী : ১ : ২২৯)

আসার

উমর (রা) বলেন, লোভ হচ্ছে দরিদ্রতা এবং মানুষের নিকট কামনা না করা হচ্ছে ধনাঢ্যতা। যে অন্যজনের কাছে কোনো কিছু কামনা করে না, সে অমুখাপেক্ষী থাকে। (কিতাবুয যুহদ, ইবনে মুবারক : ৬৩১)

এক দার্শনিককে কেউ জিজ্ঞেস করল, ধনাঢ্যতা কী? তিনি বললেন, কম আশা করা এবং যতটুকুতে চলে, ততটুকুতে তুষ্ট হওয়ার নাম ধনাঢ্যতা। (আল ফাওয়াইদ, আবু বকর আশ-শাশী : ৬)

এ সম্পর্কে কবি বলেন—

জীবন হলো কিছু সময়ের সমষ্টি মাত্র। যা অতিবাহিত হয়ে যায়। আর বিপদাপদ অনেক, যা বারবার ফিরে আসে।

অল্পেতুষ্টির জীবনযাপন করো, সুখে থাকবে। প্রবৃত্তিকে ত্যাগ করো, স্বাধিন ভাবে জীবনযাপন করবে।

অনেক মৃত্যু এ স্বর্ণ ও মণিমুক্তার কারণে হয়ে থাকে। (শরহু আহজাতিল বালাগাহ : ১৯:১৬৩)

একদিন মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসে (র) শুকনো রুটি পানিতে ভিজিয়ে খাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, এই আহারের ওপর যে তুষ্ট থাকতে পারবে, তার কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে না। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩৫৩)

সুফিয়ান সাওরি (র) বলেন, তোমার জন্য দুনিয়া তখন ভালো হয়, যখন তুমি তাতে ব্যতিব্যস্ত হবে না। আর দুনিয়ার ধনসম্পদের মধ্যে তোমার জন্য তাই উত্তম, যা তোমার হাতছাড়া হয়ে যায়। (ইবনুল মুবারক, আয যুহদ : ৫৪১)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, প্রতিদিন একজন ফেরেশতা মানুষদের ডেকে ডেকে বলেন, 'হে আদম সন্তানেরা! প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ অল্প সম্পদ তোমার জন্য এত পরিমাণ সম্পদের চেয়ে উত্তম, যা তোমাকে অবাধ্য করে তোলে। (কূতুল কুলূব)

শুমাইত ইবনে আজালান (র) বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার পেট বিঘত পরিমাণ জায়গা মাত্র। অযথা তাতে কেন তুমি আগুন ভরছো?! (কূতুল কুলূব)

কোনো একজন দার্শনিককে সম্পদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সম্পদ হলো বাহ্যিক সৌন্দর্য। উহ্য কামনা আর অন্যের সম্পদ প্রত্যক্ষ করে হতাশায় মুষড়ে পড়া।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! সমগ্র পৃথিবীর সবকিছু যদি তোমাকে দিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তুমি দৈনিক তোমার জন্য নির্ধারিত খাদ্যটুকুই পাবে। অথচ দেখো, আমি তোমাকে প্রতিদিন আহার দান করছি। সাথে সাথে বিশ্বজোড়া এত বিশাল সম্পত্তির হিসাব নিকাশ থেকেও তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি। কাজেই আমি তোমার সবচেয়ে বড় মুহসিন।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তোমরা কারও কাছে কিছু চাইলে সহজভাবে চাও এবং কারও কাছে গিয়ে বলো না, তোমাকে এই দেওয়া হয়েছে। এত এত দেওয়া হয়েছে। কারণ, যার ভাগ্যে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে সে তাই পাবে। (আল আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী : ৭৭৯)

উমাইয়া বংশের কোনো এক ব্যক্তি আবু হাযেম (র)-এর নিকট পত্র লিখলো, আপনি আমাকে সমর্থন দিন। তাহলে আপনার সব হাজত আমি পূরণ করে দেবো। চিঠির উত্তরে আবু হাযেম (র) লিখলেন, আমার প্রয়োজনের কথা আমি রবের কাছে বলেছি। তিনি আমাকে যা দিয়েছেন, সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছি। যা তিনি দেননি, প্রশান্তচিত্তে মেনে নিয়েছি। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ২৩৭)

কোনো এক দার্শনিককে জিজ্ঞেস করা হলো, বুদ্ধিমানের জন্য সবচেয়ে আনন্দের বিষয় কী? আর কোন জিনিস দুঃখবোধ কমাতে সাহায্য করে? সে উত্তর দিলো, নিজের কৃত নেক আমল বুদ্ধিমানের কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দের উপলক্ষ্য। তাকদিরের হাতে নিজেকে সোপর্দ করে দিলে দুঃখবোধ অনেকটা কমে আসে। (কূতুল কুলূব)

জনৈক দার্শনিক বলেন, হিংসাকাতর ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ভোগে। অল্পেতুষ্ট মানুষ সবচেয়ে নির্ভার জীবনযাপন করে। লোভী ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি কষ্ট সহ্য করতে পারে। দুনিয়া ভোলা ব্যক্তি সবচেয়ে সুখী জীবনযাপন করে। স্বেচ্ছাচারি আলেম সবচেয়ে বেশি লজ্জিত হয়।

কবি বলেন—

ওই যুবক সন্তুষ্ট, যে এ বিশ্বাস রাখে যে, যিনি রিযিক বন্টন করেন, তিনি আমাকেও রিযিক দিবেন। তার সম্মান সুরক্ষিত। সে তাতে দাগ লাগতে দেয় না। তার চেহারা উজ্জ্বল, সে তা নষ্ট হতে দেয় না। সে ব্যক্তি অল্পেতুষ্টি অবলম্বন করে, সে কখনো অসন্তুষ্ট হবে না। (দিওয়ান, আতাবি : ৮৪)

কবি আরও বলেন—

আমি যখন পর্যন্ত সফরে ও হজের আহকাম পালনে অবিরাম আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকি তখন দেশ ও বন্ধুবান্ধব থেকে দূরে থাকি। তারা জানে না আমি কী অবস্থায় আছি।

আমি কখনো পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে কখনো পশ্চিম প্রান্তে থাকি। দুনিয়ার লোভে আমার মৃত্যুর কথাও স্মরণ থাকে না।

আমি যদি অল্পেতুষ্ট থাকি তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই আমি রিযিক পেয়ে যাব। মানুষ অল্পেতুষ্টির কারণে ধনী হয়; অধিক সম্পদের কারণে নয়। (দিওয়ান, আবুল আতাহিয়া : ৬২৮)

ওমর (রা) বলেন, তোমরা কি জানো, আমি আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ থেকে কতটুকু ব্যবহার করি? আমার শুধু শীত-গ্রীষ্মের জন্য দুটি কাপড় এবং হজ -ওমরার ইহরামের জন্য ভিন্ন একটি পোশাক রয়েছে। কুরাইশের একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবে যে খাবার খায় সেটাই আমার প্রতিদিনের আহার। আমি তাদের মহৎ কেউ নই। তাদের চেয়ে নিকৃষ্টও নই। আল্লাহর কসম!

আমি জানি না, এই পরিমাণ সম্পদ রাখা কি আমার জন্য বৈধ না অবৈধ! (আল আমওয়াল, ইবনে যানজুয়া : ৯৮৯, তারিখু দিমাশক, ইবনে আসাকির : ৪৪ : ২৭০)

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, ওমর (রা) নিজের ব্যবহার্য সম্পত্তি নিয়ে নিজেই সন্দিহান ছিলেন, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পরিমাণে কিছু তিনি ব্যবহার করে ফেলছেন নাতো!

এক বেদুঈন লোভ করার কারণে তার ভাইকে নিন্দা করে বলেন, ভাই! তুমি একই সাথে প্রার্থী ও প্রার্থিত। যা তোমাকে খুঁজছে (অর্থাৎ মৃত্যু), তা থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না। আর তুমি যা প্রার্থনা করছো (অর্থাৎ রিযিক), তা তোমার কাছে পৌঁছবেই।

যা তোমাকে খুঁজছে যদিও তা চোখে দেখা যাচ্ছে না; কিন্তু তা তোমার সামনেই রয়েছে। বর্তমানে তুমি সে অবস্থায় রয়েছ সে অবস্থায় সব সময় তুমি থাকবে না। ভাই! তুমি এ ভুল ধারণায় নেই তো লোভী বঞ্চিত হয় না। আর দুনিয়াত্যাগী রিযিক পায় না! (যুহদ, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩১৪)

এক কবি বলেন,

আমি দেখছি, বিত্ত ও দুনিয়ার প্রতি তোমার লোভ বাড়িয়ে দিচ্ছে, যেন তুমি মরবেই না।

তোমার এ লোভের কি কোনো শেষ নেই? যদি কোনোদিন তুমি দুনিয়া পেয়ে যাও তাহলে কি বলতে পরবে-যথেষ্ট হয়েছে। আমি এর প্রতি সন্তুষ্ট আছি? (দিওয়ান, মাহমুদ আল ওয়াররাক : ৮৯)

শাবি (র) বলেন, একবার এক শিকারি একটি ভরত পাখি শিকার করলো। তখন শিকারির কাছে পাখিটি বললো, আমাকে দিয়ে তুমি কী করবে? শিকারি বললো, তোমাকে প্রথমে জবাই করবো, তারপর তেলে ভেজে খাবো। ভরত পাখি বললো, আমাকে খেয়ে কী হবে তোমার? না পেট ভরবে, না তুমি তৃপ্তি পাবে? তার চেয়ে বরং আমি তোমাকে উত্তম তিনটি কথা শিক্ষা দিচ্ছি। তবে শর্ত আছে। শিকারি শর্তটি জানতে চাইলো। পাখিটি বললো, আমি তোমাকে প্রথম উপদেশ দেবো তোমার হাতে বসে। দ্বিতীয় উপদেশ দেবো গাছের ডালে বসে। আর তৃতীয় উপদেশ দেবো ওই পাহাড়ের চূড়ায় বসে।

শিকারি শর্তগুলো মেনে নিলো এবং প্রথম উপদেশ শোনাতে বললো। পাখিটি বললো, যা হারিয়ে যায় তা নিয়ে আপসোস করো না। শিকারি পাখিটি ছেড়ে দিলো। সে উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসলো। শিকারি বললো, এবার দ্বিতীয় উপদেশ শোনাও। পাখি বললো, অসম্ভবকে সম্ভব বলে বিশ্বাস করো না। এবার পাখিটি উড়ে গিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় বসলো। সেখান থেকে শিকারির উদ্দেশ্যে বললো, আরে হতভাগা! তুমি আমাকে জবাই না করে ভুলই করলে, যদি জবাই করতে আমার পেটে বিশ মিসকালের দুটি রত্ন পেয়ে যেতে। পাহাড়ের উপর থেকে ভেসে আসা ভরত পাখির কথা শুনে শিকারি আপসোসে শেষ। সে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বললো, এবার তৃতীয় উপদেশটি শোনাও।

পাখিটি এবার শিকারির উদ্দেশ্যে উপহাসের সুরে বললো, তুমি আমার প্রথম উপদেশ দুটিই তো মনে রাখতে পারোনি। তৃতীয়টা শুনে কী করবে? যা হারিয়ে গেছে তা নিয়ে আপসোস করতে নিষেধ করলাম, তুমি তাই করলে। হাড়-মাংস-রক্ত সবকিছু নিয়েও তো এখন আমার শরীরের ওজন বিশ মিসকাল হবে না। তাহলে কী করে ভাবলে যে আমার পেটে বিশ মিসকালের দুটি রত্ন আছে? এই বলে পাখিটি উড়ে চলে গেলো। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪ : ৩১৬)

এই হলো মানুষের স্বভাবের প্রতিকীরূপ। লোভে পড়ে মানুষের বাস্তবদর্শনের চোখে পর্দার আড়াল পড়ে যায়। তখন সে যা সম্ভব নয় সেদিকে হাত বাড়ায়।

ইবনে সামমাক (র) বলেন, দীর্ঘ আশা আকাঙ্ক্ষা হলো অন্তর ঘিরে থাকা রশি। আর পা বেঁধে রাখা শেকল। আকাঙ্ক্ষা ও বাসনাকে তুমি মন থেকে বের করে দাও। তোমার পা সে শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে যাবে। (রওজাতুল উকালা, ইবনু হিব্বান : ১৪০)

আবু মুহাম্মাদ ইয়াজিদী (র) বলেন, একদিন আমি খলিফা হারুনুর রশিদের দরবারে গিয়ে দেখলাম, তিনি স্বর্ণের অক্ষরে লেখা এক খণ্ড কাগজের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমাকে দেখে তার ঠোঁটে মৃদু হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। আমি বললাম, আমিরুল মুমিনিনকে আল্লাহ তাআলা কি উপকারী কিছু দান করেছেন?

তিনি বললেন, এই পঙ্‌ক্তি দুটি লেখা কাগজের টুকরোটা আমি বনি উমাইয়ার কতক ভান্ডারের মধ্যে পেয়েছি। পঙ্‌ক্তির মর্ম আমাকে নাড়া দিয়ে গেছে। আর আমিও তৃতীয় আরেকটা পঙ্‌ক্তি আগের দুটোর সাথে সংযোজন করেছি। শোনো কী লেখা আছে এতে,

প্রয়োজনহীনতা যদি তোমার জন্য কোনো দরজার অর্গল তুলে দেয়,

তাকে ছেড়ে দাও, জবরদস্তি করো না

প্রয়োজন হলে আপনা থেকে খুলে যাবে সেই দুয়ার।

তোমার তো পেট ভরলেই চলে, আর মন্দ বিষয়গুলো ত্যাগ করাই শোভন

সবার কাছে তুমি সম্মান ফেরি করে বেড়িয়ো না

অপরাধজগতের দিকে পা বাড়িয়ো না

পরিণাম তোমার শুভই হবে। (বাহজাতুল মাজালিস : ৩:৩১০)

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম কাব (রা)-এর কাছে জানতে চাইলেন, জ্ঞান-দক্ষতা অর্জন করার পরও কী করলে মানুষ জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে? কাব (রা) উত্তর দিলেন, সেগুলো হলো লোভ-লালসা ও প্রয়োজনের পেছনে ছুটতে থাকা। (তারিখু দিমাশক, ইবনে আসাকির : ৫০ : ১৭১)

জনৈক ব্যক্তি ফুযাইল (র)-এর কাছে কাব (রা)-এর সংক্ষিপ্ত কথার ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি বলেন,

মানুষের যখন কোনো জিনিস দেখে লোভ হয় তখন সে জিনিসটি পেতে সচেষ্ট হয়। ফলে দীন পালনে তার মধ্যে ত্রুটি দেখা দেয়।

লালসা মানুষকে চাহিদার ভারে ন্যুব্জ করে ফেলে। যা দেখে সবকিছুই নিজের করে পেতে চায়। সবাইকে সে নিজের আওতার মধ্যে রাখতে চায়। একসময় অবস্থা এমন হয়, প্রয়োজন তাকে নাকে দড়ি পরিয়ে ঘোরায়। তার ওপর প্রয়োজন চেপে বসে। তখন ব্যক্তি নিজেকে চাহিদার হাতে সপে দিতে বাধ্য হয়। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে দেখা হলে দুনিয়ার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সালাম দেয়। অসুস্থ হলে দেখতে যায়। তার এসব কাজের মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা থাকে না।

তার কাছে যদি ব্যক্তির কোনো প্রয়োজন না থাকতো তবে কতই না ভালো হতো! এই ব্যাখ্যা করার পর ফুযাইল (র) বলেন, অমুক অমুকের কাছ

থেকে শত শত হাদিস শোনার চাইতে এমন একটা কথা শোনাই তোমার জন্য মঙ্গলজনক হবে। (কাজি ফুযাইল ইবনে আয়ায : আল ইলমা : ১৯৪)

জনৈক দার্শনিক বলেন, মানুষকে যদি বলা হয়, তোমাদের চিরস্থায়ী নিবাস ভূমি হিসেবে পৃথিবীকে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাহলে স্বল্প ক বছরের জীবনে যত কিছুর প্রতি লোভ সে করেছে দীর্ঘ জীবনে সে সবের চেয়ে বেশি কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা সে করতে পারবে না। এই হলো মানব চরিত্রের আশ্চর্য এক বিষয়। (ইতহাফুস সাদতিল মুত্তাকীন : ৯ : ১৬৪)

আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (র) বলেন, একদিন পথ চলতে গিয়ে দুনিয়াত্যাগী এক রাহেবের সাথে আমার দেখা হলো। আমি তাকে বললাম, আপনি খাবার জোগার করেন কী করে? সে (নিজের দাঁতের দিকে ইশারা করে) বললো, আল্লাহর মাড়াই কল থেকে। যিনি এই মাড়াই কল সৃষ্টি করেছেন, সেখানে শস্য পৌঁছানোর জিম্মাদারি তারই। (তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৬ : ১১)

লোভ-লালসার প্রতিকার এবং অল্পেতুষ্টি হাসিলের পন্থা

লোভ-লালসার প্রতিকার তিনটি বিষয়ে নিহিত-সবর, ইলম ও আমল। পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে এগুলো এসে যায়।

এক. আমল। যে ব্যক্তি অল্পেতুষ্টির গৌরব লাভ করতে চায়, সে যেন যথাসম্ভব ব্যয়ের খরচের দ্বার বন্ধ রাখে। কেননা, যার ব্যয়ের মাত্রা বেশি হবে, সে অল্পেতুষ্ট হতে পারবে না। যেমন— একা হলে একটি মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকবে এবং কম রুটি ও কম তরকারি খাওয়ার অভ্যাস করবে। আর সন্তানসন্ততি থাকলে তাদের প্রত্যেককেই এভাবে ভরণপোষণ দেবে। যেহেতু সামান্য পরিশ্রমেই এতটুকু জীবিকা হাসিল হতে পারে। তাই রিযিকের তালাশও কম হবে এবং জীবন মধ্যপন্থায় অতিবাহিত হবে, অল্পেতুষ্টির ক্ষেত্রে যা মূল উদ্দিষ্ট। একেই বলা হয় "রিফক ফিল ইনফাক" অর্থাৎ, অর্থ ব্যয়ে নম্রতা করা। হাদীসে এ বিষয়টি এভাবে উল্লিখিত হয়েছে,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সব ব্যাপারে নমনীয়তা ভালোবাসেন। (সহিহ বুখারী : ৬০২৪; সহিহ মুসলিম : ২১৬৫)

অন্যত্র বলা হয়েছে- مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ

অর্থাৎ, যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, সে গরীব হয় না। (মুসনাদে আহমাদ : ১ : ৪৪৭; ইসলাহুল মাল, ইবনু আবিদ দুনিয়া : ৩৪৮)

আরও বর্ণিত আছে–

ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ. خَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ وَالْعَدْلُ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ.

অর্থাৎ, উদ্ধারকারী বিষয় তিনটি, গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করা, সচ্ছলতায় ও দরিদ্রতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা এবং সন্তুষ্টি ও রাগের অবস্থায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। (ইতিদালুল কুলুব, খারাইতি : ১০২; হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৩৪৩)

একবার এক লোক দেখলো, আবু যর (রা) জমিন থেকে একটি দানা কুড়িয়ে হাতে নিচ্ছেন আর বলছেন, মধ্যপন্থায় জীবনযাপন করাই হলো বিচক্ষণতার পরিচায়ক। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৬১৪৪)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নবুওয়াতের বিশের অধিক অংশের কিছু অংশ হলো- মধ্যপন্থা অবলম্বন, উত্তম পথ গ্রহণ ও সরল পথ প্রদর্শন। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৭৬, জামে তিরমিযী : ২০১০)

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, পরিণাম বুঝে ব্যয় করা হলো জীবনযাপনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অর্ধাংশ। (মুসনাদুশ শিহাব, কাযায়ি : ৩২; মুসনাদুল ফিরদাউস, দায়লামি : ৩৪২১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কোনো কাজের নিয়ত করলে তুমি মধ্যপন্থায় তা সম্পন্ন করো, যাতে আল্লাহ তোমাকে স্বস্থি দান করেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ২৫৮২১; আল আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারী : ৮৮৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَنِ اقْتَصَدَ اَغْنَاهُ اللهُ وَمَنَ بَذَرَ فَقَرَهُ اللهُ وَمَنَ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ اَحَبَّهُ اللهُ.

অর্থাৎ, যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, তাকে আল্লাহ সম্পদশালী করেন। যে অকারণে ব্যয় করে, আল্লাহ তাকে গরীব করে দেন। আর যে আল্লাহকে স্মরণ করে, আল্লাহ তাকে প্রিয় করে নেন। (ইবনে আবিদ দুনিয়া : ইসলাহুল মাল : ৩২৮)

এ থেকে বোঝা গেল, ব্যয় প্রয়োজন অনুপাতেই হওয়া জরুরি।

দুই. যথেষ্ট পরিমাণ ধনসম্পদ হাতে থাকলে ভবিষ্যতের জন্য অস্থির হওয়া উচিত নয়। এ অবস্থা অর্জিত হওয়ার জন্য কম আকাঙ্ক্ষা করতে হবে এবং মনে করতে হবে, তাকদিরে যে রিযিক আছে, তা অবশ্যই পৌঁছবে। এতে লোভ করা-না করা সমান। লোভ করলেই রুজি পাওয়া যায় না। বরং আল্লাহর প্রতিশ্রুতির ওপর ভরসা রাখা উচিত। তিনি বলেন, وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। (সূরা হুদ : ৬)

লোভ শয়তান থেকে মানুষের মধ্যে আসে। অভিশপ্ত শয়তান মনের মাঝে জাগরুক করে যে, বেশি খরচ করলে গরীব হয়ে যাবে। সঞ্চয় না করলে অসুস্থতার সময় ভিক্ষা করতে হবে। সে এমনিভাবে মানুষকে অর্থ উপার্জনের কষ্টে লিপ্ত করে। এরপর নিজে তার কার্যকলাপ দেখে হাসে। দেখো, ভবিষ্যতে কষ্টের আশঙ্কায় বর্তমানে কতো কষ্ট করে যাচ্ছে। এটা কী করে জানা গেল যে, ভবিষ্যতে কষ্ট অবশ্যই হবে। তেমন কষ্ট তো নাও হতে পারে।

বর্ণিত আছে, খালিদ (রা)-এর দুই ছেলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, যে পর্যন্ত তোমাদের মাথা নড়াচড়া করে অর্থাৎ, সারাজীবন রিযিক থেকে নিরাশ হয়ো না। দেখো, মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে (বস্ত্রহীন) উলঙ্গ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে খাবারের ব্যবস্থা করে দেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৬৫, আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৪ : ৭)

একদিন রাসূলে আকরাম (স) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে বিমর্ষ অবস্থায় বসে থাকতে দেখে বললেন, দুঃখ করা অহেতুক। যা হবার তা হবেই। যে পরিমাণ রিযিক ভাগ্যে আছে, তা আসবেই। (ইবনু আবিদ দুনিয়া, আল ফারজু বা'দাশ শিদ্দাহ : ১৯, আবু নুআইম : মারিফাতুস সাহাবা : ২ : ৯৪৪, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১১৪৪)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, লোক সকল! তোমরা সুন্দর করে প্রার্থনা করো। কারণ, তাকদীরে যা আছে তা-ই সে পাবে। বাধ্য হয়ে গ্রহণ করলেও দুনিয়ায় তার জন্য বরাদ্ধ নিয়ামত ভোগ করেই মানুষ মৃত্যুবরণ করবে। (অনুরূপ অর্থে মুসনাদে আহমদ : ২ : ৪)

মানুষ যখন পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে যে, তার তাকদীরে অবশ্যই রিযিক আছে, তখনই সে লোভ-লালসা থেকে পৃথক হয়ে যায়। এর সাথে এ কথাও বিশ্বাস করা জরুরি যে, তালাশ করতে ভুল করলেও তাকদীরের রিযিক অবশ্যই পেয়ে যাবে; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তার কল্পনাতীত স্থান থেকে রিযিক পৌঁছিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا، وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ করে দেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করেন। (সূরা তালাক : ২-৩)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাকে অকল্পনীয় সব স্থান থেকে রিযিক দান করেন। (ইবনে হিব্বান : আল মাজরুহিন : ১ : ১৬১, মুসনাদুশ শিহাব, কাযায়ি : ৫৮৫, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১১৫২)

সুফিয়ান সাওরি (র) বলেন, তোমরা সবাই মুত্তাকি হয়ে যাও। কারণ, আমি কোনো মুত্তাকিকে প্রয়োজন নিয়ে পড়ে থাকতে দেখিনি। অর্থাৎ কোনো খোদাভীরু ব্যক্তির প্রয়োজন অপূর্ণ থাকে না। বরং অপর বান্দাদের অন্তরে মুত্তাকি ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের তাগিদ আল্লাহ তাআলা দিয়ে দেন।

মুফাদ্দাল দাবঈ (র) বলেন, আমি এক আরব বেদুঈনকে প্রশ্ন করলাম, কীভাবে তোমাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হয়? সে বললো, হাজিদের পানি পান করিয়ে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি। আমি বললাম, হজের মওসুম শেষ হয়ে গেলে তোমার কী করে চলে? আমার প্রশ্ন শুনে বেদুঈন লোকটার চোখ অশ্রুতে ভিজে উঠলো। সে বললো, কীভাবে আমরা বেঁচে আছি তাই যদি আমাদের জানা থাকতো তাহলে হয়তো আমাদের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। (তারিখু দিমাশক, ইবনুল আসাকির : ৫৫ : ২৪৮)

আবু হাযেম (র) বলেন, আমার দৃষ্টিতে দুনিয়া দুই ধরনের বস্তুর সমষ্টিগত রূপ। তার মধ্যে এক ধরনের বস্তু আমার জন্য নির্ধারিত। আসমান-জমিনের সর্বশক্তি এক সাথে প্রয়োগ করেও সময়ের আগে তা অর্জন করার সামর্থ্য আমার নেই। অন্য ধরনের বস্তু হলো, যা অন্যকে দেওয়া হয়। অতীতে কোনো দিন তা আমার হাতে আসেনি। ভবিষ্যতে পাবো বলেও মনে হয় না। কাজেই আমাকে যা দেওয়া হয় অন্যকে তা

দেওয়া হয় না। আবার অন্যকে যা দেওয়া হয় আমি তার দেখা পাই না। তাহলে কীসের পেছনে ছুটে কেটে যাচ্ছে তোমার বেঁচে থাকার দিনগুলো? (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১২৪০, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ২৩৭)

এতক্ষণ আমরা লোভ দমনের দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ, শয়তানের পক্ষ থেকে দারিদ্র্যের ভয় দেখানোর পথকে রুদ্ধ করার বিষয়ে আলোচনা করলাম।

তিন. অল্পেতুষ্টির ফায়দা জানতে হবে, এর বদৌলতে অমুখাপেক্ষিতার গৌরব লাভ হয় এবং লোভের ফলে দুঃখ-যাতনা ভোগ করতে হয়। অন্তরে এ বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে গেলে মানুষ অল্পেতুষ্টির প্রতিই বেশি আকাঙ্ক্ষী হবে। কারণ, লোভ-লালসা মানুষকে ক্লান্ত করে, অপমানিত করে। আর অল্পেতুষ্টিতে রয়েছে শুধু প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন অতিরিক্ত বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা। আর এ কষ্টের খবর শুধু আল্লাহ তাআলার কাছেই থাকে। আর মূল ফায়দা হিসেবে রয়েছে অনন্ত আখেরাতের সাওয়াব।

লোভ-লালসার সাথে মানুষের মুখের মন্দ কথার সম্পর্ক থাকে। লোভ-লালসা নিজেই বিপদাপদ ও দুঃখ দুর্দশার কারণ। লোভী ব্যক্তির আত্মসম্মান বলতে কিছু থাকে না। তার পক্ষে সত্যের সাথে চলা সম্ভব হয় না। কারণ, যারা লোভী তাদের প্রয়োজন ফুরাতে চায় না। তাই সত্য পথের আহ্বান নিয়ে কেউ তার কাছে যেতে পারে না। তাকে ঘিরে থাকে চাটুকারেরা। ফলে সে ধর্মের বিধিবিধান পালন থেকেও দূরে সরে যায়। আর যে আত্মসম্মানকে পেটের ক্ষুধার চেয়ে উচ্চমর্যাদায় রাখতে পারে না, বাস্তবিকই তারা ত্রুটিপূর্ণ মুমিন এবং স্থূলবুদ্ধির অধিকারী।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মুমিনের মর্যাদাবোধ হলো অন্যের থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার নাম। (আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ১২৯০, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ২৫৩)

অল্পেতুষ্টিতে রয়েছে সম্মান ও স্বাধীনতা। একারণেই বলা হয়, কারও কাছে হাত পাতলে তুমি তার হাতের বন্দি । কারও থেকে নির্মুখ থাকলে তুমি তার সমকক্ষ। কারও প্রতি সদাচার করলে তুমি তার হৃদয়ের রাজা। (তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৬৭ : ১৮৪)

চার. ইহুদী, খ্রিষ্টান, বোকা ও বেদীনদের বিলাসিতা ও জীবন ধারণ পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে হবে। এরপর পয়গম্বর, অলী, খুলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিঈগণের জীবন চরিত দেখতে, শুনতে ও পড়তে হবে।

এরপর মনে চাইলে দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের সাথে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করবে কিংবা যারা সৃষ্টিজগতে অধিক সম্মানিত তাদের অনুসরণ করবে। কেউ যদি মহাপুরুষগণের অনুসরণ করে, তাহলে সামান্য জিনিসে সন্তুষ্ট থাকবে। তার ব্যাপারে পয়গম্বর ও অলীগণই কেবল তার শরীক হবে। কিন্তু যদি প্রথমোক্ত শ্রেণিতে থাকা পছন্দ করে, তবে কোনো ফায়দাই হবে না। যেমন কেউ উদরপূর্তির বিলাসিতায় পড়লে বুঝতে হবে তার চেয়ে গাধা উত্তম। যদি সঙ্গমের আনন্দ লাভে ব্যাপৃত হয়, তাহলে শূকর এ কাজে সবার ঊর্ধ্বে। যদি অঙ্গসজ্জা ও যানবাহনের বিলাসিতা উদ্দেশ্য হয়, তবে অধিকাংশ কাফির এতে তার চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকবে।

পাচ. অর্থ জমা করার বিপদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, এতে কী পরিমাণ চুরি, ডাকাতি ও লুটতরাজের আশঙ্কা থাকে। হাত শূন্য থাকলে এসব দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে সুখে থাকা যায়। আমরা ইতঃপূর্বে যেসব আর্থিক বিপদাপদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি, সেগুলোও চিন্তা করবে এবং ধ্যান করবে, ধনসম্পদের জন্য জান্নাতের দরজা থেকে পাঁচশ বছর পর্যন্ত দূরে থাকতে হবে। নিঃস্ব ব্যক্তি ধনীর তুলনায় পাঁচশ বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে। এমন কথাই হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে। এই চিন্তাভাবনার উপায় হলো, দুনিয়াতে সব সময় নিজের চেয়ে নিচের পর্যায়ের লোকদের দিকে লক্ষ করা, ধনীদের দিকে লক্ষ না করা। সেজন্য আবু যর (রা) বলেন, আমাকে আমার বন্ধু মুহাম্মদ (স) ওসিয়ত করেছেন যে, জগতে তোমার চেয়ে কম অবস্থাসম্পন্ন যারা, তাদের দিকে নযর দেবে। যাদের আর্থিক অবস্থা তোমার চেয়ে অধিকতর ভালো, তাদের প্রতি নজর দিবে না। (মুসনাদে আহমাদ : ৫ : ১৫৯, ইবনে হিব্বান : আস সাহিহ : ৪৪৯)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সে ব্যক্তি তার চেয়ে আকৃতি ও সম্পদে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির দিকে তাকায়, সে যেন তার চেয়ে নিম্ন ব্যক্তির দিকে তাকায়। (বুখারী : ৬৪৯০; মুসলিম : ২৯৬৩)

উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় দ্বারা মানুষের মধ্যে অল্পেতুষ্টি আসতে পারে। একশ কথার এক কথা এই যে, সবর করবে, আশাকে ছোটো করবে এবং বুঝবে যে, অনন্তকাল সুখে-শান্তিতে নির্বিঘ্নে থাকার জন্য দুনিয়ার কিছু দিনই সবর করতে হবে। যেমন রোগী ঔষধের তিক্ততায় এজন্য সবর করে যে, এরপরে সে সুস্থ থাকবে।

দানশীলতার মাহাত্ম্য

কারও নিকট যদি ধনসম্পদ না থাকে, তবে তার উচিত অল্পেতুষ্ট হওয়া ও কম লোভ করা। আর যদি ধনসম্পদ থাকে, তবে তার উচিত কুরবানি ও দানশীলতায় ত্রুটি না করা এবং কার্পণ্য থেকে অনেক দূরে থাকা। কেননা, দানশীলতা পয়গম্বরগণের গুণ ও বৈশিষ্ট্য। মুক্তির মূলমন্ত্র এটাই। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স) এভাবে বর্ণনা করেছেন, দানশীলতা জান্নাতের বৃক্ষসমূহের একটি। এর শাখা-প্রশাখা আজানুলম্বিত। যে কেউ এর একটি শাখা ধরে ফেলে, সে তাকে বেহেশতে টেনে নিয়ে যায়। (খারাইতি : মাকারিমুল আখলাক : ৩৯ : ৫৫৯; তাবারানি : আল মুজামুল আওসাত : ৮৯১৫, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৩৬৬)

আয়েশা (রা)-এর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা দানশীলতা ও সচ্চরিত্রতার ওপরই তাঁর সকল নবীকে সৃষ্টি করেছেন। (হাকিম তিরমিযী : নাওয়াদিরুল উসুল: ১০৫, তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪২২, মুসনাদুল ফেরদাউস, দায়লামি : ৬২২৪)

জাবের (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে একজন জানতে চাইলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষমা করে দেওয়া। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩১০৩২, আবু ইয়ালা : মুসনাদ : ১৮৫৪, মুসনাদে আহমদ : ৪ : ৩৮৫)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, দুটি চরিত্র আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয়। অন্য দুটি চরিত্র তার কাছে অপ্রিয়। প্রিয় চরিত্র দুটি হলো, সচ্চরিত্র ও বদান্যতা। অপ্রিয় চরিত্র দুটি হলো, কৃপণতা ও চরিত্রহীনতা। আল্লাহ যখন কোনো বান্দার জন্য কল্যাণকামী হন তখন তাকে অন্যদের প্রয়োজন পূরণের সুযোগ দান করেন। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৭২৫৩, দায়লামি: মুসনাদুল ফেরদাউস : ২৯৮৯)

মিকদাম ইবনু শুরাইহ তার বাবার সূত্রে দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তার দাদা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে যেতে সহায়তা করবে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, অভুক্তকে খাবার দান, সকলকে সালাম প্রদান, সদা সুন্দর কথা বলা জান্নাতকে আবশ্যক করে। (তাবারানি : আল-মুজামুল কাবির : ২২ : ১৮০, খুরকুশি : তাহযিবুল আসরার : ৪২৩)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বদান্যতা হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষ। দানশীল ব্যক্তিকে এই গাছের একটি শাখা দান করা হয়। এই শাখাটি সে ধারণ করে থাকলে সে জান্নাতে চলে যাবে। আর কৃপণতা হলো জাহান্নামের একটি বৃক্ষ। কৃপণ ব্যক্তিকে এই বৃক্ষের একটি শাখা দেওয়া হয়। আজীবন শাখাটি ব্যক্তি ধারণ করে থাকলে সে জাহান্নামে যাবে। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৩৭৭)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার দয়ালু বান্দাদের নিকট দানের আরযী করো এবং তাদের আশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করো। আমি তাদের মধ্যে আমার দয়া ও অনুগ্রহ ভরে দিয়েছি। আর কঠিন মনের লোকদের নিকট কিছু চেয়ো না। আমি তাদের ওপর ক্রোধ অবতীর্ণ করেছি। (খারাইতি : মাকারিমুল আখলাক : ৫৬৮, ইবনে হিব্বান : আল মাজরুহিন : ২ : ২৯৯, মুসনাদুশ শিহাব, কাযায়ি : ৭০০)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দানশীল ব্যক্তির ত্রুটি ক্ষমা করো। কারণ, সে যখন ভুল করে, তখন আল্লাহ তার হস্ত ধারণ করেন। (তাবারানি : মুজামে আওসাত : ৫৭০৬, আবু নুআইম : আল হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৯ : ৩৯৭)

ইবনে মাসউদের বর্ণনায় আছে– অন্ন দানকারীর কাছে রিযিক এত দ্রুত পৌঁছে যে, উটের গলায় ছুরিও এত দ্রুত কার্যকর হয় না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ মহান দাতা। তিনি দানশীলতাকে ভালোবাসেন। তিনি পছন্দ করেন উন্নত চরিত্র। অপছন্দ করেন চরিত্রহীনতা। (খারাইতি : মাকারিমুল আখলাক : ৫৭২, ইবনু হিব্বান : রওজাতুল উকালা : ১৬, তাবারানি : আল-মুজামুল কাবির : ৬ : ১৮১)

আনাস (রা) বলেন, ইসলামের দোহাই দিয়ে কোনো কিছু চাইলে রাসূলুল্লাহ (স) কাউকে ফিরিয়ে দিতেন না। একবার এক ব্যক্তি এসে তার কাছে কিছু সাহায্য চাইলো। তিনি লোকটিকে এক উপত্যকা ভর্তি সদকার উট দান করলেন। সামান্য চেয়ে অফুরান পাওয়ায় লোকটি খুশি হয়ে নিজ গোত্রের লোকদের বললো, ভাইসব! তোমরা মুসলিম হয়ে যাও। কারণ, নবী মুহাম্মদ (স) দারিদ্র্যের ভয় না করে প্রার্থীকে অফুরান দান করেন। (সহিহ মুসলিম : ২৩১২)

ইবনে উমর (রা)-এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (স) এরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের বেছে বেছে নিয়ামত দান করেন, যাতে তাদের হাতে অন্যদের অভাব মোচন হয়। যে ব্যক্তি অপরের উপকার করতে কার্পণ্য করে, আল্লাহ তাআলা নিজের নিয়ামত তার কাছ থেকে ছিনিয়ে অন্যকে সমর্পণ করেন। (কাযাউল হাওয়াইস, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৫; মুজামে আওসাত, তাবারানি : ৫১৫৮)

হালালী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট বনী আম্বরের কয়েদীদের নিয়ে আসা হলে তিনি সবাইকে হত্যা করার হুকুম দেন। কিন্তু এক ব্যক্তিকে এই হুকুমের বাইরে রাখেন। আলী (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ এক। তাঁর দীনও এক। যে গুনাহ এরা করেছে, তাও এক। এমতাবস্থায় এই ব্যক্তি তার সম্প্রদায় থেকে আলাদা হয় কী করে? জবাবে তিনি বললেন, আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, তাদের সবাইকে হত্যা করো এবং একে ছেড়ে দাও। তার দানশীলতার জন্য আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাশীল। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪২০)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর একটি ফল রয়েছে। নেক আমলের ফল হলো দ্রুত মুক্তি। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন : ৮:১৭৫)

অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে–

طَعَامُ الْجَوَادِ دَوَاءٌ وَطَعَامُ الْبَخِيْلِ دَاءٌ.

অর্থাৎ, দানশীল ব্যক্তির খাবার ওষুধবিশেষ আর কৃপণ ব্যক্তির আহার রোগবিশেষ। (মুসনাদুল ফিরদাউস, দায়লামি : ৩৯৫৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর অঢেল নিয়ামতপ্রাপ্ত হয়, তার কাছে মানুষের দাবি বেড়ে যায়। আর যে মানবতার দাবি উপেক্ষা করে, আল্লাহ তার সম্পত্তি বিনাশ করে দেন। (ইবনু আবিদ দুনিয়া : কাজাউল হাওয়াইজ : ৪৮, ইবনু আদি : আল কামিল ; ১ : ১৭৪, মুসনাদুশ শিহাব : ৭৯৮)

একদিন ঈসা (আ) বললেন, একটা কাজ তোমরা বেশি বেশি করো, আগুন তোমাদের ছুবে না। জানতে চাওয়া হলো, কী সেই কাজ? তিনি জানালেন, বদান্যতা। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪২৭, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ৩৭১)

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জান্নাত হলো দানশীলদের নিবাস। (খারাইতি : মাকারিমুল আখলাক : ৫৯৭, ইবনু হিব্বান : আস-সিকাত : ৫ : ২৩, ইবনে আদী : আল-কামিল : ১ : ১৮৭)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটে থাকে, মানুষের নিকটে থাকে, জান্নাতের নিকটে থাকে। তবে জাহান্নাম থেকে দূরে থাকে। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে থাকে। মানুষ থেকে দূরে থাকে। জান্নাত থেকে দূরে থাকে। কিন্তু জাহান্নামের নিকটে থাকে। আল্লাহর কাছে জ্ঞানী কৃপণের চেয়ে অজ্ঞ দানশীলের মর্যাদা বেশি। আর কৃপণতা হলো সর্বনিকৃষ্ট একটা রোগ। (জামে তিরমিযী : ১৯৬১, মাসাইউল আখলাক, খারাইতি : ৩৭৪)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তুমি দয়া করো, যারা দয়া পাওয়ার উপযোগী তাদের প্রতি। যারা দয়া পাওয়ার উপযুক্ত নয় তাদের প্রতিও। কারণ, তুমি যদি দয়া পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তির সাথে দয়ার আচরণ করো তাহলে ঠিকই করেছো। আর যদি তুমি অনুপযুক্ত ব্যক্তির সাথে দয়ার আচরণ করো তাহলে তুমি তো দয়ালু রইলেই। (আবু বকর শাফেয়ি : আল-গাইলানিয়্যাত : ৭৮, জাসসাস : আহকামুল কুরআন : ৩ : ২৬৭, সুলামি : আদাবুস সুহবাহ : ১৩৮, দারাকুতনি : আল ইলাল : ৩ : ১০৭)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার উম্মতরা শুধুমাত্র নামায পড়ে, রোযা রেখে জান্নাতে যেতে পারবে না। বরং অন্তরের উদারতা, মনের সুস্থতা এবং মুসলিমদের জন্য কল্যাণকামীতার দ্বারা সে জান্নাতে যাবে। (ইবনু আবিদ দুনিয়া : আল আউলিয়া : ৫৮, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৩৯৩, ১০৩৯৪)

আবু সাঈদ খুদরি (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিজীবের মধ্যে কিছু লোককে সদাচারের জন্য নির্বাচন করেন। তাদের অন্তরে তিনি সদাচারের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। সৎকর্ম করতে তারা তখন মন থেকে উৎসাহ পায়। প্রার্থীদের আল্লাহ তাদের দুয়ারে নিয়ে আসেন। বৃষ্টির পরশে শুষ্ক জমিনে যেমন শস্য উৎপাদিত হয় তেমনি তাদের জন্য দান করা সহজ হয়ে যায়। (কাযাউল হাওয়াইজ, ইবনু আবিদ দুনিয়া : ৪; মুসতাদরাকে হাকেম : ৪ : ৩২১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সব রকমের সদাচারে সদকার সওয়াব পাওয়া যায়। ব্যক্তির পরিবার পরিজনের ভরণপোষণের জন্য খরচ করা সদকা। সম্মান

রক্ষার জন্য খরচ করা সদকা। বান্দা যা খরচ করে আল্লাহ তার বদলা তাকে দিয়ে দেন। (আল কামিল, ইবনু আদি : ৬ : ৪৩১, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০২২৯, হাদিসের প্রথম বাক্য উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারী : ৬০২১, মুসলিম : ১০০৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মানুষের প্রতিটি সৎকাজই সদকার সমতুল্য। কল্যাণ কর্মের দিশাদাতা কল্যাণকর্মীর সমান সওয়াব পাবে। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৭২৫১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা দরিদ্র, সদাচরণ করলেই তুমি সদকার সওয়াব পাবে। (মাকারিমুল আখলাক, খারাইতি : ৭২; তাবারানি : ১১২; হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ৪৯)

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা মুসা (আ)-এর কাছে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছিলেন যে, তুমি সামেরিকে হত্যা করো না। কারণ, সে দানশীল। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশী : ৪৩৫, তাফসিরে সালাবি : ৬ : ২৫৮)

রাসূলুল্লাহ (স) একবার কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদার নেতৃত্বে কোনো এক স্থানে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলেন। পথিমধ্যে কায়েস ইবনে সাদ (রা) নয়টি উট জবাই করে বাহিনীর সবাইকে আহার করান। তার এ বদান্যতার খবর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কানে গেলে তিনি বলেন, সেই ঘরের (কাবা) দিকে মুখ ফিরিয়ে যারা ইবাদত করে, বদান্যতা হলো তাদের স্বভাব। (আবু বকর শাফেয়ি : গাইলানিয়্যাত : ১০৯১, তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৪৯ : ৪১১)

আলী (রা) বলেন, মানুষের নিকট যখন দুনিয়া আসে তখন তা থেকে খরচ করা উচিত। কেননা, খরচ করলে তো আর দুনিয়া চলে যাবে না। যদি চলেও যায়, তবু খরচ করা প্রয়োজন। কেননা, তা স্থায়ী হবে না। এরপর তিনি নিম্নোক্ত পঙ্‌ক্তি পাঠ করেন যার সারমর্ম হলো-

দুনিয়া হস্তগত হলে কৃপণতা করো না। কারণ, খরচ করলে তা কমে যায় না।

আর যদি দুনিয়া চলে যায় তবু উত্তমরূপে দান করো। কারণ, যখন সে চলে যাবে তখন শোকর এর স্থলাভিষিক্ত হবে। (আনওয়ারুল উকুল লি-ওসিয়্যির রাসূল : ১৮০)

আমীর মুআবিয়া ইমাম হাসান (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রতা, উচ্চতা ও দানশীলতা কাকে বলে? তিনি বললেন, নিজের ও দীনের হিফাযত করা,

নিজে সতর্ক থাকা, মেহমানের সাথে উত্তম আচরণ করা হচ্ছে ভদ্রতা। প্রতিবেশীর বিপদ দূর করা এবং ধৈর্যের জায়গায় ধৈর্য ধরা হচ্ছে উচ্চতা। চাওয়ার আগে দান করা, দুর্ভিক্ষের সময় আহার করানো, অভাবীকে দান করা ও নম্র ব্যবহার করা হচ্ছে দানশীলতা। (তারিখু দিমাশক, ইবনে আসাকির : ১৩ : ২৫৭)

একবার এক লোক তাঁর খিদমতে কোনো উদ্দেশ্যে আবেদনপত্র লিখে পেশ করল। তিনি সেটি না পড়েই বলে দিলেন, তোমার অভাব পূরণ করা হবে। এতে অন্য একজন আরয করল, আপনি যদি তার আবেদনটি পড়েই জবাব দিতেন! তিনি বললেন, যতক্ষণ আমি পড়ব, ততক্ষণ সে আমার সামনে হীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকত। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাকে জিজ্ঞেস করতেন—

এতক্ষণ তুমি সওয়ালকারীকে হীন অবস্থায় কেন দাঁড় করিয়ে রাখলে? (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪২৯)

সাম্মাক (র) বলেন, আমি লোকদের দেখে অবাক হই। পয়সা খরচ করে তারা দাসদাসী খরিদ করে। কিন্তু সদাচারের বিনিময়ে তারা মুক্ত স্বাধীন মানুষের মনে রাজ করতে পছন্দ করে না। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৩০, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৪২১)

এক বেদুঈনের কাছে জানতে চাওয়া হলো, কে তোমাদের নেতা? সে উত্তর দিলো, যে আমাদের নিন্দা হজম করে। আমাদের চাহিদা পূরণ করে এবং আমাদের বোকামিগুলো দেখেও না দেখার ভান করে থাকে। (ইবনু আবিদ দুনয়া : আল হিলম : ৪০)

ইমাম আলী ইবনুল হোসাইন (রা) বলেন, সওয়ালকারীকে যে লোক নিজের ধনসম্পদ দান করে, সে দানশীল নয়। বরং দানশীল সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাদের হক চাওয়া ছাড়াই পৌঁছে দেয়। তার মনে গ্রহণের জন্য কৃতজ্ঞতার মোহ থাকে না। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ণ নেকী পাওয়ার ঈমান থাকে। (তাহযিবুল আসরার : ৪৩২)

এক ব্যক্তি হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করল, দানশীলতা কী? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় ধনসম্পদ দিয়ে দেওয়া। এরপর প্রশ্ন করা হলো, অপব্যয় কী? তিনি বললেন, ক্ষমতা পাওয়ার লোভে অর্থসম্পদ খরচ করা। (তাহযিবুল আসরার : ৪৩২)

ইমাম জাফর সাদিক (র) বলেন, জ্ঞানের চেয়ে অধিক কোনো সাহায্যকারী সম্পদ নেই এবং মূর্খতার চেয়ে বড় কোনো বিপদ নেই। পরামর্শের চেয়ে বড় কোনো সমর্থন নেই। জেনে রাখো, আল্লাহ বলেন, আমি দাতা। কোনো কৃপণ আমার শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না। কৃপণতা কুফরের অংশ। কাফিররা জাহান্নামে যাবে। দানশীলতা ঈমানের অঙ্গ। মুমিন জান্নাতে যাবে। (তাহযিবুল আসরার : ৪৩৩)

হুযায়ফা (রা) বলেন, কিছু লোক আছে, যারা ধর্মের বিধি-নিষেধের আওতায় অপরাধী। জীবনযাপনের মানও তাদের তেমন উঁচু নয়। তবে বদান্যতার গুণের কারণে সে জান্নাতবাসী হবে। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৩৫)

এক ব্যক্তির হাতে দিরহাম দেখতে পেয়ে আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) জানতে চান— এই দিরহামগুলো কার? লোকটি বলল, আমার আহনাফ বলেন, বিষয়টা এমন নয়। বরং তোমাদের থেকে অন্য কারও হাতে চলে গেলেই তুমি এর প্রকৃত মালিকানা লাভ করবে। (তাহযিবুল আসরার খুরকুশী : ৪৩৫)

এই অর্থের দিকে লক্ষ করে কবি বলেন,

أَنْتَ لِلْمَالِ إِذَا أَمْسَكْتَهُ فَإِذَا أَنْفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ.

সম্পদ যতক্ষণ তোমার কোচরে বাঁধা থাকবে, তুমি সম্পদের জন্য নিবেদিত প্রাণ। যখন সম্পদ অপরের হাতে চলে যাবে তখনই তুমি প্রকৃত সম্পদশালী হবে। (উয়ুনুল আখবার : ৩: ১৮১)

ওয়াসেল ইবনে আতা (র)-এর উপাধি দেওয়া হয়েছিলো 'গাজ্জাল' (যে চরকায় সুতা কাটে)। কারণ, তিনি চরকা দিয়ে যারা সুতা কাটতো তাদের কাছে যেতেন এবং সেখানে সাধ্যমতো দান করতেন। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৩৭)

হাসান (রা) ভাই হুসাইন (রা)-এর কবিদের উপঢৌকন দানের বিষয়টি অপছন্দ করে তার কাছে চিঠি লিখলেন। উত্তরে হুসাইন (রা) তাকে লিখে পাঠালেন, 'যে সম্পদ ইজ্জত রক্ষা করে, তাই সবচেয়ে উত্তম'। (ইবনু আবিদ দুনিয়া : মুদারাতুন নাস : ১৩৯)

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে বলা হলো, বদান্যতা কী? তিনি উত্তর দিলেন, বদান্যতা হলো ভ্রাতৃত্ববোধ থেকে সদাচরণ করা এবং সম্পদ দানে উদারতা দেখানো। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৩৮)

তিনি বলেন, উত্তরাধীকার সূত্রে আমার বাবা পঞ্চাশ হাজার দিরহামের মালিক হলেন। দেরি না করে সেগুলো তিনি ভাই-বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমি নামায শেষে দুআয় আমার ভাই-বন্ধুদের জন্য জান্নাত প্রার্থনা করে এসেছি। আর তখন এই সামান্য কিছু সম্পদ তাদের দিতে কুণ্ঠাবোধ করবো?! (তাহযিবুল আসরার খুরকুশী : ৪৩৮)

হাসান বসরি (র) বলেন, হাতে থাকা সম্পদ ব্যয়ে সচেষ্ট হওয়া হলো সর্বোত্তম বদান্যতা। (তাহযিবুল আসরার খুরকুশী : ৪৪০)

জনৈক দার্শনিকের কাছে জানতে চাওয়া হলো, আপনার কাছে প্রিয় মানুষ কে? তিনি বললেন, যে আমাকে সবচেয়ে বেশি উপকার করে। এমন যদি কেউ না থাকে, তবে কে? আবার জানতে চাওয়া হলো, তিনি উত্তর দিলেন, যে আমার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা পায়। (প্রাগুক্ত : দিনওয়ারী : আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৮৪)

শাবিব ইবনে শায়বাকে খলিফা মাহদি বললেন, আমার গৃহে লোকদের আপনি কেমন দেখলেন? তিনি বললেন, আমিরুল মুমিনিন! তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বুক ভরা আশা নিয়ে আপনার গৃহে এসেছিলো। এখন মুখ ভরা হাসি নিয়ে ফিরে যাচ্ছে। (খতিব বাগদাদি : তারিখু বাগদাদ : ৯ : ২৭৬)

কোনো এক কল্প বিলাসী কবি আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের সামনে আবৃতি করলো, যার সারমর্ম হলো—

সঠিক কর্মশালায় তৈরি না হলে কোনো শৈল্পিক মর্যাদা পায় না।
কাজেই তুমি কাউকে অনুগ্রহ করলে আল্লাহর ওয়াস্তে করো; কিংবা
আপনজনের মুখে হাসি ফোটাতে করো
তৃতীয় কোনো উদ্দেশ্য তুমি মনে রেখো না।

(দিওয়ানে হাসসান : ১: ৪৯৩)

লোকটার কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বললেন, এই পঙ্‌ক্তি দুটি দেখছি মানুষকে কৃপণ বানিয়ে ছাড়বে! না, কবির বক্তব্য সঠিক নয়, বরং সবার উচিত হৃদয়কে কল্যাণ দানের জন্য অবারিত রাখা। তোমার দান

যদি ভালো মানুষদের কাছে পৌঁছে তাহলে তো প্রাপ্য লোকদেরই তুমি দান করলে। আর মন্দ লোকেরা যদি তোমার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়, তাহলে মনে করবে, নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব তুমি পালন করেছো। (তাহযিবুল আসরার : ৪৩৬)

নিচে খ্যাতনামা দানশীল ব্যক্তিদের কিছু অনুসরণযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে।

দানশীলতার ঘটনাবলি

১. আয়েশা (রা)-এর পরিচারিকা উম্মে দাররা বর্ণনা করেন, একদিন ইবনে যুবাইর (রা) আয়েশা (রা)-এর খিদমতে এক লাখ আশি হাজার দিরহাম পাঠালেন। তিনি এগুলো জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। সন্ধ্যায় তিনি আমাকে বললেন, আমার ইফতার আনো। আমি রুটি ও যাইতুনের তেল সামনে রেখে বললাম, আপনি এতগুলো দিরহাম বিলি করলেন। আমাদের ইফতারের জন্য এক দিরহামের গোশত খরিদ করাও কি সম্ভব ছিল না? তিনি বললেন, তুমি আগে বললে তা অবশ্য করা যেত। (হান্নাদ : আয যুহদ : ৬১৯, হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৪৭, তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪২৭)

২. আবান ইবনে উসমান (র) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর কিছু ক্ষতি করতে মনস্থ করল। সে কুরাইশ সরদারদের কাছে গিয়ে মিছেমিছি বলে দিল, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস আপনাদের সবাইকে তাঁর বাড়িতে সকালের খাবারে দাওয়াত দিয়েছেন। এ দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তিনি আমাকে বলেছেন। সরদাররা তার কথামতো কাজ করল এবং সকাল বেলায় সবাই তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হলো। এমনকি ঘরে জায়গা পর্যন্ত রইল না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা ঘটনা বর্ণনা করল। শোনামাত্রই তিনি ফলমূল কিনে এনে তাদের সামনে রেখে দিলেন এবং লোকজনকে খাবার পাকানোর জন্য নিযুক্ত করলেন। ফল খাওয়া শেষ হতে না হতেই দস্তরখান বিছিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর আহারান্তে সবাই প্রস্থান করল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর কর্মচারীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আজ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, সে পরিমাণ প্রত্যেক দিন ব্যয় হতে পারে কি না? তারা বলল, অবশ্যই হতে পারে। তিনি বললেন, তা হলে এই

সরদারগণ যেন প্রত্যহ সকালের খাবার আমার ঘরেই খায়। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪২৮; আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪২২)

৩. মুসআব ইবনে যুবাইর (রা) বর্ণনা করেন, এক বছর আমীর মুআবিয়া (রা) হজে গেলেন এবং সেখান থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। মদীনায় প্রবেশ করার পর ইমাম হুসাইন (রা) নিজ ভাই ইমাম হাসান (রা)-কে বললেন, তার সঙ্গে তুমি সাক্ষাৎ করতে যেয়ো না এবং সালাম-কালামও করো না। এরপর আমীর মুআবিয়া যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন ইমাম হাসান (রা) বললেন, আমার ওপর প্রচুর ঋণ। আমি অবশ্যই আমীরের সাথে সাক্ষাৎ করব। তিনি উটে সওয়ার হয়ে চলে গেলেন। পথিমধ্যে সালাম-কালামের পর তিনি ঋণের কথা বললেন। সে সময় আশি হাজার দীনার বহনকারী একটি উট আমীরের পাশে ছিল। দীনারের ভারে উটটি চলতে পারছিল না। সেটিকে জোরজবরদস্তি হাঁকানো হচ্ছিল। আমীর মুআবিয়া জিজ্ঞেস করলেন, এর পিঠে কী? লোকেরা বলল, আশি হাজার দীনার। তিনি বললেন, উটসহ এগুলো ইমাম হাসানের নিকট পৌঁছে দাও। (খুরকুশি :আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪২২)

৪. ওয়াকিদী (র) তার বাবা মুহাম্মদ ওয়াকিদীর অবস্থা তুলে ধরে বলেন, তিনি খলীফা মামুনকে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেন, আমার ওপর অনেক ঋণের বোঝা। এখন আর সহ্য করতে পারছি না। খলীফা চিঠির অপর পৃষ্ঠায় এই নির্দেশ লিখলেন, তোমার মধ্যে দুটি চমৎকার গুণ রয়েছে—দানশীলতা ও লজ্জাশীলতা। দানশীলতার কারণে তুমি নিঃস্ব হয়ে গেছ এবং লজ্জাশীলতার কারণে তুমি কখনো তোমার অবস্থা আমার কাছে প্রকাশ করনি। আমি এখন এক লাখ দিরহাম তোমাকে দিলাম। চাহিদা মতো হলে মানুষকে খুব দান করো। চাহিদা মতো না হলে এটি তোমারই। তুমি যে সময় খলীফা রশীদের পক্ষ থেকে বিচারপতি ছিলে, তখন আমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করেছিলে যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) যুহরী থেকে, যুহরী (র) হযরত আনাস (রা) থেকে, আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি যুবাইর ইবনে আওয়ামকে বললেন, হে যুবাইর! জেনে রাখো, বান্দার জন্য রিযিকের চাবি আরশের বিপরীত দিকে রয়েছে। বান্দা যে পরিমাণ খরচ করে, আল্লাহ সে পরিমাণ তার নিকট পাঠিয়ে দেন। যে বেশি ব্যয় করে, তার জন্য বেশি এবং যে কম খরচ করে, তার জন্য কম

পাঠিয়ে দেন। ওয়াকিদী (র) বলেন, আল্লাহর কসম! খলীফা মামুনের এক লাখ দিরহাম পেয়ে আমি এমন খুশি হলাম, যেমন এই হাদীসের বিষয়বস্তু স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় খুশি হলাম। (খতিব বাগদাদি : তারিখু বাগদাদ : ৩ : ২২৮, খুরকুশি : প্রাগুক্ত, অনুরূপ অর্থে : হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ২১৬, মুসনাদুল ফিরদাউস, দায়লামি : ৮৫৫৪)

৫. এক ব্যক্তি হাসান ইবনে আলী (রা)-এর কাছে এসে কিছু চাইলো। তখন হাসান (রা) লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে অমুক! তোমার চাওয়ার দাবি আমার ওপর অনেক ভারী। তোমার চাহিদার জ্ঞান আমার কাছে অনেক বড়। তোমার প্রাপ্য যথাযথভাবে দিতে আমি অক্ষম। আমার কাছে যা অনেক বেশি, আল্লাহর কাছে তা খুবই তুচ্ছ। আমি শুধু তোমার কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করতে পারি। আমার কাছে যতসামান্য যা কিছু আছে তা গ্রহণ করে যদি তুমি আমাকে দায়মুক্ত করতে চাও তাহলে গ্রহণ করে নাও। এসব শুনে প্রার্থী লোকটি বললো, ওহে আল্লাহর রাসূলের সন্তান! আমি কৃতজ্ঞচিত্তে আপনার দান গ্রহণ করবো। তারপরও আমার প্রয়োজন পূরণ না হলে আপনার অপারগতাকে মেনে নেবো। তখন হাসান (রা) তার উকিলকে ডাকলেন। তাকে নিয়ে নিজের অন্যান্য প্রয়োজনে কত খরচ হবে হিসাব করলেন। তারপর উকিলকে বললেন, সেই তিন লক্ষ দিরহাম থেকে এসব প্রয়োজন পূরণ করে যা বেঁচে থাকে নিয়ে এসো।

পঞ্চাশ হাজার দিরহাম নিয়ে আসা হলো। হাসান (রা) বললেন, তোমার কাছে পাঁচ হাজার দীনার রাখতে দিয়েছিলাম, সেটা কী করেছো? উকিল বললেন, আমার কাছেই আছে। হাসান (রা) নির্দেশ দিলেন নিয়ে এসো। সেই পাঁচ হাজার দীনারও আনা হলো। পঞ্চাশ হাজার দিরহাম এবং পাঁচ হাজার দিনারের সবটাই প্রার্থী লোকটাকে দিয়ে দিলেন।

হাসান (রা) বললেন, এগুলো কীভাবে নিয়ে যাবে? বাহন নিয়ে এসো। লোকটি দুটি বাহন নিয়ে এলো। তখন বাহনের ভাড়া পরিশোধ করলেন। লোকটা চলে গেলে হাসান (রা)-এর উকিলকে বললেন, আমাদের কাছে আর কোনো দিরহাম নেই। হাসান (রা) উত্তর দিলেন, আমি আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান আশা করছি। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৩১)

৬. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তখন, বসরার গভর্নর একদিন তাঁর কাছে কয়েকজন ক্বারী হাজির হয়ে বলল, আমাদের এক প্রতিবেশী দিনে রোযা

রাখে এবং রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে। তার মেয়ের বিয়ে ভাইপোর সাথে দিয়েছে। কিন্তু দারিদ্র্যের কারণে কন্যাকে উপহার উপঢৌকন দেওয়ার মতো কিছুই তার নিকট নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) দাঁড়িয়ে গিয়ে আগন্তুকদের হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি সিন্দুক খুলে তা থেকে ছয়টি প্লেট বের করলেন, এরপর বললেন, এগুলো উঠিয়ে নাও। তারা উঠিয়ে নিলে তিনি বললেন, একজন মুসলমানকে এমন জিনিস দেওয়া ভালো নয়, যা তার রোযা ও রাত্রি জাগরণে বাধা সৃষ্টি করে। চলো, আমরা সবাই গিয়ে তার সহযোগী হয়ে মেয়েটিকে তুলে দেই। অবশ্য দুনিয়ার এতটুকু সাধ্য নেই যে, একজন মুমিনকে আল্লাহর ইবাদত থেকে ফিরিয়ে রাখে। কিন্তু আমরাও এতটুকু অহংকারী নই যে, আল্লাহর অলীগণের সেবা করব না। এ কথা বলে তিনি সবাইকে নিয়ে বিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন এবং যথারীতি বিবাহ কাজ সমাধা করা হলো। (খুরকুশী : ৪৩১)

৭. কথিত আছে, মিসরে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানকার শাসক আবদুল হামিদ ইবনে সাদ (র) ওয়াদা করলেন, আমি শয়তানকে দেখিয়ে দেব, আমি তার শত্রু। সেমতে তিনি সমস্ত মানুষের অভাব পূরণ করতে থাকেন। যখন তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন, তখন তার যিম্মায় ব্যবসায়ীদের দশ হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। তিনি এর বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের নিকট তার স্ত্রীদের পঞ্চাশ হাজার দিরহাম মূল্যের অলংকার বন্ধক রেখে দিলেন। এরপর যখন এই অলংকার ছাড়াতে পারলেন না, তখন ব্যবসায়ীদের লিখে পাঠালেন, তোমরা অলংকার বিক্রি করে তা থেকে নিজেদের পাওনা নিয়ে নাও। যা অবশিষ্ট থাকে, তা এমন লোকদেরকে দিয়ে দাও, আমার নিকট থেকে যারা কিছুই পায়নি। (খুরকুশী : ৪৩২)

৮. আবু তাহের ইবনে কাসির ছিলেন শিয়া মতাবলম্বি। এক লোক তার কাছে এসে বললো, আমি আলী ইবনে আবি তালেবের দোহাই দিয়ে বলছি, অমুক স্থানটা আমাকে আপনি দান করে দিন। আবু তালেব বললেন, যাও, জমিটা তোমাকে দিয়ে দিলাম এবং তার আশপাশের জমিও তোমার। লোকটি প্রত্যাশার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দান পেয়ে খুশি মনে ঘরে ফিরে গেলো। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৩২)

৯. দানবীর আবু মুরছাদ-এর প্রশংসা করেন জনৈক কবি। এরপর আবু মুরছাদ বললেন, আল্লাহর কসম! আমি রিক্তহস্ত। সেজন্য তোমাকে কিছু

দিতে পারছি না। তবে একটি কৌশল অবলম্বন করা যায়, তুমি দশ হাজার দিরহাম দাবি করে কাজির নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করো। আমি তোমার দাবির সত্যতা স্বীকার করে নেব। এরপর অপারগতার কারণে তুমি আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ো। আমার পরিবারের লোক তোমাকে দশ হাজার দিরহাম দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনবে। কবি তাই করল। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই আবু মুরছাদের পরিবারের লোকেরা দশ হাজার দিরহাম দিয়ে তাকে জেল থেকে মুক্ত করে আনেন। (খুরকুশী)

১০. মা'ন ইবনে যায়েদা তখন বসরার গভর্নর। একদিন তার দরজায় এক কবি এলো। কিছু সময় অপেক্ষা করলো এবং ভেতরে ঢোকার কোনো সুযোগ না পেয়ে ফিরে গেলো।

একদিন কবি মা'নের এক কর্মচারীকে বললো, গভর্নর যখন বাগানে বের হবেন, তখন আমাকে একটু জানিও। কিছুদিন পর কবি খবর পেলেন গভর্নর মা'ন বাগানে এসেছেন। কবি একটা কাঠের ফলকে দু লাইন কবিতা লিখলো এবং বাগানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নদীতে ভাসিয়ে দিলো।

এদিকে বাগানের ভেতরে মা'ন নদীর পাড়ে বসেছিলেন। কাষ্ঠ ফলকটা চোখে পড়তেই তিনি সেটা তুলে আনলেন। দেখলেন কাঠের উপর কালো কালিতে দু লাইন কবিতা লেখা,

হে মা'নের বদান্যতা!

তুমি আমার প্রয়োজনের কথা মা'নের কানে পৌঁছে দাও।

তুমি ছাড়া আমার পক্ষে কেউ সুপারিশ করবে না।

লাইন দুটি মা'ন পড়লেন। প্রহরীকে বললেন, কে লিখেছে এই কবিতা? তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। কবি এলো। গভর্নরের কাছে তার প্রয়োজনের কথা খুলে বললো। গভর্নর মা'ন তাকে তিন থলে ভর্তি টাকা দিলেন। কবি প্রাসাদ থেকে বের হয়ে ঘরে ফিরে এলো।

কাঠের ফলকে লেখা কবিতার পঙ্‌ক্তিটি মা'নকে খুবই মুগ্ধ করলো। সে ফলকটা বিছানার পাশে রেখে দিলো।

পরের দিন মা'ন কাষ্ঠ ফলকটা হাতে নিলো এবং তার মন নতুন করে আর্দ্র হয়ে উঠলো। সে কবিকে ডাকলো এবং এক লক্ষ দিরহাম দিলো।

দিরহামের এই বিপুল বোঝা হাতে নিয়ে কবি ভাবনায় পড়ে গেলেন। ভয়ও পেলেন। তিনি কোনোমতে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এলেন।

তৃতীয় দিন আবার মা'ন কবিতাটি পাঠ করলো। তার মন আবার সিক্ত হয়ে উঠলো। কবিকে পাওয়া গেলো না। তখন মা'ন বললেন, আমার ভান্ডারে একটি মাত্র দিরহাম বাকি থাকলেও আমার উচিত তাকে দান করে যাওয়া। (খুরকুশী; সামারাতুল আওরাক : ৪৪০)

১১. আবুল হাসান মাদায়েনী বর্ণনা করেন, একদিন ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন ও আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) একত্রে হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। রাস্তায় তারা কাফেলা থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে এক সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েন। পরে আবার তারা একত্র হলেন, তাদের চলার পথে এক বৃদ্ধা তাঁর কুঁড়ে ঘরে বসেছিল। তারা তিনজন তার পাশ দিয়ে গমনের সময় বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে কি সামান্য পানি আছে? বৃদ্ধা বললো, হ্যাঁ আছে। এ কথা শুনে তারা উট থেকে নেমে পড়লেন। বৃদ্ধার ঘরে একটি ছোট বকরি ছিল। সে বলল, এই বকরিটির দুধ দোহন করে পান করুন। দুধ পান করার পর তারা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নিকট কি কিছু খাবারও আছে? বৃদ্ধা বলল, এই বকরিটি ছাড়া আমার নিকট অন্য কিছু নেই। আপনাদের কেউ যদি এটি জবাই করে পরিষ্কার করে দেন, তবে আমি রান্না করে দিই। তাদের একজন এ কাজটি করলেন এবং বৃদ্ধা খাবার তৈরি করে দিল। তারা খাওয়াদাওয়া শেষ করে বিকাল পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। যাওয়ার সময় বৃদ্ধাকে বললেন, আমরা কুরাইশী। এখন হজে যাচ্ছি। সেখান থেকে সহি-সালামতে দেশে ফিরলে তুমি আমাদের নিকট যাবে। আমরা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করব।

অনেক দিন পরের কথা। বৃদ্ধা তার স্বামীকে নিয়ে রোযগারের তালাশে মদীনায় হাজির হলো। সেখানে পৌঁছে তারা উটের শুষ্ক বিষ্ঠা সংগ্রহ করে সেগুলো বাজারে বিক্রি করে কোনোমতে দিন কাটাত। ঘটনাক্রমে বৃদ্ধা একদিন সে গলিতে চলে গেল, যেখানে হাসান (রা) নিজ ঘরের দরজায় বসেছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে দেখেই চিনতে পারলেন। এরপর খাদেমকে পাঠিয়ে তাকে নিয়ে আসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে চিনতে পেরেছ? বৃদ্ধা আরয করল, না, চিনতে পারিনি। তিনি বললেন, অমুক

দিন তোমার ঘরে অতিথি হয়েছিলাম। বৃদ্ধা মনে করে বলল, হ্যাঁ। আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! আপনি কি সেই মেহমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি এক হাজার বকরি ও এক হাজার দীনার বৃদ্ধাকে দিয়ে নিজের খাদেমদের সাথে ইমাম হুসাইন (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই তোমাকে কী দিয়েছে? সে আরয করল, এক হাজার দীনার ও এক হাজার বকরি। এরপর তিনিও সে পরিমাণ দীনার ও বকরি দিয়ে বৃদ্ধাকে খাদেমের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে জাফরের নিকট পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করলেন, হাসান-হুসাইন দু' ভাই তোমাকে কী দিয়েছে? সে বলল, তারা দু'হাজার দীনার ও দু'হাজার বকরি দিয়েছেন। এরপর তিনি দু'হাজার দীনার ও দু'হাজার বকরি বৃদ্ধাকে দিয়ে বললেন, তুমি যদি প্রথমে আমার নিকট আসতে, তবে আমি এই পরিমাণে দিতাম যে, হাসান-হুসাইনের জন্য তা কঠিন হতো। অতঃপর বৃদ্ধা চার হাজার দীনার এবং সেই পরিমাণ বকরি তার স্বামীর নিকট নিয়ে এসে বললো, এ হলো একটি বকরির প্রতিদান, যা কুরাইশ সরদারগণ খেয়েছিলেন। (প্রাগুক্ত : ৪৩৩)

১২. আবদুল্লাহ ইবনে আমের (র) একবার একা একা মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। রাস্তায় সাকীফ গোত্রের একটি ছেলে তার পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমার কাছে কি তোমার কোনো দরকার আছে? ছেলেটি বলল, না, কোনো দরকার নেই। আপনি একা একা যাচ্ছিলেন, তাই সঙ্গ দিতে চলে এলাম। যাতে আল্লাহ না করুন! রাস্তায় কোনো বিপদ দেখা দিলে তা নিজের উপর নিতে পারি। আবদুল্লাহ তার হাত ধরে ফেললেন এবং ঘরে এনে তাকে এক হাজার দীনার দান করলেন। এরপর বললেন, তোমার অভিভাবকরা তোমাকে উত্তম শিক্ষা দিয়েছেন। এই দীনারগুলো তুমি নিজের জন্য খরচ করো।

১৩. বর্ণিত আছে, অনেক দূরের পথ পাড়ি দিয়ে একদল মানুষ এলো কয়েকজন দানবীরের কবর যিয়ারত করতে। সারাদিন তারা কাটালো কবরের পাশে। একসময় রাতের আঁধার নিকষ হয়ে নেমে এলো এবং দানবীরদের কবরের পাশেই তারা শুয়ে পড়লো। রাতে তাদের এক লোক স্বপ্নে দেখলো, এই কবরস্থানে কবরস্থ এক দানবীর ব্যক্তি তাকে বলছে, তুমি কি তোমার স্বাস্থ্যবান উট আমার ঘোড়ার সাথে অদল বদল করবে? আমি তোমার উটটি

দিয়ে সবাইকে মেহমানদারি করাতাম। ঘুমন্ত লোকটা বললো, হ্যাঁ, করবো। এভাবে ঘুমের মধ্যেই দুজনের মাঝে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন হলো এবং ঘুমের মধ্যেই লোকটা নিজের উটটি জবাই করতে দেখলো। স্বপ্নের ঘোলাটে ভাব মস্তিষ্ক থেকে দূর হতেই সে নিজের উটের দিকে তাকিয়ে দেখলো, উটের গলা থেকে রক্ত ঝরছে। সে আর দেরি করলো না। স্বপ্নের চুক্তি মোতাবেক উটটা সে জবাই করলো এবং ভরপেটে সবাইকে আহার করালো।

তারপর তারা পথে বের হয়ে পড়লো। দ্বিতীয়দিন তাদের সাথে কয়েকজন ঘোড়সাওয়ারের সাক্ষাৎ হলো। ঘোড়সাওয়ারদের একজন (এক ব্যক্তির নাম নিয়ে) বললো, এই নামের কেউ কি আছে তোমাদের মধ্যে? উটের বিনিময়ে স্বপ্নে ঘোড়া ক্রয় করা লোকটি বললো, হ্যাঁ, আমিই সেই ব্যক্তি। ঘোড়সাওয়ার (এক ব্যক্তির বর্ণনা দিয়ে) বললো, তুমি কি এমন কোনো ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখেছিলে? হ্যাঁ, দেখেছিলাম এবং স্বপ্নে সে আমার সাথে ঘোড়ার বিনিময়ে উট খরিদের চুক্তি করেছিলো। লোকটা বললো, ঘোড়সাওয়ার তখন একটা ঘোড়া নিয়ে এসে বললো, এই নিন আপনার ঘোড়া। আপনি যার কাছে উট বিক্রি করেছেন তিনি আমার বাবা। তিনি আমাকে স্বপ্নে (আপনার নাম নিয়ে) বললেন, আমি যদি তার প্রকৃত সন্তান হয়ে থাকি তাহলে যেনো আপনার কাছে তার ঘোড়াটা পৌঁছে দেই। আমি দায়িত্ব পালন করলাম। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৩৬)

১৪. কুরাইশ গোত্রের এক লোক সফর থেকে ফিরছিলেন, পথিমধ্যে দেখলেন, মাঝ রাস্তায় এক বৃদ্ধ বেদুঈন বসে আছে। রোগা-ভোগা শরীর হাড্ডিসার হয়ে আছে। বেদুঈন লোকটা কুরাইশি ব্যক্তিকে দেখে বললো, এই অকাল বৃদ্ধকে কিছু সাহায্য করে যাও। কুরাইশ লোকটি খাদেমকে বললো, পথের খরচ ছাড়া যা কিছু আছে সবকিছু এই বৃদ্ধকে দিয়ে দাও। খাদেম তখন চার হাজার দিরহামের একটা বোঝা বৃদ্ধের কোলের উপর রেখে দিলেন। বৃদ্ধ লোকটি তখন উঠে দাঁড়াতে চাইলো। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতার কারণে সে বসে পড়তে বাধ্য হলো এবং তার চোখ থেকে কান্না বের হয়ে এলো। কুরাইশ লোকটি বললো, কাঁদছো কেন? আমি কি তোমাকে কম কিছু দিয়ে ফেলেছি? বৃদ্ধ বললো, না, এ কারণে আমি কাঁদছি না; আমার হঠাৎ মনে পড়লো, তোমার এই দয়ার শরীরও একদিন ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। তাই আমার কান্না পাচ্ছে। (ইবনে হিব্বান; রওজাতুল উকালা : ২৪৮)

১৫. আবদুল্লাহ ইবনে আমের (র) ৯০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে খালিদ ইবনে ওকবার বাড়ি ক্রয় করেন। বাড়িটি ছিল বাজারের ভিতরে। রাত হলে খালিদের বাড়ির লোকজন কান্নাকাটি করেন। এই শব্দ আবদুল্লাহর কানে ভেসে আসল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন এরা কান্নাকাটি করছে? লোকেরা বলল, বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে বলে তারা কান্নাকাটি করছে। তিনি খাদেমকে ডেকে বললেন, তাদের নিকট গিয়ে বলে দাও— ৯০ হাজার দীনার এবং বাড়ি সব তোমাদের। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৩৮৮)

১৬. ইতিহাস পাঠ করলে জানা যায়, খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম মালিক ইবনে আনাসের নিকট পাঁচশ দীনার পাঠিয়ে দেন। এ সংবাদ শুনে লাইছ ইবনে সাদ ইমাম সাহেবের নিকট এক হাজার দীনার পৌঁছে দেন। এরপর খলীফা লাইছকে ডেকে এনে উষ্মা প্রকাশ করে বললেন, তুমি আমার প্রজা হয়ে কী জন্য আমার সাথে পাল্লা দিতে গেলে? লাইছ আরয করলেন, আমীরুল মুমিনীন! প্রতিদিন আমার ঘরে এক হাজার দীনারের ফসল আসে। তাই এমন সম্মানিত ব্যক্তিকে একদিনের আমদানির চেয়ে কম দিতে আমি ইতস্তত করেছি। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৩৯)

লাইছ ইবনে সাদের দানশীলতা ছিল প্রসিদ্ধ। এ জন্যই প্রতিদিন হাজার দীনার আমদানী সত্ত্বেও তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়নি। (প্রাগুক্ত)

১৭. একবার এক মহিলা তাঁর নিকট সামান্য মধু চাইলে তিনি তাকে এক মশক মধু দিয়ে দেন। কেউ একজন বললো, সামান্য মধু দিলেই তার হয়ে যেত। আপনি তাকে এত বেশি কেন দিলেন? তিনি বললেন, মহিলা তার প্রয়োজন মাফিক চেয়েছিল। আর আমি দিয়েছি আমার প্রতি আল্লাহর দান মাফিক। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪২৩)

১৮. আমাশ (র) বলেন, আমার একটি বকরি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। খাইছামা ইবনে আবদুর রহমান প্রতিদিন তাকে দেখতে আসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন— বকরিটি ঘাস-পানি ঠিকমতো খেয়েছে কি না? তোমার ছেলেরা দুধ ব্যতীত কীভাবে ধৈর্য ধরবে? তুমি প্রতিদিন আমার বিছানার নিচে যা পাও, নিয়ে এসো। ফলে ছাগলের অসুস্থতার দিনগুলোতে আমার নিকট তিনশ দিনারেরও বেশি চলে এলো। বকরিটি অসুস্থই থাকুক-আমার মনে এই আশা জন্ম নিল। (খুরকুশি : আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪২৩)

১৯. আসমা বিনতে খারিজাকে খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান একদিন বললেন, তোমার কয়েকটি উত্তম অভ্যাসের সংবাদ আমি পেয়েছি। সেগুলো আমার নিকট বর্ণনা করো। আসমা বললেন, আমার নিকট থেকে শোনার চেয়ে সেগুলো অন্যের মুখে শুনলে উত্তম হতো। খলীফা কসম দিয়ে বললেন, না, তুমিই বলো। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আমি কখনো আমার সাথে বসা ব্যক্তির সামনে পা প্রসারিত করিনি। যখনই আমি খাবার তৈরি করে মানুষকে খাইয়েছি, তখনই তাদের ওপর আমার যা অনুগ্রহ হয়েছে, তার চেয়ে বেশি আমি তাদের অনুগ্রহ নিজের ওপর মনে করেছি। যখনই কোনো লোক আমার নিকট কিছু চাইতে এসেছে, তখন আমি তাকে যা দিয়েছি সেটাকে যথেষ্ট মনে করিনি। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪২৩)

২০. বিখ্যাত দাতা সাঈদ ইবনে খালিদের নিয়ম ছিল, প্রার্থীকে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার-পত্র লিখে দিতেন, যদি দেওয়ার মতো তার নিকট কোনো কিছু না থাকত। এছাড়া আরও বলতেন, আমি কোথাও থেকে কিছু পেলে তোমাকে এই পরিমাণ অর্থ শোধ করে দেব। তিনি একবার সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের দরবারে আসলেন। খলীফা তাকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন, কী দরকার? কী পরিমাণ? তিনি বললেন, ত্রিশ হাজার দীনার। খলীফা বললেন, ত্রিশ হাজার ঋণের এবং এই পরিমাণ তোমার জন্য দেওয়া হবে। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪২৩)

২১. একবার কায়েস ইবনে সাদ ইবনে উবাদা অসুস্থ হয়ে পড়লেন, কিন্তু বন্ধু বান্ধবের কেউই তাকে দেখতে এলো না। তখন তাকে জানানো হলো, আপনার কাছে অর্থ ঋণী থাকার কারণে তারা আপনার সামনে মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ করছে। কায়েস ইবনে সাদ বললেন, সামান্য অর্থের দাবির কারণে আমার বন্ধুরা আমাকে দেখতে আসতে পারছে না। এটা কেমন কথা! সে এক খাদেমকে ডেকে ঘোষণা দিতে বললো, যার কাছে কায়েস ইবনে সাদের যত পাওনা রয়েছে সব তিনি মওকুফ করে দিয়েছেন। এই ঘোষণা শোনার পর তার দুয়ারে যেনো মানুষের ঢল নামলো। এমনকি মানুষের প্রচণ্ড ভীরে ঘরের দরজা খুলে পড়ার উপক্রম হলো। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪২৩)

২২. আবু ইসহাক (র) বলেন, একদিন আমার কাছে ঋণী এমন এক ব্যক্তির খোঁজে আমি কুফার আশআস মসজিদে গেলাম। সালাম ফেরাতেই আমাকে এক সেট কাপড় ও এক জোড়া জুতা দেওয়া হলো। আমি বললাম, আমি এই মসজিদের নিয়মিত মুসল্লি নই। বলা হলো, আশআস ইবনে কায়েস গতকাল মক্কা থেকে কুফায় ফিরে এসেছেন। তাই এই মসজিদে যে-ই নামায পড়বে, তাকে এক সেট কাপড় ও একজোড়া জুতা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪৪১, ইবনু আবিদ দুনিয়া : আল ইখওয়ান : ২২২)

২৩. আবু সাদ খুরকুশী নিশাপুরী (র) বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে হাফিয মুহাম্মদের নিকট শুনেছি— মিসরে এক লোক ফকীরদের জন্য চাঁদা তুলে দিত। ঘটনাক্রমে এক লোকের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সেই চাঁদা সংগ্রহকারীর নিকট গিয়ে বলল, আমার ঘরে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু এখন আমার হাতে কোনো টাকাকড়ি নেই। এ কথা শুনতেই লোকটি তার সাথে চলল এবং বিভিন্ন লোকের নিকট গেল। কিন্তু কারও নিকট থেকে কিছুই পেল না। এরপর সে এক লোকের কবরের কাছে এসে বলতে লাগল, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন! তুমি বেঁচে থাকতে অনেক দান করতে। আজ আমি অনেকের নিকট গেলাম এবং এই লোকটির জন্য অনেক চেষ্টা করলাম; কিন্তু আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এরপর নিজের থেকে একটি দীনার বের করে সেটি ভাঙ্গিয়ে অর্ধেক লোকটির হাতে দিয়ে বলল, আমি তোমাকে ঋণ হিসেবে দিলাম। যখন পার ফেরত দিয়ো। লোকটি অর্ধেক দীনার নিয়ে বাড়ি চলে এল এবং সন্তানের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে নিল। রাতে সে চাঁদা সংগ্রহকারী লোকটি স্বপ্নে দেখল, কবরস্থ লোকটি তাকে বলছে, তুমি আমার কবরের কাছে বসে যা বলেছিলে, আমি সব শুনেছি। কিন্তু তখন জবাব দেওয়ার অনুমতি ছিল না তাই জবাব দিতে পারিনি। এখন শোনো, তুমি আমার ঘরে গিয়ে আমার সন্তানদেরকে উনুনের নিচে খনন করতে বলবে। সেখান থেকে একটি পাত্রে পাঁচশ দীনার বের হবে। সেগুলো তাদের নিকট থেকে নিয়ে সেই লোককে দিয়ে দাও, যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ঘুম থেকে উঠে সে ওই ব্যক্তির সন্তানদের নিকট গেল এবং স্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করল। তারা তাকে বসতে বলে উনুন খনন করল এবং পাঁচশ দীনার বের করে তার সামনে রেখে

দিল। সে বলল, এ সম্পদ তোমাদের। আমার স্বপ্নের কী মূল্য? সন্তানরা বলল, যার সম্পদ, তিনি তো মৃত্যুর পরেও দান করেন। আমরা জীবিত অবস্থায় করব না কেন? লোকটি দীনার নিয়ে নিল এবং যার সন্তান হয়েছিল, তাকে দিয়ে দিল এবং স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে বলল, এখন এই সম্পদ তোমার। যা ইচ্ছা করো। সে একটি দীনার ভাঙ্গিয়ে নিল। অর্ধেক দিয়ে কর্জ শোধ করল এবং অর্ধেক নিজে রেখে বলল, আমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। অবশিষ্ট সকল দীনার তুমি ফকীরদের মাঝে বিলিয়ে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, এই তিনজনের মধ্যে সর্বাধিক দাতা কাকে বলবো? (খুরকুশি : আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ)

২৪. বর্ণিত আছে, ইমাম শাফেয়ী (র) মৃত্যুকালে ওসিয়ত করলেন যে, অমুক ব্যক্তি তাঁকে গোসল দেবে। মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তিকে ওসিয়তের কথা জানানো হলে সে এসে তাঁর খরচের খাতা দেখল। জানা গেল, তাঁর যিম্মায় সত্তর হাজার দিরহাম ঋণ রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ সেই কর্জ নিজের যিম্মায় নিয়ে ইমাম সাহেবকে ঋণ মুক্ত করে দিল। এরপর বলল, আমার গোসল দেওয়ার দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য এটাই ছিল। অর্থাৎ, আমি যেন তাঁকে ঋণের কলুষতা থেকে পবিত্র করে দিই।

আবু সাদ (র) বলেন, আমি যখন মিসরে গেলাম, তখন এই লোকের ঠিকানা খোঁজ করলাম। ঠিকানা পেয়ে তার বাড়ি গিয়ে তার পুত্র ও পৌত্রদের কয়েকজনকে পেলাম। সকলেরই মুখমণ্ডলে কল্যাণ ও বরকতের চিহ্ন প্রস্ফুটিত ছিল। তাদের পিতার কল্যাণ ও বরকত তাদের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। (আর রিশালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪৪২)

২৫. ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, একটা মাত্র ঘটনা শুনে আমি হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমানকে মহব্বত করতে শুরু করেছি। ঘটনাটি এই,

একদিন তিনি গাধার পিঠে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। লাগাম ধরে নাড়া দিতেই হঠাৎ লাগামের কীলক ভেঙে গেলো। তিনি ছেড়া লাগাম নিয়ে এক দরজির কাছে এলেন এবং দরজিকে সহজে কাজ সমাধা করার সুযোগ দিতে গাধার পিঠ থেকে নামতে চাইলেন। দরজি বললো, আল্লাহর কসম! আপনি নামবেন না। আমি এভাবেই লাগামে কীলক লাগিয়ে দিচ্ছি। দরজি কীলক লাগিয়ে দিলো। তখন হাম্মাদ (র) দশ দীনার ভর্তি ছোট একটা

থলে বের করলেন এবং দরজিকে তা দিয়ে দিলেন এবং এর চেয়ে বেশি দিতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। (বায়হাকি, মানাকিবুশ শাফেয়ি, ২ : ২৩২)

২৬. রবি ইবনে সুলাইমান (র) বলেন, এক ব্যক্তি শাফেয়ী (র)-এর ঘোড়ার লাগাম ধরল, তখন তিনি বললেন, রবি এ ব্যক্তিকে চার দিরহাম দিয়ে দাও এবং কম দেওয়ার কারণে আমার পক্ষ থেকে অপারগতা প্রকাশ করো।

২৭. রবি ইবনে সালাইমান (র) বলেন, আমি হুমায়দিকে বলতে শুনেছি, একবার শাফেয়ি (র) সানআ থেকে দশ হাজার দীনার নিয়ে মক্কায় এলেন এবং মক্কার বাইরে তাঁবু ফেললেন। তিনি তাঁবুর সামনে কাপড় বিছিয়ে তাতে সবগুলো দীনার ঢেলে দিলেন। তার সাথে সেদিন যে-ই দেখা করতে এলো তাকে তিনি এক মুঠো দীনার দিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দান করে গেলেন। একসময় আর কোনো দীনারই বাকি রইলো না। (বায়হাকি, মানাকিবুশ শাফেয়ি : ২ : ২২০, তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৪৩)

২৮. আবু সাওর বলেন, শাফেয়ি (র) মক্কা থেকে বের হয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার মনস্থ করলেন। তার সাথে সামান্য পরিমাণ সম্পদ ছিলো। আর তার দানশীলতার কারণে খুব কম সম্পদই তার হাতে থাকতো। আমি বললাম, এই সম্পদ দিয়ে আপনার ও আপনার সন্তানের নামে কিছু ফসলি জমি কিনে রাখুন। আমার কথা শুনে শাফেয়ি (র) বের হয়ে গেলেন, কিছুক্ষণ পরে ফিরেও এলেন। আমি তাকে সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আমার পছন্দমতো কোনো ফসলি জমি মক্কায় পাওয়া গেলো না। তবে সেই টাকা দিয়ে আমি মিনায় কিছু তাঁবু নির্মাণ করেছি। হজের মওসুমে তা আমার ভাইদের কাজে আসবে। (বায়হাকি, মানাকিবুশ শাফেয়ি : ২ : ২২৩)

২৯. মুহাম্মদ ইবনে আব্বাদ মুহাল্লাবী (র) বর্ণনা করেন, আমার বাবা খলীফা মামুনের নিকট গেলে তিনি তাকে এক লক্ষ দিরহাম দেন। খলীফার নিকট থেকে চলে আসার পর তিনি সব টাকাপয়সা দান করে দেন। খবর পেয়ে খলীফা তাকে ডেকে শাসালেন। আমার বাবা বিনীত জবাবে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! উপস্থিত অর্থ দান না করলে মাবুদের প্রতি খারাপ ধারণা করা হয়। এতে খলীফা খুবই আনন্দিত হলেন এবং

আরও দু'লাখ দিরহাম দিয়ে দিলেন। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৪৪, তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ২১ : ১৩২)

৩০. সাঈদ ইবনে আস (র) এর কাছে এসে এক লোক কিছু চাইলো। তিনি লোকটিকে এক লক্ষ দিরহাম দানের আদেশ দিলেন। দিরহামগুলো হাতে নিয়ে লোকটা কেঁদে ফেললো। সাঈদ ইবনে আস (র) বললেন, কী হলো, আপনি কাঁদছেন কেনো? লোকটি উত্তর দিলো, আপনার মতো মানুষকেও একদিন ভূগর্ভে শয্যা নিতে হবে, এই ভেবে কাঁদছি। লোকটার কথা শুনে সাঈদ ইবনে আস (র) তাকে আরও এক লক্ষ দিরহাম দান করলেন। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৪৬, তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ২১ : ১৩২)

৩১. কয়েক ছত্র প্রশংসাকাব্য লিখে কবি আবু তাম্মাম ইবরাহিম ইবনে শাকালার কাছে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, তিনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি অসুস্থ অবস্থায় তার প্রশংসা কবিতা শুনলেন এবং কোষাধ্যক্ষকে বললেন, কবিকে কিছু হাদিয়া দিয়ে দাও। এরপর বললেন, এখন কিছু নাও, আমি সুস্থ হয়ে উঠলে তোমাকে উপযুক্ত প্রতিদান দেবো।

আবু তাম্মাম দীর্ঘ দুই মাস প্রতিদানের প্রতীক্ষায় থাকলেন। একসময় অধৈর্য হয়ে ইবরাহিম ইবনে শালকালাকে লিখে পাঠালেন,

'সোনা-রূপাকে যেমন সমতা ছাড়া বিক্রি করা অবৈধ,

তেমনি কবির মুখ থেকে প্রশংসা শুনে উপযুক্ত প্রতিদান না দেওয়াও অশোভনীয়।'

পঙ্‌ক্তি দুটো ইবরাহিমের কাছে পৌঁছলে তিনি কোষাধ্যক্ষকে বললেন, আবু তাম্মাম কত দিন যাবত অপেক্ষা করছে? কোষাধ্যক্ষ বললো, দুই মাস। তাহলে তাকে ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে দাও এবং দোয়াত কলম নিয়ে এসো। দোয়াত কলম আনা হলে ইবরাহিম ইবনে শাকালা লিখলেন,

তুমি তাড়াহুড়ো করেছো
তাই বিনিময় কম পেয়েছো,
আরেকটু ধৈর্য ধরলে পর্যাপ্তই পেতে
যা দিচ্ছি তাই নাও।
আর মনে রেখো,
তুমি যেনো আমার প্রশংসায় কোনো কিছু লেখোনি।
আর আমিও তোমাকে কিছু দেইনি।

৩২. বর্ণিত আছে, তালহা (রা)-এর যিম্মায় উসমান (রা)-এর ৫০ হাজার দিরহাম পাওনা ছিল। একদিন উসমান (রা) মসজিদে যাওয়ার সময় তালহা (রা) এসে বললেন, আপনার এখানে পাওনা রয়েছে, নিয়ে নিন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে-ই এই অর্থ দিয়ে দিলাম। (ইবনুল আসাকির, তারিখু দিমাশক : ২৫ : ১০৩)

৩৩. সুদা বিনতে আওফ (রা) বলেন, আমি একদিন তালহা (রা)-এর দরবারে গিয়ে তাকে ভারাক্রান্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মন খারাপ দেখছি যে? তিনি বললেন, আমার নিকট কিছু টাকা জমা আছে। ভাবছি, কী করা যায়। আমি বললাম, তাতে চিন্তার কী আছে? আপনার বংশের লোকদের ডেকে বিলিয়ে দিন। তিনি সাথে সাথে গোলামকে পাঠিয়ে সবাইকে ডেকে আনলেন এবং সবগুলো টাকা বিলিয়ে দেন। আমি গোলামকে অর্থের পরিমাণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, চার লাখ দিরহাম হবে। (ইবনে সাদ, আত তাবাকাত : ৩ : ২০১)

৩৪. এক বেদুঈন তালহা (রা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে কিছু চাইল এবং কিছু আত্মীয়তাও প্রকাশ করল। তিনি বললেন, এ পর্যন্ত আত্মীয়তার কারণে কেউ আমার কাছে কিছু চায়নি। আমার এক খণ্ড ভূমি আছে, যা উসমান তিন লাখ দিরহামে কিনতে চান। তুমি ইচ্ছা করলে সে জমিটি নিয়ে যাও। তা না হলে এর মূল্য তোমাকে দিয়ে দিব। বেদুঈন জমির পরিবর্তে মূল্য নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তালহা (রা) জমিটি উসমান (রা)-এর কাছে বিক্রি করে মূল্য বেদুঈনকে দিয়ে দিলেন। (আবু বকর শাফেয়ি, আল গায়লানিয়্যাত : ১০৮৩)

৩৫. বর্ণিত আছে, একদিন লোকেরা আলী (রা)-কে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করল, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, সাতদিন ধরে আমার বাড়িতে কোনো মেহমান আসেনি। আল্লাহ তাআলা আমাকে অসম্মানিত করেছেন বলে আমার ভয় হয়। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২২৮)

৩৬. একবার এক ব্যক্তি তার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, কী মনে করে আসলে? সে বলল, আমার যিম্মায় চারশ দিরহাম ঋণ রয়েছে। সাথে সাথে তার বন্ধু চারশ দিরহাম গুণে তার হাতে তুলে দিল। এরপর সে কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকলো। তার স্ত্রী বলল, যদি এতগুলো দিরহাম দেওয়া এতই কষ্টকর ছিল, তাহলে না দিলেই তো

পারতে। সে বলল, আমার কান্নার কারণ হলো, তার অবস্থা তার বলা ছাড়া আমি জানতে পারলাম না কেন? আমি যদি নিজেই খবর নিতাম, তাহলে তার চাওয়ার দরকার হতো না। (প্রাগুক্ত : ৪২১)

কৃপণতার নিন্দা

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَ مَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফল। (সূরা হাশর : ৯, সূরা তাগাবুন : ১৬)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

আর আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তাদের দিয়েছেন, তাতে যারা কার্পণ্য করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে;তাদের জন্য তা মঙ্গল, বরং এটা তাদের জন্য অমঙ্গল। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করবে, কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। (সূরা আলে ইমরান : ১৮০)

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ.

(আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন না) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে। (সূরা নিসা : ৩৭)

হাদিস

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তোমাদের পূর্বের জাতিবর্গ কৃপণতার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। কৃপণতার কারণে তারা একে অন্যের রক্ত ঝড়িয়েছে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ করে নিয়েছে। (মুসলিম : ২৫৭৮; শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৩৩৮, তাবারানি : আল মুজামুল আওসাত : ৮৫৫৬)

রাসূলে আকরাম (স) ইরশাদ করেন,

কৃপণতা থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এই কৃপণতা ধ্বংস করেছে। তাদেরকে পরস্পরে রক্ত প্রবাহিত করতে

উত্তেজিত করেছে এবং হারামকে হালাল করতে প্ররোচিত করেছে এবং আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে। (মাসাইউল আখলাক, খারাইতি : ৩৫৬)

আরও বলা হয়েছে—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيْلٌ وَلَا خَبٌّ وَلَا خَائِنٌ وَلَا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ.

অর্থাৎ, কৃপণ, প্রতারক, খিয়ানতকারী ও চরিত্রহীন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তিনটি বস্তু মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। কৃপণতা, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও আত্মমুগ্ধতা। (মাসাইউল আখলাক, খারাইতি : ৩৬৯; তাবারানি, আল মুজামুল আওসাত : ৮৫৫৬, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৭৩১, হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৩৪৩)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ খুবই অপছন্দ করেন। তারা হলো, বৃদ্ধ ব্যাভিচারী। কৃতঘ্ন কৃপণ ও ধোঁকাবাজ শ্রমিক। (মাসাইউল আখলাক, খারাইতি : ৩৭৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উদাহরণ হলো দুজন ব্যক্তির মতো, যাদের বুক থেকে গলা পর্যন্ত লোহার জামা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দানশীল ব্যক্তি যখন কোনো সম্পদ খরচ করে তখন জামাটি তার গায়ে ঢিলা হয়ে যায় এবং হাড্ডিগুলো আরাম পেতে থাকে। আর কৃপণ ব্যক্তি যখন খরচ করতে গরিমসি করে তখন লোহার জামা তার শরীরের উপর চেপে বসে এবং কড়াগুলো হাড্ডির উপর চেপে বসতে থাকে। যন্ত্রণায় সে নীল হয়ে যেতে থাকে। সে হাত দিয়ে টেনে লোহার জামা আগলা করতে চায়; কিন্তু পারে না। (মাসাইউল আখলাক, খারাইতি : ৩৭৬, মূল হাদিস হলো, সহিহ বুখারী : ১৪৪৪ ও সহিহ মুসলিম : ১০২১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দুটি অভ্যাস কখনো মুমিনের চরিত্রে একত্র হতে পারে না। সে দুটি হলো, কৃপণতা ও বদ চরিত্র। (জামে তিরমিযী : ১৯৬২, মাসাইউল আখলাক, খারাইতি : ৩৭৭)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, জুলুম কেয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে। তোমরা অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, আল্লাহ অশ্লীল কর্ম পছন্দ করেন না। তোমরা কৃপণতা করো না। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস

হয়েছে। কৃপণতার কারণে তারা মিথ্যার নির্দেশনা পেয়েছে। তারা মিথ্যা বলেছে। অন্যায় অবিচারের নির্দেশনা পেয়ে তারা সম্পর্কচ্ছেদের প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৭০৫৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মানব চরিত্রের সবচেয়ে নিকৃষ্ট দোষ হলো, লোভাতুর কৃপণতা ও সাহস শূন্য ভীরুতা। (সুনানে আবু দাউদ : ২৫১১)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এক ব্যক্তি শহিদ হলো। তার শোকে জনৈক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করতে লাগলো। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মহিলা কি বুঝতে পারছে না সে শহিদের মর্যাদা পেয়েছে! বেঁচে থাকলে হয়তো সে কোনো অন্যায় কথা বলতো কিংবা পকেটে পয়সা রেখে কৃপণতা করতো। (মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৬৬৪৬, কাছাকাছি অর্থে-জামে তিরমিযী : ২৩১৬)

জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে হুনাইনের অভিযান শেষ করে ফিরছিলাম। পথিমধ্যে একদল বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (স)-কে আকড়ে ধরলো এবং কিছু সাহায্য চাইতে লাগলো। তারা চাওয়ার ক্ষেত্রে ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে গেলো এবং তাঁকে ঠেলতে ঠেলতে এক কাঁটা বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেলো। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর গায়ের চাদরটি কেড়ে নিলো। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের বললেন, আমার চাদর ফেরত দিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! এই গাছের কাঁটা পরিমাণ বিপুল নিয়ামত যদি আমার থাকতো তাহলে সব আমি তোমাদের মাঝে বন্টন করে দিতাম। তখন তোমরা আমাকে কৃপণ, অসৎ, ভিরু কিছুই বলতে পারতে না। (সহিহ বুখারী : ২৮২১)

ওমর (রা) বলেন, কতক লোককে একবার রাসূলুল্লাহ (স) কিছু সম্পদ দান করলেন। আমি তখন বললাম, আপনি এদের সম্পদ দান করলেন, অথচ অন্যদের প্রাপ্য অধিকার তাদের চেয়ে বেশি ছিলো! রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাদের অধিকার রয়েছে, আমার কাছ থেকে তারা ভালোমন্দ বলে কিছু আদায় করে নিতে পারে। আবার তারা আমাকে কৃপণও বলতে পারে। যদিও আমি কৃপণ নই। (সহিহ মুসলিম : ১০৫৬)

আবু সাঈদ খুদরি (রা) বলেন, দুজন লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলো এবং উট ক্রয় বাবদ কিছু অর্থ সাহায্য চাইলো। রাসূলুল্লাহ (স) তাদের দুটি দীনার দান করলেন। তারা ফিরতি পথ ধরলো। পথিমধ্যে

তাদের সাথে ওমর (রা)-এর দেখা হলো। লোক দুটি ওমর (রা)-এর কাছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রশংসা করে অনেক কথা বললো। তাদের দান করার কারণে বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো। ওমর (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলেন এবং লোক দুটির আচরণের বিষয়ে খুলে বললেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, ওমর! আমি অমুক ব্যক্তিকে তাদের চেয়েও বেশি সম্পদ দান করেছিলাম। কিন্তু সে তো এমন কিছু বলেনি! আসলে কিছু লোক আমার কাছে এসে চায়। আমি তাকে দিয়েও দেই। কিন্তু সাথে করে তারা জাহান্নামই নিয়ে যায়।

ওমর (রা) বললেন, এগুলো যদি আগুনের মতো এতো ভয়ংকর হয়, তাহলে আপনি তাদেরকে দান করেন কেন? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দিলেন, তারা যেনো আমার কাছে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত না হয়। আর আল্লাহ আমাকে কৃপণ হতে নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে আবু ইয়ালা : ১৩২৭, অনুরূপ অর্থে মুসনাদে আহমদ : ৩ : ৪)

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, বদান্যতা হলো আল্লাহর দানের একটা অংশ। কাজেই তোমরা বদান্যতা প্রদর্শন করো। আল্লাহ তোমাদের দান করবেন। আল্লাহ বদান্যতা সৃষ্টি করে তাকে মানবাকৃতি দান করেন। তার মূলকে তুবা বৃক্ষের মতো উন্নত করেন। তার ডালপালা ছড়িয়ে দেন সিদরাতুল মুনতাহার ডালপালার মাঝে। কিছু ডালকে আল্লাহ পৃথিবীমুখী করে দেন। কাজেই বদান্যতার কোনো একটি শাখার সাথে যে সখ্যতা বজায় রাখবে, সে জান্নাতে যাবে। শোনো, বদান্যতা হলো ঈমানের অঙ্গ। আর ঈমান মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়।

আল্লাহ কৃপণতা সৃষ্টি করেছেন তার ঘৃণা থেকে। তার মূল যাককুম বৃক্ষের সাথে সংযোজিত। তার কিছু ডালপালা ছড়িয়ে আছে দুনিয়ায়। যে এই ডালের কোনো একটা গ্রহণ করবে, সে জাহান্নামবাসী হবে।

শোনো, কৃপণতা কুফরের একটা অংশ। আর কুফর মানুষকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে। (আলাউদ্দিন মুত্তাকি হিন্দি, কানযুল উম্মাল : ১৬২১৭)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, বদান্যতার বৃক্ষ জান্নাতে জন্ম হয়। তাই দানশীলরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। কৃপণতা হলো জাহান্নামে উৎপাদিত একটি বৃক্ষ। কাজেই কৃপণরা জাহান্নামে যাবে। (মুসনাদে ফেরদাউস : ৩৫৪৩)

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সারা জীবন কৃপণ থেকে মৃত্যুর সময় দানশীল হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলা তাদের পছন্দ করেন না। (দায়লামি, মুসনাদে ফেরদাউস : ৬২৮)

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এক ব্যক্তির অন্তরে কখনো ঈমান ও কৃপণতা একত্র হতে পারে না। (সুনানে নাসায়ী : ৬ : ১৩)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, কৃপণ বা ভীরু হওয়া মুমিনদের সাজে না। (হাননাদ : আয যুহদ : ৬২৬)

রাসূলে আকরাম (স) এভাবে দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নিকট আমি আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, তোমার নিকট আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে এবং তোমার নিকট আশ্রয় চাই চরম বার্ধক্যে পৌঁছা থেকে। (সহিহ বুখারী : ৬৩৬৫)

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) বনী লিহ্ইয়ানের দূতদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নেতা কে? তারা বলল, আমাদের নেতা জাদ্দ ইবনে কায়েস। কিন্তু সে কিছুটা কৃপণ। তিনি বললেন, কৃপণতার চেয়ে বড় ব্যাধি আর কী হতে পারে? সে তোমাদের নেতা নয়; বরং আমর ইবনে জুমু তোমাদের নেতা। (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৩৫৮, বুখারী, আল আদাবুল মুফরাদ : ২৯৬)

আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, গুনাহগার দাতা আল্লাহ তাআলার নিকট কৃপণ আবিদ থেকে উত্তম। (জামে তিরমিযী : ১৯৬১)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা বললো, আমাদের নেতা হলো জাদ্দ ইবনে কায়েস। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাকে নেতা বানালে কেন? তারা বললো, আমাদের মধ্যে সে সবচেয়ে সম্পদশালী। তবে কৃপণতার দায়ে অভিযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কৃপণতার চেয়ে মন্দ ব্যাধি আর কী হতে পারে! সে নেতৃত্বদানের যোগ্য নয়। তারা বললো, তাহলে কে আমাদের নেতা হবে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, বিশর ইবনে বারা হবে তোমাদের নেতা। (আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২ : ৩৫, মুসতাদরাকে হাকেম : ৩ : ২১৯, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৩৫৯)

এক হাদীসে আছে, কেউ কেউ বলে, কৃপণ ব্যক্তি জালিমের তুলনায় ক্ষমাযোগ্য। অথচ আল্লাহর নিকট কৃপণতার চেয়ে বড় কোনো জুলুম নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইজ্জতের কসম খেয়ে বলেন, না কৃপণ বেহেশতে যাবে, না "শাহীহ"। অর্থাৎ, যে অপরকে দান করতে দেখে গায়ে জ্বালা অনুভব করে। (আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৪০৭৮)

এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার কা'বা তওয়াফ করার সময় দেখলেন, এক লোক কা'বার গিলাফ জড়িয়ে ধরে বলছে— হে আল্লাহ! এই ঘরের ইজ্জতের খাতিরে আমার গুনাহ ক্ষমা করো। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গুনাহ কী? আমার নিকট বলো। সে আরয করল, আমার গুনাহ বর্ণনাতীত। তিনি বললেন, তোমার গুনাহের ওজন বেশি, না সাত স্তর বিশিষ্ট পৃথিবীর ওজন বেশি? সে বলল, আমার গুনাহের ওজন বেশি। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গুনাহের ওজন বেশি, না পাহাড়-পর্বতের ওজন বেশি? সে বলল, আমার গুনাহের ওজন বেশি। রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গুনাহের ওজন বেশি, না সমুদ্রের ওজন বেশি? লোকটি বলল, আমার গুনাহের ওজন বেশি। আবার প্রশ্ন করা হলো, তোমার গুনাহ বেশি, না আকাশসমূহের ওজন বেশি? সে বলল, আমার গুনাহের ওজন বেশি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গুনাহ বড়, না আরশ বড়? সে বলল, আমার গুনাহ বড়। প্রিয়নবী (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার গুনাহ বড়, না করুণাময় আল্লাহ তাআলা বড়? লোকটি বলল, আল্লাহ তাআলা অনেক বড়। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাহলে তুমি তোমার গুনাহ আমার নিকট বলো। লোকটি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সম্পদশালী। কিন্তু যখন ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চায়, তখন মনে হয় যেন একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আমার সামনে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি আমার নিকট থেকে দূরে থাকো। তোমার আগুনে আমাকে পুড়িয়ো না। সেই আল্লাহর কসম! যিনি আমাকে হিদায়াত ও সত্যসহ পাঠিয়েছেন, যদি তুমি রোকন ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দশ লক্ষ বছর নামায পড়, তারপর তত বছর ক্রন্দনের ফলে তোমার চোখের পানিতে নদীনালা প্রবাহিত হয়, গাছপালা ভিজে যায়, এরপর কৃপণ অবস্থায় তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তোমার সর্বনাশ হোক! তুমি কি জান না, কুফরের একটি অংশ

কৃপণতা এবং কুফর যাবে জাহান্নামে? তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ.

যারা কৃপণতা করে, তারা তো কৃপণতা করে নিজেদের প্রতিই। (সূরা মুহাম্মাদ : ৩৭)

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

যাদেরকে অন্তরের কৃপণতা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফল। (সূরা হাশর : ৯, সূরা তাগাবুন : ১৬)। (ফাকিহি, আখবারু মাক্কাতা : ২ : ২৭৮) (হাফেজ ইরাকি (র) বলেন, এটা ভিত্তিহীন অমূলক একটা হাদিস। ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ১৯৭)

আসার

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা "জান্নাতে আদন" সৃষ্টি করে তাকে বললেন, তোমার ঝরনাগুলো প্রকাশ করো। সে "সালসাবিল", "আইনে কাফুর" ও "আবে তাসনীম" নামে ৩টি ঝরনা বের করে। এগুলোতে শরাব, মধু ও দুধের নদী প্রবাহিত হতে লাগল। আল্লাহ তাআলা আবার ইরশাদ করলেন, তোমার কুরসী, অলংকার, পোশাক ও আয়তলোচনা হূর প্রকাশ করো। জান্নাতে আদন এ হুকুমও পালন করে। এরপর আল্লাহ তাআলা জান্নাত পরিদর্শন করে ইরশাদ করলেন, কিছু বলো। জান্নাত বলল, যে আমার মধ্যে থাকবে, তার জন্য সুসংবাদ। ইরশাদ হলো, আমার ইজ্জতের কসম! আমি কোনো কৃপণকে তোমার মধ্যে স্থান দেব না। (তারিখু দিমাশক, ইবনে আসাকির : ৫২ : ১৫০)

উমর ইবনে আবদুল আযীযের বোন উম্মুল বানিন বলেন, ধিক কৃপণকে! কৃপণতা যদি জামা হতো, তবে আমি তা কখনো পরিধান করতাম না। যদি রাস্তা হতো, আমি সে রাস্তায় চলাচল করতাম না। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪২৮)

তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ বলেন, কৃপণদের মতো আমাদেরও সম্পদ দান করতে কষ্ট হয়। কিন্তু আমরা কষ্টের গলা টিপে ধরে হলেও দান করে যাই। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৮৩৮)

মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (র) বলেন, আল্লাহ কোনো জাতির অকল্যাণ চাইলে তাদের ওপর মন্দ লোকদের শাসন চাপিয়ে দেন এবং তাদের সমুদয় সম্পদ কৃপণদের কুক্ষিগত করে দেন। (মাসাইউল আখলাক, খারাইতি : ৩৫৭)

আলী (রা) বলেন, এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ দাঁতে কামড়ে ধরে হলেও সম্পদ আগলে রাখবে। মুমিনরাও তখন আল্লাহর আদেশ মান্য না করে হাতে থাকা সম্পদ নিয়ে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকবে। অথচ আল্লাহ তাআলার আদেশ ছিলো এমন, وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা ভুলে যেয়ো না। (সূরা বাকারা : ২৩৮; সুনানে আবু দাউদ : ৩৩৮২, মাসাইউল আখলাক, খারাইতি : ৩৫৮)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, সম্পদের লোভ কৃপণতার চেয়েও ভয়ানক ব্যাধি। কৃপণ ব্যক্তি তো নিজের কাছে যা আছে তাই নিয়ে কৃপণতা করে, কিন্তু যে সম্পদলোভী সে অন্যের অধিকারে থাকা সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজে কুক্ষিগত করে। আর নিজের কাছে যে সম্পদ আছে, তাতে খরচ করে না। (মাসাইউল আখলাক, খারাইতি : ৩৫৯)

শাবি (র) বলেন, মিথ্যা ও কৃপণতা দুটোর মধ্যে জাহান্নামের অতলে থাকবে আমি জানি না। (মাসাইউল আখলাক খবাইতি : ৩৬০)

বর্ণিত আছে, পারস্য বাদশাহ নওশেরওয়ানের কাছে একবার এক ভারতীয় পণ্ডিত ও এক রোমক দার্শনিক আসলো। বাদশাহ ভারতীয় পণ্ডিতকে বললো, আমাকে কিছু মূল্যবান কথা শোনাও। পণ্ডিত বললো, সর্বোত্তম মানব সেই, অন্যরা যাকে দাতা হিসেবে ভালোবাসে। যে ক্রোধের সময় শান্ত থাকে। ধীরস্থীরতার সাথে কথা বলে। সম্মানিয় ব্যক্তির সামনে বিনয়ী হয়। আত্মীয়স্বজনদের প্রতি যত্নশীল হয়।

বাদশাহ রোমক দার্শনিককে বললেন, তুমি কিছু কথা শোনাও দেখি। দার্শনিক বললো, কৃপণের সম্পদ শত্রু ভোগ করে। অকৃতজ্ঞতা সফলতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মিথ্যাবাদীরা নিন্দিত। চুগলখোর ব্যক্তি দরিদ্র হয়ে মারা যায়। যার মনে দয়া নেই তার উপর দয়াহীন ব্যক্তিকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। (মাসাইউল আখলাক খবাইতি : ৩৬৪)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ أَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ.

অর্থ : আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গিয়েছে। (সূরা ইয়াসিন : ৮)

দাহহাক (র) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে গলায় বেড়ি পড়ানোর অর্থ হলো কৃপণ করে দেওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ তাদের হাতকে ব্যয়কুণ্ঠ করে দেবেন। ফলে তারা হেদায়াতের দিশা পায় না। (মাসাইউল আখলাক খবাইতি : ৩৭০)

কাব আহবার (র) বলেন, প্রতিদিন সকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত দুজন ফেরেশতা দুআ করে, আল্লাহ! আপনি কৃপণের ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করুন। আর দানশীল ব্যক্তির স্থলবর্তী কাউকে দ্রুত নিযুক্ত করুন। (মাসাইউল আখলাক খবাইতি : ৩৮৪, সহিহ বুখারী : ১৪৪২, সহিহ মুসলিম : ১০১০)

আসমায়ি (র) বলেন, কোনো এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এক বেদুঈন বলে, 'দুনিয়া তার চোখে ছোট হয়ে গেছে। সামনে থেকে কোনো প্রার্থীকে আসতে দেখলে তার মনে হয়, মালাকুল মাউত তার দিকে এগিয়ে আসছে। (আয-যুহদ, ইবনু আবিদ দুনিয়া : ৬২৪)

আবু হানিফা (র) বলেন, কোনো কৃপণ ব্যক্তির পক্ষে ন্যায় আচরণ করা সম্ভব নয়। কারণ, কৃপণতা তাকে অনুসন্ধান করতে উৎসাহিত করবে। ফলে সে নিজের প্রাপ্য অধিকারের চেয়ে পরিমাণে বেশি নেবে। আর যার এই অবস্থা তার মধ্যে কোনো আমানতদারিতা নেই। (ইবনু আবদিল বার, আল-ইসতিযকার : ২৭ : ৩৫৫)

আলী (রা) বলেন, মুমিন ব্যক্তি কখনো সম্পদের হিসাব নিকাশ করে না।

জাহিয (র) বলেন, পৃথিবীতে তিনটি বস্তুর স্বাদ কখনো শেষ হবে না। কৃপণের নিন্দা, শুকনো গোশত ও চুলকানি।

বিশর ইবনে হারিস (র) বলেন, কাউকে কৃপণ বললে গীবত হয় না। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স) এই শব্দটা ব্যবহার করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে কোনো এক মহিলার প্রশংসা করে বলা হলো, সে

সারাদিন রোযা রাখে। সারা রাত নামায পড়ে। তবে তার মধ্যে সামান্য কৃপণতার দোষ রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তাহলে কী কল্যাণই বা রইলো তার মধ্যে?! (শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৪১০)

তিনি আরও বলেন, কৃপণের দিকে তাকালে মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে যায়। তাই পৃথিবীতে কৃপণ লোক থাকা মানে মুমিন হৃদয়ের জন্য অসনি সংকেত। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ৩৫০, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ১০৪১২)

ইয়াহইয়া ইবনে মুআজ (র) বলেন, পাপাচারী হলেও মানুষ দানশীলকে ভালোবাসেন। পুণ্যাত্মা হলেও মানুষ কৃপণকে ঘৃণা করে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ৩৫০)

ইবনুল মুতাজ (র) বলেন, যে সম্পদ ব্যায়ে কুণ্ঠিত হয় তার সম্মান সহজেই শেষ হয়ে যায়। (সাআলাবি, আত-তামসিল ওয়াল মুহাজারাহ : ৪৪০)

একদিন ইয়াহ্ইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ)-এর অভিশপ্ত শয়তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি শয়তানকে জিজ্ঞেস করেন, বল, মানুষের মধ্যে তোর সবচেয়ে পছন্দীয় এবং সবচেয়ে অপছন্দনীয় কে? সে বললো, অধিক পছন্দনীয় ব্যক্তি হচ্ছে কৃপণ মুমিন এবং অত্যধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি হলো পাপিষ্ঠ দাতা। তিনি বললেন, এটা কেন? শয়তান বলল, কৃপণের জন্য তার কৃপণতাই যথেষ্ট— আমার তেমন কোনো দরকার নেই। কিন্তু যে দাতা গুনাহ করে, তার ব্যাপারে আমার ভয় থাকে, কোথাও দানশীলতার কারণে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি না আবার করুণার দৃষ্টি করেন। পরে সে আমার ক্ষমতার বাইরে চলে যায় এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়ে যায়। এ কথা বলে শয়তান চলে যেতে যেতে বললো, আপনি দাতা না হলে এসব কথা বলতাম না কখনো। (তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৬৪ : ২০৪)

কৃপণতার কিছু ঘটনা

এক. বাগদাদ নগরীতে অতিকৃপণ এক ধনী ব্যক্তি ছিলো। একবার তার এক বন্ধু তাকে বাড়িতে দাওয়াত করলো এবং তার সামনে কাবাব ও ডিম পরিবেশন করা হলো। লোকটা খুব খেলো। তার পেট ভরে খাবার গলার কাছে এসে পৌঁছলো। পরিশেষে পানি পান করাতে পেটের দু এক কোণা যাও খালি ছিলো, ভরে টইটম্বুর! ফলে পেট ফুলে ফাটার উপক্রম হলো। পেটের অসহ্য ব্যথায় সে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে শুরু করলো।

কিছুক্ষণ পর লোকটার পেট ব্যথা কিছুটা কমলো। সে পেট চেপে ধরে উপস্থিত হলো ডাক্তারের বাড়িতে। ডাক্তার তাকে দেখে বললো, খুব বেশি সমস্যা হয়েছে বলে মনে হয় না। তবে আপনি যদি মুখে আঙুল দিয়ে বমি করেন তাহলে পেটের অতিরিক্ত খাবার বের হয়ে যাবে এবং আপনিও স্বস্থিবোধ করবেন। ডাক্তারের কথা শুনে কৃপণ লোকটার চোখ বড় হয়ে গেলো। সে যারপরনাই আশ্চর্য প্রকাশ করে বললো, কিহ্! কাবাব ডিম খেয়ে এখন আমি বমি করবো? কী পাগলের মতো কথা বলছেন!! মরে যাবো তবুও আমি এই কাজ করবো না!!

দুই. এক বেদুঈন অনেক খোঁজাখুঁজি করে কৃপণ লোকটার বাড়ি খুঁজে পেলো। তখন লোকটার সামনে ছিলো তীন ফল। বেদুঈনকে আসতে দেখে কাঁধের চাদর নামিয়ে ফলগুলো ঢেকে ফেললো। বেদুঈন কৃপণ লোকটার সামনে এসে বসলো। লোকটা জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি কুরআন পড়তে পারো? বেদুঈন বললো, হ্যাঁ পারি। লোকটা বললো, শোনাও দেখি কেমন পারো। বেদুঈন তেলাওয়াত করতে শুরু করলো, (وَالزَّيْتُوْنِ وَطُوْرِ سِنِيْنَ) লোকটা অবাক হয়ে বললো, তীন (وَالتِّيْنِ) শব্দটি গেলো কই? বেদুঈন হেসে উত্তর দিলো, সেটা আপনার চাদরের নিচে আছে।

তিন. এক কৃপণ তার বন্ধুকে বাড়িতে দাওয়াত দিলো। লোকটা দুপুরবেলা কৃপণের বাড়িতে আসলো। দেখতে দেখতে আসরের ওয়াক্ত ঘনিয়ে এলো। কিন্তু তাকে কিছুই খেতে দেওয়া হলো না। এদিকে ক্ষুধায় লোকটার পেট যেন জ্বলছে। কিছুক্ষণ পর কৃপণ লোকটা এলো হাতে বীনা নিয়ে। বন্ধুকে সে বললো, কী সুর তুমি শুনতে চাও বলো, আমি তোমাকে বাজিয়ে শোনাচ্ছি। বন্ধু পেটের উপর হাত ডলতে ডলতে বললো, মনে হচ্ছে কড়াই পাতিল ঠোকাঠুকির বাজনাই এই পরিবেশে সবচেয়ে সুন্দর লাগবে।

চার. মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে খালেদ বার্মেকি ছিলো মহাকৃপণ লোক। একবার তার এক কাছের আত্মীয়ের কাছে জানতে চাওয়া হলো, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়ার দস্তরখান কেমন ও তাতে কী কী থাকে বলো দেখি! আত্মীয় লোকটা বললো, তার দস্তরখানা দৈর্ঘ্যে এক বিঘত ও প্রস্থে এক বিঘত। তার থালাগুলো এতই ছোট যে, মনে হয় সেগুলো পপি ফুলের বিজ দিয়ে বানানো হয়েছে। বলা হলো, মুহাম্মদের সাথে খেতে কে

কে আসে? সে বললো, কেরামান কাতিবিন ছাড়া আর কেউ না। তাহলে কি সে একাই আহার সারে? সে বললো, নাহ্, তা হতে যাবে কেন? তার সাথে বেশ কয়েকটি মাছিও আহার করে! বলা হলো, তোমার আত্মীয় মুহাম্মদ কতো ধনী মানুষ। তাহলে তোমার গায়ে এই জীর্ণশীর্ণ পোশাক দেখছি কেন? সে বললো, আমার নিজের একটা সুঁই কেনার মতোও সামর্থ্য নেই। আর মুহাম্মদের কথা বলছো...! আরে সে আমাকে দেবে কি, তার কাছে যদি বাগদাদ থেকে নাওবা পর্যন্ত লম্বা সুঁইয়ে ভর্তি একটা বাড়ি থাকে, তার কাছে স্বয়ং ইয়াকুব (আ)-কে নিয়ে জিবারঈল ও মিকাঈল (আ) উপস্থিত হয় এবং ইউসুফ (আ)-এর পেছন থেকে ছিড়ে যাওয়া জামাটা সেলাই করার জন্য একটা সুঁই চায় তাহলেও তাদেরকে সে সাফ মানা করে দেবে।

পাঁচ. বর্ণিত আছে, মারওয়ান ইবনে আবু হাফসা কৃপণতাবশত গোশত খেত না। মনে চাইলে সে গোলামকে একটি মস্তক কিনে আনতে বলত এবং তাই খেয়ে নিত। লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি, তুমি শীত ও গরম সব সময় মস্তক খাও! সে বলল, মস্তকের মূল্য আমার জানা আছে। এতে গোলাম চুরি করতে পারবে না এবং আমাকে লোকসান দিতে হবে না। এছাড়া গোশত রান্না করার সময় সে কিছু খেয়ে নিতে পারে। মস্তকে এটাও সম্ভবপর নয়। যদি সে মস্তকের চোখ, কান অথবা গালে হস্তক্ষেপ করে, তবে আমি বুঝতে পারব। এগুলো ছাড়া মস্তকে আমি কয়েক প্রকারের স্বাদ পাই। চোখের স্বাদ ভিন্ন, কান ও জিহ্বার স্বাদ আলাদা এবং মগজের স্বাদও পৃথক। তাছাড়া মস্তক রান্না করাও কঠিন নয়। এখন বুঝতেই পারছ এতে লাভ কত বেশি! (তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৫৭ : ২৯৫)

ছয়. মারওয়ান একদিন খলিফা মাহদির দরবারে যাচ্ছিল। তার বাড়ির এক মহিলা বলল, যদি তুমি পুরস্কার পাও, তবে আমাকে কী দিবে? সে বলল, যদি এক লাখ দিরহাম পাই, তবে এক দিরহাম তোমাকে দিব। ঘটনাক্রমে সে খলিফার কাছ থেকে ষাট হাজার দিরহাম লাভ করল। সে হিসাব করে মহিলাকে এক দিরহামের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ দিয়ে দিল। (তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৫৭ : ২৯৫)

সাত. একবার মারওয়ান এক দিরহামের গোশত কিনলে এক ব্যক্তি দাওয়াতের আবদার করল। সে তৎক্ষণাৎ গোশত কসাইয়ের হাতে ফেরত

দিয়ে দিরহামের এক-চতুর্থাংশ কম গ্রহণ করে বলে, আমার অপব্যয় করতে খারাপ লাগে। (তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৫৭ : ২৯৫)

আট. আমাশ (র)-এর এক পড়শী খুব কৃপণ ছিল। সে বরাবরই তাঁকে বলত, আমার বাড়ি গিয়ে আপনি এক খণ্ড রুটি লবণ দিয়ে খেলে কৃতার্থ হতাম। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করতেন। একদিন পড়শী অভ্যাস অনুযায়ী এ কথা আরয করল। তখন তাঁর ক্ষুধাও ছিল। তাই বললেন, আচ্ছা চলো। পড়শী তাঁকে বাড়ি এনে সত্যি সত্যিই এক খণ্ড রুটি ও লবণ সামনে রেখে দিল। এমন সময় ভিক্ষুক এসে হাঁক দিলে পড়শী তাকে বলল, মাফ করো। ভিক্ষুক দ্বিতীয়বার সওয়াল করলে সে পূর্ববৎ 'মাফ করো' বলল। কিন্তু তৃতীয়বার সওয়াল করতেই সে রেগে-মেগে বলল, চলে যাও। নতুবা লাঠি নিয়ে আসছি। আমাশ ভিক্ষুককে ডেকে বললেন, শাহজী! চলে চাও। এই গৃহকর্তা ওয়াদায় বড় পাক্কা। আল্লাহর কসম! আমি তার মতো সাচ্চা লোক দেখিনি। বহুদিন ধরে আমাকে লবণ দিয়ে রুটির টুকরা খেতে বলে আসছিল। আজ এ দুটি বস্তুর বেশি সে আমার সামনে রাখেনি।

আত্মোৎসর্গ ও তার গুরুত্ব

মনে রাখতে হবে, দানশীলতা ও কৃপণতার বহু স্তর রয়েছে। দানশীলতার স্তরগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আত্মোৎসর্গীকরণ। অর্থাৎ, নিজের অভাব থাকার পরও অপরকে দান করা। দানশীলতা হচ্ছে, যে জিনিসের নিজের দরকার নেই, তা অভাবী বা অন্য কাউকে দান করা। নিজের অভাব থাকা সত্ত্বেও অপরকে দান করা খুবই কঠিন কাজ। দানশীলতা যেমন উন্নীত হয়ে কখনো এমন স্তরে পৌঁছে যায় যে, অভাব থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিজের সম্পদ অন্যকে দিয়ে দেয়, তেমনি কৃপণতাও কখনো এত নিচু পর্যায়ে নেমে যায় যে, একান্ত প্রয়োজন সত্ত্বেও মানুষ নিজের জন্য খরচ করে না। যেমন কোনো কোনো কৃপণ অর্থসম্পদকে এমনভাবে আগলে রাখে যে, নিজে অসুস্থ হলে চিকিৎসা পর্যন্ত করে না এবং মনে কোনো কিছু খাওয়ার ব্যাপক চাহিদা থাকলেও তা কিনে খায় না— বিনা পয়সায় পেলে খায়। এ ধরনের লোক প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও নিজের সাথে কৃপণতা করে। অথচ আত্মত্যাগী মানুষ নিজের অভাবের ওপর অপরের অভাবকে প্রাধান্য দেয়। কাজেই এ দু'ব্যক্তির মধ্যে কত পার্থক্য!

আল্লাহ তাআলার একটি নিয়ামত হচ্ছে সচ্চরিত্র। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। দানশীলতায় আত্মত্যাগই সর্বোচ্চ স্তর। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা এই আত্মোৎসর্গের কারণেই করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

আর তারা নিজে অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়। (সূরা হাশর : ৯)

হাদীস শরীফে আছে,

اَيُّمَا امْرِؤٍ اِشْتَهٰى فَرَدَّ شَهْوَتَهُ وَاٰثَرَ عَلٰى نَفْسِهِ غُفِرَلَهُ.

অর্থাৎ, যার কোনো ইচ্ছা হয়, এরপর সে তা থেকে বিরত থাকে এবং নিজেকে না দিয়ে অপরকে দিতে ভালোবাসে, তার মাগফিরাত হবে। (আল কামিল, ইবনে আদি : ৫ : ১২৭)

আয়েশা (রা) বলেন, নবী কারীম (স) কখনো একাধারে তিনদিন পেটভরে খাবার খাননি। এমনি অবস্থা অব্যাহত ছিল দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত। আমরা ইচ্ছা করলে পেট ভরে খেতে পারতাম। কিন্তু মুহাজিরগণকে পেট ভরে খাওয়ানো ছিল আমাদের নিকট অগ্রাধিকার যোগ্য। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৪৯, অনুরূপ অর্থে- সহিহ বুখারী : ৫৩৭৪, সহিহ মুসলিম : ৫৪১৬, বায়হাকি : ১৩৯৬)

তিনি আরও বলেন, আমাদের বাড়িতে একবার একজন মেহমান আসলেন। সে সময় ঘরে কিছুই ছিল না। ইত্যবসরে জনৈক আনসারীও সেখানে আসলেন এবং মেহমানকে সাথে নিয়ে গেলেন। বাড়ি পৌঁছে মেহমানের সামনে সে খাবার রেখে দিয়ে স্ত্রীকে কুপি নিভিয়ে দিতে বললেন। সে অন্ধকারে নিজের হাতও খাবারের দিকে বাড়াতে লাগল, যেন মেহমানের সাথে খাওয়ার ভানকরে যাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে সে কিছুই খাচ্ছিল না। অবশেষে মেহমান সম্পূর্ণ খাবার খেয়ে নিল। সকালে রাসূলে আকরাম (স) আনসারীকে বললেন, রাতে মেহমানের সাথে তোমার আচরণ আল্লাহ তাআলা খুব পছন্দ করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে—

وَ يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

আর তারা নিজে অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের ওপর তাদের অগ্রাধিকার দেয়। (সূরা হাশর : ৯; সহিহ বুখারী : ৩৭৯৮; সহিহ মুসলিম : ২০৫৪)

মোটকথা, দানশীলতা আল্লাহ পাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর সর্বোচ্চ স্তরের নাম কুরবানী। এটা বিশ্বনবী (স)-এর নিত্যদিনের নিয়ম ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই চরিত্রকে মহান চরিত্র আখ্যায়িত করেছেন—

وَ إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

অবশ্যই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। (সূরা কলম : ৪)

সাহল তস্তরী (র) বলেন, মূসা (আ) দুআ করলেন, ইয়া আল্লাহ! আমাকে মুহাম্মদ (স) ও তাঁর উম্মতের কিছু মর্যাদা দেখিয়ে দিন। ইরশাদ হলো, হে মূসা! তুমি সইতে পারবে না। তবে একটি মহান মর্যাদা দেখিয়ে দিচ্ছি, যে কারণে আমি তাঁকে তোমার ওপর ও সমগ্র সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। এরপর একবারই ঊর্ধ্বজগতের পর্দা সরিয়ে নেওয়া হলো। মূসা (আ) যখন তাদের একটি মর্যাদা দেখলেন, তখন নূরের বিকিরণ ও আল্লাহর সান্নিধ্যের প্রভাবে তার প্রাণ উষ্ঠাগত হয়েছিল। তিনি আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, হে আল্লাহ! কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদেরকে এই মাহাত্ম্য দান করা হলো? ইরশাদ হলো, একটি গুণের কারণে, যা আমি তাদের মধ্যে রেখেছি এবং অন্যকে দান করিনি। অর্থাৎ, আত্মত্যাগের কারণে তারা এই মর্যাদা লাভ করেছে। হে মূসা! যদি কোনো ব্যক্তি সারা জীবন এই আত্মোৎসর্গ অবলম্বন করে এবং আমার নিকট আসে, তখন তার হিসাব নিতে আমি লজ্জা অনুভব করবো। কাজেই তাকে বিনা হিসেবে বেহেশতের যেখানে চাইবে, সেখানে স্থান দিব। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৫৪)

আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (র) নিজের কিছু জমি দেখার জন্য বের হন। পথে এক বাগানে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেন। বাগানে এক হাবশী গোলাম কাজ করছিল। যখন তার খাদ্য এলো, তখনি একটি কুকুর বাগানে ঢুকে গোলামের কাছে এলো। গোলাম কুকুরটিকে একটি রুটি দিয়ে দিল। এটি খাওয়া শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয় রুটিটিও দিয়ে দিল। এরপর তৃতীয়টিও

দিয়ে দিল। এভাবে দিতে দিতে সে সবগুলো রুটিই কুকুরকে খাইয়ে দিল। আবদুল্লাহ বসে বসে দেখছিলেন। অতঃপর তিনি গোলামকে জিজ্ঞেস করলেন, প্রতিদিন তোমার খাদ্য কতটুকু আসে?

গোলাম আরয করল, ততটুকুই, যতটুকু আপনি দেখেছেন।

তিনি বললেন, তাহলে সবটুকু খাদ্য কুকুরকে খাইয়ে দিলে যে? নিজে খেলে না কেন?

গোলাম আরয করল, এখানে কোনো কুকুর থাকে না। মনে হয় এ কুকুরটি মুসাফির। দূর থেকে এসেছিল এবং ক্ষুধার্ত ছিল। আমার কাছে তার ক্ষুধার্ত থাকা এবং নিজের পেট ভরে খাওয়া ভালো মনে হয়নি।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখন সারাদিন কী খাবে?

সে বলল, উপবাস করব। আবদুল্লাহ ভাবলেন, আমি তাকে দানশীলতার জন্য তিরস্কার করছি। সে তো আমার চেয়েও অধিক দাতা। এরপর তিনি সেই বাগান, গোলাম এবং সেখানকার সমস্ত কিছু কিনে নিয়ে গোলামকে মুক্ত করে বাগানটি তাকে দিয়ে দিলেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৪২১)

হযরত উমর (রা) বলেন, এক সাহাবীর নিকট কেউ একটি পশুর মাথা হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছিল। তিনি ধারণা করলেন, আমার তুলনায় অমুক ভাই এটি পাওয়ার বেশি হকদার। কাজেই তিনি মাথাটি তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনিও একই ধারণা করে তৃতীয় একজনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে মাথাটি সাত ঘর ঘুরে অবশেষে প্রথম ব্যক্তির হাতে পৌঁছে গেল। সুবহানাল্লাহ, কী অপূর্ব আত্মত্যাগ! (মুসতাদরাকে হাকেম : ২ : ১৮৪, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৩২০৪)

বর্ণিত আছে, যে রাতে আলী (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিছানায় শুয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) মদীনায় হিজরত করেছিলেন, সে রাতে আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল ও মীকাঈলকে বললেন, আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি এবং একজনের বয়স অপরজনের চেয়ে বেশি করেছি। এখন বলো তো, তোমাদের মধ্যে কে কম হায়াত চায় এবং অপরের জন্য অধিক হায়াত ভালোবাসে? কিন্তু উভয়েই নিজের হায়াত বেশি হওয়াই কামনা করলেন। অর্থাৎ, আত্মত্যাগের বিষয়টি কেউ পছন্দ করলেন না। ইরশাদ হলো, তোমরা উভয়েই কি আলীর ন্যায় হতে

পারলে না? আমি তার ও আমার হাবীব মুহাম্মদ (স)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছি। আজ রাতে আলী মুহাম্মদ (স)-এর বিছানায় তাঁর জীবনের বিনিময়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছে এবং তাঁর জীবিত থাকাকে নিজের জীবিত থাকার ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। এখন তোমরা দুনিয়ায় যাও এবং শত্রুদের কবল থেকে আলীকে রক্ষা করো। এরপর নির্দেশ অনুযায়ী জিবরাঈল তাঁর মাথার কাছে এবং মীকাঈল পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। জিবরাঈল বললেন, বাহ্ বাহ্ হে আবু তালিবের পুত্র! আজ তোমার মতো কেউ নয়। আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব প্রকাশ করেন। এরপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়,

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ ۢبِالْعِبَادِ.

এবং লোকদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্ম-বিক্রয় করে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা বাকারা : ২০৭; তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৫০, তাফসিরে সালাবি : ২ : ১২৫)

আবুল হাসান আন্তাকির কাছে রায় শহরের নিকটের এক গ্রাম থেকে কিছু লোক আসলেন। ত্রিশের চেয়ে বেশি হবে তাদের সংখ্যা। কিন্তু তাদের কাছে ছিলো হাতে গোনা কয়েকটি রুটি। যা ছিলো তাদের সবার জন্য অপ্রতুল। তখন তারা বুদ্ধি বের করলো। রুটিগুলো টুকরো করে ছিড়ে বাটিতে রাখা হবে। তারপর বাতি নিভিয়ে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ পরে যখন বাতি জ্বালানো হলো দেখা গেলো আগের মতোই রুটিগুলো বাটিতে পড়ে আছে। 'আমি খেলে অন্যজনের কম পড়ে যাবে' এই ভেবে কেউই পেয়ালার দিকে হাত বাড়ায়নি। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৪৮)

শুবা (র)-এর কাছে কোনো এক ব্যক্তি এসে কিছু চাইলো। তখন শুবার হাত ছিলো একদম খালি। তিনি ঘরের কড়ি বর্গার একটা আড়া খুলে লোকটার হাতে ধরিয়ে দিলেন এবং এর চেয়ে বেশি কিছু না দিতে পারার কারণে দুঃখ প্রকাশ করলেন। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৪৮)

হুযাইফা আদভী (র) বলেন, ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় আমি সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গেলাম। আমি আমার চাচাত ভাইকে সন্ধান করছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল যদি তার মধ্যে কিছু নিঃশ্বাস বাকি থাকে, তাহলে তাকে পানি পান করিয়ে দেব। তাই সামান্য পরিমাণ পানি সাথে নিয়ে

গেলাম। যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে জীবিতাবস্থায় পেলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পানি দেব? সে ইশারায় সম্মতি প্রকাশ করল। যখন আমি পানি পান করাতে চাইলাম, তখন পাশ থেকে একজনের "আহ্" শব্দ শুনতে পেলাম। আমার চাচাত ভাই ইশারা করল, প্রথমে তাকে পান করাও। আমি সেখানে গিয়ে দেখলাম, হিশাম ইবনে আসা কাতরাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পানি দেব? ঠিক সেই মুহূর্তে অপর একজনের "আহ্" শব্দ শোনা গেল। হিশাম ইশারা করল আগে তার কাছে নিয়ে যাও। আমি সেখানে গিয়ে দেখি লোকটি ইন্তেকাল করেছে। আমি সেখান থেকে আবার হিশামের নিকট এলাম। তখন সে-ও ইন্তেকাল করেছিল। এরপর আমি আমার চাচাত ভাইয়ের নিকট এসে তাকেও জীবিত পেলাম না। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলের প্রতি রহম করুন! (কিতাবুয যুহদ, ইবনুল মুবারক : ৫২৫, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৩২০৮, তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৪৮)

আব্বাস ইবনে দাহকান বলেন, বিশর ইবনে হারিছই এমন ব্যক্তি, যে জগতে যেভাবে এসেছে, সেভাবেই চলে গেছে। তার মৃত্যুকালে এক লোক এসে কিছু চাইলে তিনি নিজের জামা খুলে তাকে দিয়ে দেন। এরপর তিনি অন্য এক জনের কাছ থেকে একটি কাপড় চেয়ে নেন এবং তাতেই মৃত্যুবরণ করেন। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৫১)

জনৈক সুফি ব্যক্তি বলেন, আমরা কয়েকজন সমমনা মানুষ তুরতুসে অবস্থান করছিলাম। একদিন আমরা ঠিক করলাম, এভাবে এক জায়গায় বসে না থেকে আমরা বাবে জিহাদে চলে যাবো। পরদিন আমরা বাবে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়লাম। আমাদের অনুসরণ করে একটা কুকুরও আসছিলো পিছু পিছু। দীর্ঘ অনাহারে দেহ হাড্ডিসার হয়ে আছে কুকুরটার। আমরা বাবে জিহাদে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, পথের মাঝখানে মৃত একটা গাধা পড়ে আছে। আমরা মৃত গাধাটাকে পাশ কাটিয়ে উঁচু এক জায়গায় গিয়ে বসলাম। ইতোমধ্যে কুকুরটার চোখও পড়েছে মৃত গাধাটার ওপর। কিন্তু কুকুরটা গাধাটার কাছে গেলো না। ছুটতে শুরু করলো শহরের দিকে। আমরা উঁচুতে বসে অবাক হয়ে কুকুরটার কাণ্ড কারখানা দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পরে কুকুরটা ফিরে এলো। তবে একা নয়, সাথে আরও বিশ পচিশটা কুকুর নিয়ে। মৃত গাধাটাকে দেখে কুকুরগুলো ঝাপিয়ে পড়ে খেতে শুরু করলো। কিন্তু এদের পথ

দেখিয়ে নিয়ে আসা কুকুরটা দূরে দাঁড়িয়ে রইলো। কাছে এসে সবার সাথে আহারে লিপ্ত হলো না। এক সময় সবকুকুরের পেট ভরে গেলো। মৃত গাধার বিক্ষিপ্ত কিছু হাড় এদিক সেদিক ছড়িয়ে রেখে শহরের দিকে চলতে শুরু করলো। তখন প্রথম কুকুরটা উঠে দাঁড়ালো। এদিক সেদিক ছড়িয়ে থাকা হাড্ডিগুলোর সাথে সামান্য যা কিছু লেগে ছিলো তাই দিয়ে ক্ষুধা নিবারণ করলো। তারপর হাঁটতে শুরু করলো শহরের দিকে। (তাহযিবুল আসরার, খুরকুশি : ৪৫৪)

সালাফে সালেহিন ও আউলিয়ায়ে কেরামের এমন অনেক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে 'দারিদ্র্য ও দুনিয়া বিমুখতা' অধ্যায়ে, সেগুলো এখানে আর পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আল্লাহই সকল কাজের তাওফিক দাতা।

দানশীলতা ও কৃপণতার কারণ

দলিল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, কৃপণতা ধ্বংসকারী বিষয়সমূহের অন্যতম। কিন্তু মানুষ কিসে কৃপণ বলে গণ্য হয় এবং কৃপণতা কাকে বলে, তা আপেক্ষিক বিষয়। কেননা, সকল মানুষই নিজ অভিমত অনুযায়ী নিজেকে দাতা ভাবে। অথচ অপরের দৃষ্টিতে সে বড় কৃপণ। অথবা এক লোক কোনো কাজ করলে তাতে নানারকম মন্তব্য করে কেউ বলে, এটা কৃপণতা, আবার কেউ বলে, এটা কৃপণতা নয়। এছাড়া কোনো মানুষের মন ধনসম্পদের লালসা থেকে মুক্ত নয়। এই লালসার কারণে সে ধন-সম্পদের প্রতি যত্নশীল থাকে এবং তা আবদ্ধ রাখে। যদি আবদ্ধ রাখার কারণেই কেউ কৃপণ হয়ে যায়, তাহলে এ থেকে কেউ খালি নয়। অপরদিকে যদি আটকে রাখার ফলে কৃপণ না হয়, তবে কৃপণতার অর্থ কী? আবদ্ধ রাখার নামই কৃপণতা। এর কোন কোন অবস্থা সর্বনাশা? যে দানশীলতার কারণে মানুষ দাতা হয় এবং সওয়াব পায়, তার পরিচিতি কী?

এসব প্রশ্নের জবাবে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ কেউ বলেন, ওয়াজিব হক আদায় না করাকে বলা হয় কৃপণতা। যে লোক তার যিম্মায় যে সকল ওয়াজিব রয়েছে, সেগুলো দিতে থাকে, সে কৃপণ নয়। কিন্তু এটি যথাযথ পরিচিতি নয়। কেননা, যে ব্যক্তি কসাইয়ের নিকট থেকে গোশত ক্রয় করে মেহমানের ভয়ে তা কিছু কম দামে ফিরিয়ে দেয়, সকলের মতেই সে

কৃপণ। এমনিভাবে যে তার পরিবারবর্গকে নির্ধারিত হারে ভরণপোষণ দেয়, যদি কেউ এক লোকমাও বেশি চায় অথবা তার সম্পদ থেকে অল্প পরিমাণ বস্তু খেয়ে নেয়, তবে তা দিতে অস্বীকার করে, সে-ও কৃপণ বলেই গণ্য হয়। এমনিভাবে যদি কেউ রুটি খায় এবং অন্য কেউ সেখানে আসার পর রুটিতে শরীক হয়ে যাবে ভেবে রুটি লুকিয়ে রাখে, সে কৃপণ নয়তো কী? অথচ এই তিনটি ক্ষেত্রের কেউ এমন নয় যে, সে ওয়াজিব হক আদায় করেনি।

অনেকেই বলেন, দান করাকে যে লোক ভারি মনে করে, সে-ই কৃপণ। এ পরিচিতিটাও যথার্থ নয়। কেননা, এর উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, সকল প্রকার দান তার নিকট কঠিন, তাহলে অনেক কৃপণ এমন রয়েছে, যারা অল্প দান করাকে ক্ষতি মনে করে না; বরং ভালো মনে করে। তারা এক-দুই পয়সা দিয়ে দেয়। বেশি পরিমাণে দেওয়া অবশ্য তাদের জন্য কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, কোনো কোনো দান কঠিন হয়, তাহলে এটা দাতার মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে। যেমন সমস্ত সম্পদ অথবা অধিকাংশ সম্পদ দান করা কঠিন মনে হয়; তবে সে কৃপণ নয়।

কারও মতে নিঃসঙ্কোচে অন্যের অভাব পূরণ করার নাম দানশীলতা। কেউ বলেন, সওয়ালকারীকে দেখে আনন্দিত হওয়া এবং দেওয়ার কারণে খুশি হওয়ার নাম দানশীলতা। কিছু লোক বলেন, দানশীলতা হচ্ছে চাওয়া ছাড়া কাউকে কিছু দেওয়া এবং যা দেওয়া হয়, তা অল্প জ্ঞান করা। কেউ বলেন, এরকম মনে করে সম্পদ দেওয়া যে, ধনও আল্লাহর এবং বান্দাও তাঁরই। কাজেই আল্লাহর সম্পদ আল্লাহর বান্দার কাছেই যাচ্ছে। এতে দরিদ্রতা ও রিক্ততার ভয় কীসের? এরূপ মনে করে দান করার নাম দানশীলতা। অনেকের অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি কিছু অর্থ দান করে দেয় এবং কিছু নিজের জন্য রেখে দেয়, সে দানশীল। আর যে নিজে কষ্ট করে এবং অন্যের আশা পূরণ করে, সে আত্মত্যাগী। অপরদিকে যে কিছুই দান করে না, সে কৃপণ।

কৃপণতা ও দানশীলতা সম্পর্কে বর্ণিত এতগুলো উক্তি দ্বারা এ দুটি বিষয়ের স্বরূপ পরিস্ফুট হয় না। তাই আমরা বিষয়টি বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করছি।

প্রকৃতপক্ষে ধনসম্পদ একটি রহস্য ও উদ্দেশ্যের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তা হচ্ছে মানুষের চাহিদাকে সঠিক পথে রাখার জন্য ধনসম্পদের ব্যবহার। ধনসম্পদ যেখানে খরচ করা উচিত, সেখানে খরচ করতে বিরত থাকা কিংবা

যেটা খরচের খাত নয়, সেখানে খরচ করা উভয়টিই সম্ভব। এতদুভয়ের মধ্যস্থলে এও অসম্ভব নয় যে, যেখানে খরচ না করা জরুরি, সেখানে খরচ করা থেকে বিরত থাকা এবং যেখানে খরচ করা জরুরি সেখানে খরচ করা। দেখা যাচ্ছে জরুরি জায়গায় খরচ না করে সম্পদ আটকে রাখার নাম কৃপণতা এবং যেখানে আটকে রাখা জরুরি, সেখানে খরচ করা হচ্ছে অপচয়। এতদুভয়ের মাঝখানে খরচ করা এবং আবদ্ধ রাখা ভালো। এই মধ্যবর্তী স্তরের নাম দানশীলতা হওয়া উচিত। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স)-কে শুধু দান করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এরপর ইরশাদ হলো,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَ لَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ.

কৃপণতাবশত আপনি আপনার হাত আপনার ঘাড়ের সাথে বেঁধে রাখবেন না এবং (অপব্যয়ী হয়ে) তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করবেন না। (সূরা বনি ইসরাঈল : ২৯)

আরও ইরশাদ হলো,

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا.

এবং যখন তারা ব্যয় করে, অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এদুয়ের মাঝে মধ্যপন্থায়। (সূরা ফুরকান : ৬৭)

এ আয়াত থেকে বুঝতে পারলাম, খরচ করা ও আবদ্ধ রাখাকে ওয়াজিব ও আবশ্যকীয় পরিমাণের মধ্যে সীমিত রাখা দানশীলতা। এ কর্মটি শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারাই সম্পাদিত হবে। অন্তরের কোনো অংশগ্রহণ থাকবে না। এমন হলে এর প্রকৃত অর্থ ব্যবহৃত হবে। কাজেই যদি যথাস্থানে ব্যয় করে; কিন্তু মন তাতে সন্তুষ্ট না থাকে এবং সে অসন্তুষ্টির মুখে ধৈর্যধারণ করে, এমন ব্যক্তিকে দানশীল বলা হবে না; বরং দানশীল হওয়ার প্রচেষ্টাকারী বলা হবে। এ বিষয়টি কোন ওয়াজিব ব্যয়, তা পরিচয় লাভ করার ওপর নির্ভরশীল। মনে রাখতে হবে যে, ওয়াজিব ব্যয় দু' ধরনের। এক, শরীয়তের হুকুমে যা ওয়াজিব। যেমন— যাকাত দেওয়ার জন্য ব্যয় করা। দুই, যা আভিজাত্য ও অভ্যাসের দিকে লক্ষ করে আবশ্যক। যদি এতদুভয়ের মধ্য থেকে কোনো একটিতে ত্রুটি করে, তবে সে হবে কৃপণ। কিন্তু যে শরীয়তের ওয়াজিব আদায় করে না, সে হবে অনেক বেশি কৃপণ। যেমন কেউ ধনসম্পদের যাকাত আদায় করে না অথবা নিজের পরিবারকে প্রয়োজনীয়

ভরণপোষণ দেয় না, তাকে কৃপণই মনে করতে হবে। কিংবা সম্পদ দেওয়ার সময় কেউ বেছে বেছে মন্দটি দেয়। এটাও এক প্রকার কৃপণতাই। ভদ্রতার কারণে যে ব্যয় জরুরি, তা হলো অল্প বিষয়ে সংকোচননীতি অবলম্বন করা। এটি অত্যন্ত খারাপ কথা। এটা অবস্থা ও ব্যক্তিভেদে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। যেমন কিছু বিষয়ে ধনী ব্যক্তির সংকোচননীতি খারাপ মনে হয়, তবে ফকীরের ক্ষেত্রে নয়। কিংবা পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের সাথে সংকোচননীতি অবলম্বন করা খারাপ মনে হয়— বেগানাদের সাথে খারাপ মনে হয় না। প্রতিবেশীর সাথে সংকোচননীতি দূরবর্তীদের তুলনায় খারাপ মনে হয়। এমনিভাবে অতিথি সেবায় সংকোচননীতি বেচাকেনা ও অন্যান্য কাজ-কারবারের চেয়ে খারাপ লাগে।

সুতরাং কৃপণ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে সম্পদ এমন জায়গায় ব্যয় করা থেকে আবদ্ধ রাখে, যেখানে শরীয়তের নির্দেশে অথবা ভদ্রতার দাবির কারণে আবদ্ধ রাখা ঠিক নয়।

কৃপণতার আরেকটি পরিচয় হলো, নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করে রাখা। যে উদ্দেশ্যটা হবে সম্পদ সংরক্ষণের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই যে যাকাত দিতে চায় না, ঠিক মতো পরিবারের ভরণপোষণ দেয় না, সে হলো কৃপণ। অন্যদিকে সম্পদের চেয়ে ভদ্রতাবোধের গুরুত্ব অনেক বেশি। কাজেই যে এমন সব ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা দেখায়, যেখানে কৃচ্ছতা দেখানোর কোনো মানেই হয় না। তাহলে তার ভদ্রতাবোধ বলতে কিছুই বাকি থাকবে না এবং সে কৃপণ বলে গণ্য হবে।

কৃপণতার অন্য একটি স্তর

কখনো কখনো পৃথিবীতে এমন মানুষও দেখা যায়, যে শরিয়তের সম্পদের সাথে সম্পর্কিত ওয়াজিব কর্মসমূহ পালন করে, ভদ্রতাবোধের সীমারেখা মেনে চলে। কিন্তু তার সমস্যা হলো, সে সম্পদ জমিয়ে রাখে। প্রয়োজনে পড়ে কেউ কিছু চাইলে তার কাছ থেকে পায় না।

সে জামানার দুর্যোগ মোকাবেলা ও আখেরাতে উচ্চমর্যাদা পাওয়ার লক্ষ্যে সম্পদ জমিয়ে রাখে। এই উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করে রাখার হুকুম মানুষের দেখার চোখের কারণে পাল্টায়। যেমন, যারা বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, তাদের কাছে এই উদ্দেশ্যকে কৃপণতার মাধ্যম বলেই মনে হবে।

অন্যদিকে সাধারণ মানুষ যারা, তাদের কাছে এসবকিছু ভালো কাজ বলেই মনে হবে। কারণ, তাদের দেখার চোখ পৃথিবীর দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। স্থুল চোখে তারা সবকিছু দেখে। তাই দুনিয়ার দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সম্পদ জমা করে রাখা তাদের কাছে গুরুত্ববহ বলে মনে হয়। তবে কোনো ব্যক্তি যখন নিরুপায় হয়ে এমন ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাইতে যায় এবং সে বলে দেয়, আমি শরিয়ত নির্ধারিত ওয়াজিব যাকাত দিয়ে দিয়েছি। এখন অন্য কাউকে দানখয়রাত করতে আমি বাধ্য নই, এমন ব্যক্তি সবার চোখেই মন্দ ও কৃপণ বলেই সাব্যস্ত হবে। তবে এ ক্ষেত্রে মন্দত্বের পরিমাণ নির্ধারিত হবে তার কাছে থাকা সম্পদের পরিমাণ, সাহায্যপ্রার্থীর সাহায্যের আবশ্যকীয়তা, তার দান করার সক্ষমতা, দীনদারী ও সাহায্য প্রার্থীর অধিকারের ওপর ভিত্তি করে।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি শরিয়ত নির্ধারিত ওয়াজিব, যথাযোগ্য ভদ্রতাবোধের দিকে দৃষ্টি রেখে চলে, সে কৃপণতার চৌহর্দি থেকে বের হয়ে যাবে। তবে হ্যা, মানুষকে ততক্ষণ পর্যন্ত দানশীল বলা যাবে না, যতক্ষণ না সে মর্যাদা লাভ ও সম্মান অর্জনের উদ্দেশ্যে ওয়াজিব ও ভদ্রতাবোধের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অধিক দান করবে। যখন ব্যক্তির মন সম্পদ দানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং সে শরিয়তের বাধ্যবাধকতার কারণে দানের হাত বাড়ায় না এবং দান করার পর তার মনে অনুশোচনা আসে না, তবে সে তার সামর্থ্যের স্থান থেকে দানশীল বলে গণ্য হবে।

বদান্যতা হলো, স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব ও মানবতাবোধের কারণে সম্পদ দান করে অন্যকে সহায়তা করা। তবে শর্ত হলো, দান করার ক্ষেত্রে দাতার মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিতে হবে। তার দান হবে কারও সেবা, পুরস্কার, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয় থেকে মুক্ত। এসব নিয়তে কেউ দান করলে তাকে ফেরিওয়ালা বলা যেতে পারে; দানশীল নয়। কারণ, সম্পদ বিলিয়ে সে প্রশংসা কিনছে। আর অন্যের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার স্বাদ অতুলনীয়। আর দাতার মনে দান করার সময় এই উদ্দেশ্যই থাকে।

পক্ষান্তরে বদান্যতা হলো, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে দান করা। আর এটা হলো দানশীলতার শব্দগত নিগূঢ় অর্থ। আর এই অর্থের বাস্তবায়ন একমাত্র আল্লাহ তাআলার থেকেই পাওয়ার আশা করা যেতে পারে।

অন্যদিকে মানুষের ক্ষেত্রে দানশীলতা শব্দ ব্যবহার করা হয় রূপক অর্থে। কারণ, দান করার পেছনে মানুষের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকেই। কিন্তু দান করে তার উদ্দেশ্য যদি হয় আখেরাতের সাওয়াব লাভ, দানের ফযিলত অর্জন ও কৃপণতার জঞ্জাল থেকে আত্মমুক্তি লাভ, তবে এসব ক্ষেত্রে তাকে দানশীল বলা যাবে। কিন্তু কেউ যদি নিন্দার ভয়, মানুষের কটু কথা, কিংবা দান করে যদি সে কোনো উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়, এসবকিছুর কোনোটাকেই বদান্যতা বলা যাবে না। কারণ, এসব উদ্দেশ্যের হাতে সে জিম্মি। এ কারণেই সে দান করতে বাধ্য হয়েছে। এক্ষেত্রে তাকে পণ্য বিক্রেতা বলা যায়; দানশীল নয়।

কোনো এক আবেদা মহিলা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার হান্নান ইবনে হেলালের কাছে আসলেন। হান্নান তখন সঙ্গীদের সঙ্গে বসে ছিলেন।

আবেদা : আমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে। তোমাদের কেউ কি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে?

সঙ্গীরা হান্নান ইবনে হেলালের দিকে ইশারা করে বললো, তোমার যা কিছু প্রশ্ন তাকে করো। তিনি তোমার সব প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

আবেদা : তোমাদের কাছে দানশীলতার অর্থ কী?

হান্নান : অন্যকে দান করা। সহায়তা করা এবং নিজের ওপর তাকে প্রাধান্য দেওয়া।

আবেদা : এতো দুনিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দানশীলতার ব্যাখ্যা। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ কী?

হান্নান : অন্তরে কোনোরূপ অপছন্দ কিংবা মনে কোনো ঘৃণাবোধ না রেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করা।

আবেদা : তোমরা কি আল্লাহর ইবাদতের বিনিময়ে কিছু কামনা করো?

হান্নান ও তার সঙ্গীরা : হ্যাঁ করি।

আবেদা : কেন কামনা করো?

তারা বলল, কারণ আল্লাহ তাআলা একটি পুণ্যকর্মের বিনিময়ে দশটি নেকি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আবেদা : সুবহানাল্লাহ! তোমরা একটা পুণ্য করে দশটা সওয়াব লাভ করার আশায় বসে আছো। তাহলে তোমার বদান্যতা কী করে হলো?

তারা বলল, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনার কাছে তাহলে বদান্যতার পরিচয় কী?

আবেদা : আমার কাছে বদান্যতা হলো, আল্লাহর আনুগত্যের স্বাদ মনে উপলব্ধি করে, মনে মনে অপছন্দবোধ না রেখে আল্লাহর ইবাদত করার নাম হলো বদান্যতা। আল্লাহর ইবাদত দ্বারা তোমাদের মনে কোনো কিছু লাভের অভিপ্রায় থাকবে না। তোমাদের নিয়ত থাকবে এমন, আমার ইবাদত আমি করে যাই, পরবর্তীতে আল্লাহ আমার জন্য যে ফায়সালা দেন তাই মেনে নেবো।

আরে বোকার দল! তোমরা যে আল্লাহর ইবাদতের বিনিময়ে সাওয়াব চাও তা আল্লাহ জেনে যাচ্ছেন, প্রতি মুহূর্তে এই ভেবেও কি তোমাদের লজ্জা করে না? দুনিয়ার হিসেবে এটা খুবই মন্দ কর্ম!

অন্য এক আবেদা মহিলা বলেন, তোমরা কি মনে করো, দীনার-দিরহাম, টাকা পয়সা দান করেই শুধু দানশীল হওয়া যায়? জানতে চাওয়া হলো, তাহলে কিসে রয়েছে দানশীলতা? আবেদা বললো, এই যে এখানে, আমার হৃদয়ের গভীরে দানশীলতার নিবাস।

মুহাসাবি (র) বলেন, দীনের ক্ষেত্রে দানশীলতার অর্থ হলো, নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দেওয়া। তোমার অন্তর স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের সবকিছু দান করে দেবে। এর জন্য তার সামান্য মন খারাপও হবে না। এর বিনিময়ে সে তাৎক্ষণিক কিংবা পরবর্তীতে কোনো প্রতিদানের আশায় থাকবে না। যদি তার প্রতিদানের জরুরত হয়ে থাকে তবুও না। তবে পূর্ণ দানশীলতার অর্থ হলো, আল্লাহর হাতে সব কর্তৃত্ব দিয়ে দেওয়া এবং মনে এই আশা রাখা যে, তুমি নিজের সাথে যতটা না ভালো আচরণ করতে, তার চেয়ে অনেক কল্যাণ তোমাকে আল্লাহ দান করবেন।

কৃপণতার প্রতিকার

আগেই বলা হয়েছে, কৃপণতার কারণ হচ্ছে ধনসম্পদের ভালোবাসা। সুতরাং এখন জানতে হবে যে, ধনসম্পদের ভালোবাসার কারণ কী। প্রথম কারণ খাহেশাত। ধনসম্পদ ছাড়া এটা হাসিল করা যায় না। এতে অনেক দিন বেঁচে থাকার আশাও থাকে। কেননা, মানুষ যদি জানতে পারে, সে আগামীকাল মারা যাবে, তাহলে ধনসম্পদের মায়া করা বা কৃপণতা না

করার সম্ভাবনাই বেশি। যে পরিমাণ ধনসম্পদ মানুষের একদিন, একরাত অথবা এক বছরের জন্য যথেষ্ট, তা স্বল্প পরিমাণই বটে। এর বেশি সম্পদ রাখার কোনো অর্থ নেই। মাঝে মধ্যে বেশি আশা এভাবে হয় যে, নিজের জীবনের আশা তো বেশি হয় না, কিন্তু সন্তানদের রিযিকের ভাবনা যত বেশি করে, কৃপণতাও ততই মযবুত হয়। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সন্তান হলো কৃপণতা, কাপুরুষতা ও অজ্ঞতার স্থান। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৬৬৬, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১১ : ১৪০, আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২৪ : ২৪১, মুসতাদরাকে হাকেম : ৩ : ২৯৬)

তবে সন্তানপ্রীতির সাথে যদি দারিদ্র্যের ভয় এবং রিযিক প্রাপ্তির বিশ্বাস মনে না জন্মে তখন ব্যক্তির কৃপণতা অনেক বেড়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণ, ধনসম্পদকেই ভালো মনে হওয়া। যেমন কোনো কোনো লোকের নিকট এত বেশি ধনসম্পদ থাকে যে, নিজের নিয়মানুযায়ী খরচ করলে সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হয় এবং হাজারো প্রাণ বেঁচে থাকে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেও বৃদ্ধ ও নিঃসন্তান হয়। কিন্তু তারপরও যাকাত দিতে মন চায় না। নিজে অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য খরচ করাও ভালো মনে করে না। কারণ, সে টাকাপয়সার প্রেমিক। টাকাপয়সা হাতে থাকাটা তার নিকট অত্যন্ত আরামদায়ক মনে করে। সেজন্য একে মাটিতে পুঁতে রাখে। অথচ এ কথা তার অজানা নয়, মৃত্যুর পর এই ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে কিংবা দুশমনের হাতে চলে যাবে।

অন্তরের এ রোগটির প্রতিকার করা খুব কঠিন। বিশেষত বার্ধক্যে তো এটা দুরারোগ্যই বটে। এ রোগীর উপমা এমন, যেমন কেউ কারও প্রেমে পড়ে এবং তার সাথে তার দূতকেও মহব্বত করতে থাকে। এরপর দূতের মহব্বতে এমন মশগুল হয়ে পড়ে যে, মূল প্রেমিককেই ভুলে যায়। টাকা-পয়সাও অভাব-অনটনের দূত। এর কারণে অভাব-অনটন সৃষ্টি হয়। তাই টাকাপয়সা খুবই প্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু কোনো কোনো সময় অভাব-অনটনের প্রতি লক্ষও থাকে না; শুধু টাকাপয়সাকেই বেশি পছন্দ করে।

কাজেই খাহেশাতের চিকিৎসা হলো, অল্পেতুষ্ট থাকা এবং ধৈর্যধারণ করা। আর দীর্ঘ জীবনের আশার প্রতিকার হচ্ছে, সর্বক্ষণ মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং সমসাময়িকদের মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করা যে, তারা কেমন দুঃখ-কষ্ট

স্বীকার করে এবং বিপদাপদ সহ্য করে টাকাকড়ি জমা করেছে, কিন্তু শেষে খালি হাতে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। যদি সন্তানসন্ততির ভাবনা অন্তরে থাকে, তবে চিন্তা করবে যে, আল্লাহ সন্তান দিয়েছেন, তিনি তার রিযিকও দিয়েছেন। অনেক সন্তানের নিকট পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি কিছুই থাকে না। কিন্তু তারা পিতা-মাতার নিকট থেকে সম্পত্তিপ্রাপ্ত সন্তানদের চেয়ে অনেক বেশি সচ্ছল হয়ে থাকে। আর এটাও জানা কথা যে, সন্তানদের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের পিছনে নিয়ত এটাই থাকে যে, তাদের অবস্থা ভালো থাকুক। কিন্তু কখনো এর বিপরীত অবস্থা আত্মপ্রকাশ করে। সন্তান যদি সৎকর্মপরায়ণ হয়, তবে তার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট। আর যদি পাপাচারী হয়, তবে ত্যাজ্য সম্পত্তি যা পাবে, তা গুনাহের কাজে উড়িয়ে দিবে এবং এর শাস্তি পিতাকেও ভোগ করতে হবে।

কৃপণতার এও এক প্রতিকার যে, কৃপণতার নিন্দা করে ও দানশীলতার প্রশংসা সংবলিত যেসব হাদীস বর্ণিত রয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা কৃপণ ব্যক্তির জন্য যেসব কঠোর আযাবের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আরও একটি কার্যকরী চিকিৎসা হচ্ছে, কৃপণদের অবস্থা চিন্তা করবে এবং তাদেরকে ঘৃণা করবে। এমন কোনো কৃপণ নেই, যে অপরের কৃপণতাকে মন্দ মনে না করে। সুতরাং চিন্তা করবে যে, যদি আমি কার্পণ্য করি, তাহলে অপরের দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হবো। আমার নিকট যেমন অন্য কৃপণ তুচ্ছ।

আরও একটি প্রতিকার এই যে, ধনসম্পদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে চিন্তা করবে, এটা সৃষ্টি করার কারণ কী? যখন জানা যাবে, ধনসম্পদ কেবল অভাব-অনটন লাঘবের জন্য সৃষ্টি হয়েছে, তখন যেটুকু অভাব পূরণে যথেষ্ট, সে পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট ধনসম্পদ পরকালের জন্য সঞ্চয় করবে। মানুষ বুদ্ধির জোরে যখন জানবে যে, ব্যয় করা আবদ্ধ রাখার তুলনায় দুনিয়া ও পরকালে মঙ্গলজনক, তখন সে ব্যয় করার প্রতি আগ্রহী হবে। কিন্তু এটা খেয়াল রাখবে যে, ব্যয় করার চিন্তাভাবনা অন্তরে আসার সাথে সাথে দেরি না করে তা বাস্তবায়ন করবে— গড়িমসি করবে না। কেননা, শয়তান সর্বদা দরিদ্রতার ভয় দেখায় এবং ব্যয় করতে নিষেধ করে। বর্ণিত আছে, আবুল হাসান বুশঞ্জী (র) একদিন টয়লেটে গেলেন, এমন সময় এক

শিষ্যকে ডেকে বললেন, আমার জামাটি শরীর থেকে খুলে অমুক ব্যক্তিকে দান করে দাও। শাগরিদ বললো, আপনি টয়লেট থেকে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না? তিনি বললেন, এই মুহূর্তে জামা দিয়ে দেওয়ার কথা মনে পড়েছে। আমি নফসের পক্ষ থেকে আশঙ্কা করি যে, সে এই ভাবনা বদলে দেবে। তাই দেরি না করে কল্পনাটি কার্যকর করলাম। (আর রিসালাতুল কুশায়রিয়্যাহ : ৪২০)

কৃপণতার অভ্যাসটি তখনই দূর হতে পারে, যখন মনের ওপর জোর দিয়ে খরচ করার অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। যেমন— প্রেমাস্পদ সম্মুখে থাকা পর্যন্ত প্রেম দূর হয় না। হ্যাঁ, যদি প্রেমাস্পদ থেকে আলাদা হওয়া যায় এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত মনের ওপর জোর দিয়ে বিরহে ধৈর্যধারণ করা হয়, তবে ক্রমান্বয়ে অন্তর স্থির ও শান্ত হয়ে ওঠে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কৃপণতার প্রতিবিধান করতে চায়, তার উচিত, ধনসম্পদ থেকে মনের ওপর জোর দিয়ে পৃথক হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ধনসম্পদ খরচ করে ফেলা। বলার অপেক্ষা রাখে না, যত্ন করে রেখে দেওয়ার চেয়ে ধনসম্পদ পানিতে নিক্ষেপ করা ভালো (দানখয়রাত করা)।

কৃপণতা থেকে নিজেকে বাঁচানোর আরেকটি উত্তম চিকিৎসা রয়েছে। তা হচ্ছে নফসকে এই বলে ধোঁকা দেওয়া যে, লেনদেন করলে তো দান করাও হবে এবং দাতা বলে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। এভাবে প্রথমে লোক দেখানোর ইচ্ছায় ব্যয় করবে। এতে অবশ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্পণ্য দূর হয়ে রিয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে চিকিৎসার মাধ্যমে রিয়া নামক ব্যাধিও দূর করে নিতে হবে। মোটকথা, ধনসম্পদ খতম হওয়ার পর নাম ও সুখ্যাতি মানুষের সান্ত্বনার বিষয়। যেমন— দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ ছাড়ানোর সময় পাখি ইত্যাদির সাথে খেলা জুড়ে দেওয়া হয়, যেন সে দুধের কথা ভুলে থাকে। এখানে এই উদ্দেশ্য থাকে না যে, সারা জীবনই পাখি নিয়ে খেলা করবে। বরং যখন দুধের কথা ভুলে যায়, তখন এ খেলা থেকেও শিশুকে সরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু এই চিকিৎসা এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই উপকারী, যার মধ্যে রিয়ার তুলনায় কৃপণতা থাকে বেশি। এমতাবস্থায় যেন শক্তিশালী গুণটিকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল গুণ দ্বারা পাল্টে ফেলে। কিন্তু যদি রিয়া ও কৃপণতা উভয়টি সমান হয়, তবে এ চিকিৎসায় তার কোনো লাভ হবে না। এর পরীক্ষা এই যে, যদি লোকদেখানোর

উদ্দেশ্যে ব্যয় করা তার জন্য কঠিন মনে না হয়, তাহলে রিয়া গুণটি প্রবল বলে জানতে হবে। আর যদি লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করা তার নিকট কঠিন মনে হয়, তবে কৃপণতা অধিক বলে বুঝতে হবে।

রিয়া, কৃপণতা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাসগুলো যে একটি অপরটির দ্বারা দূর হয়ে যায়, এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, কবরে মৃত ব্যক্তির শরীরের সমস্ত অংশ পোকা হয়ে যায়। আবার এসব পোকা একে অপরকে খেয়ে বড় হয় এবং আস্তে আস্তে তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। একে অন্যকে খাওয়ার প্রক্রিয়ার এক সময় এদের মধ্যে দু'টি শক্তিশালী পোকা থেকে যায়। এরাও পরে পরস্পর যুদ্ধ করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে একটি প্রবল হয়ে অপরটিকে খেয়ে ফেলে। এরপর নিজেও ক্ষুধার্ত অবস্থায় মারা যায়। এমনিভাবে খারাপ অভ্যাসগুলোর মধ্যেও এটা সম্ভব যে, সবল স্বভাবটি দুর্বল স্বভাবকে খেয়ে ফেলবে এবং পরে একটিই থেকে যাবে। এর একটিকে শেষ করার উপায় হচ্ছে তার খোরাক বন্ধ করে দেওয়া। মন্দস্বভাবের খাদ্য বন্ধ করার অর্থ সেই স্বভাবের দাবি অনুযায়ী কাজ না করা। অর্থাৎ, কোনো মন্দ অভ্যাস যেসব কাজ করতে চায়, তা কখনো না করা। এভাবে তার খোরাক বন্ধ করে দিলে সেই স্বভাবটি দুর্বল হয়ে মারা যাবে। যেমন, কৃপণতার দাবি হচ্ছে সম্পদ আবদ্ধ রাখা এবং ব্যয় না করা। কেউ যখন এর বিপরীত কাজ করবে এবং মনের ওপর জোর দিয়ে বারবার খরচ করবে, তখন কৃপণতা মারা যাবে এবং খরচ করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

তাহলে বোঝা গেলো যে, জ্ঞান ও কর্ম এই দুটি বিষয় দ্বারা কৃপণতার প্রতিকার করা সম্ভব। আর তা এভাবে যে, ব্যক্তি কৃপণতার মন্দ দিক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করবে। কৃপণতার কারণে মানুষকে কী কী বিপদে পড়তে হয় তা জানবে। তারপর কৃপণতার ক্ষতি থেকে বাঁচতে মনের ওপর বল প্রয়োগ করে হলেও দান করবে। এভাবে এক সময় মন থেকে কৃপণতার স্বভাব দূর হয়ে যাবে। তবে কখনো কখনো কৃপণতা এতটাই বেড়ে যায় যে, মানুষকে দৃষ্টিহীন, শ্রবণ শক্তিহীন করে ফেলে। তখন তার পক্ষে কৃপণতার ক্ষতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা সম্ভব হয় না। আর যখন কৃপণতার ক্ষতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন দানের প্রতি ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। তখন তার মধ্যে কৃপণতা রোগের বিজ বপিত থেকেই যায়। এর উদাহরণ হলো কোনো দূরারোগ্য ব্যাধি।

চিকিৎসক যেখানে রোগের ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। কীভাবে সে ওষুধ দিয়ে রোগ নিরাময় করবে? তখন রোগীর পক্ষে দিন দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

কতক শায়খের অভ্যাস ছিলো যে, মুরিদদের মন থেকে কৃপণতার পঙ্কিলতা দূর করার জন্য তাদেরকে এক স্থানে থাকতে দিতেন না। কখনো যদি শায়খ কারো মধ্যে নিজ স্থানের প্রতি মুগ্ধতা লক্ষ করতেন তাহলে তিনি মুরিদের স্থান পরিবর্তন করে দিতেন এবং তার সম্পদ অন্যকে ব্যয় করতে দিতেন। মুরিদকে নতুন কোনো পোশাক কিংবা কোনো গালিচার প্রতি আকৃষ্ট দেখলে তা অন্যকে দিয়ে দিতে বলতেন এবং তাকে জীর্ণ পোশাক পরিয়ে দিতেন। এমন করতে করতে এক সময় তার মন থেকে দুনিয়ার প্রতি টান দূর হয়ে যায়।

আর এমন তরবিয়ত কেউ না পেলে তার মনে পার্থিবজীবনের প্রতি মুগ্ধতা থেকেই যায়। তার মনে বস্তুর প্রেম যেমন থাকে তেমনি ব্যক্তি প্রেমও থেকে যায়। তাই তার সমুদয় বস্তু যদি হারিয়ে যায় তাহলে বস্তুর প্রতি তার টান অনুযায়ী সে কষ্ট পায়। আর যদি তার প্রেমাস্পদের মৃত্যু ঘটে তখন সে যেনো বিপদের বেনো জলে হাবুডুবু খেতে শুরু করে।

কোনো এক বাদশাহকে বিভিন্ন মণিমুক্তা খচিত নিলকান্ত মণির একটা পেয়ালা উপহার দেওয়া হলো। পেয়ালাটা পেয়ে বাদশাহ খুব খুশি হলেন। বাদশাহ দরবারে উপবিষ্ট এক পণ্ডিতকে বললেন, পণ্ডিতজি! পেয়ালাটা আপনার কাছে কেমন লাগলো? পণ্ডিত বললেন, আমার কাছে এটাকে আপদ ও অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষিতা বলে মনে হচ্ছে। পণ্ডিতের উত্তর শুনে বাদশাহর চোখ কপালে উঠলো। সে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, কী বলছেন এটা? কী করে সম্ভব?

পণ্ডিত বললো, এতদিন আপনার কোনো চিন্তা ছিলো না। কোনো জিনিস হারানোর ভয় ছিলো না। কিন্তু আজ আপনার এই পেয়ালাটি ভালো লেগে গেলো। ধরুন, হাত থেকে পড়ে গিয়ে পেয়ালাটি ভেঙে গেলো। সাথে সাথে আপনার হৃদয়ও ভেঙে চৌচিড় হয়ে যাবে। আপনার উপর নেমে আসবে আপদ। কিংবা ধরুন, পেয়ালাটা চুরি হয়ে গেলো। তখন আপনাকে চোরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে। চোর ফেরত দিলে আপনি পেয়ালা ফেরত পাবেন। আবার ধরুন, ঘটনাক্রমে কোনো ব্যক্তির হাত

থেকে পেয়ালাটা পড়ে ভেঙে গেলো। তখন অবধারিতভাবে বেচারার উপর আপনার ক্রোধ নেমে আসবে।

এবার চিন্তা করে দেখুন, পেয়ালা কি আপনার জন্য রহমত নাকি আপনার বিপদে পড়ার কারণ হলো?

পণ্ডিতের কথা শুনে বাদশাহ এবার চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললো, হুম, মনে হচ্ছে পেয়ালা না পাওয়াই আমার জন্য মঙ্গলজনক ছিলো।

দুনিয়ার বিলাস সামগ্রী আসলে এমনই। পদে পদে তার জন্য ওঁত পেতে থাকে বিপদ। কারণ, যারা আল্লাহর শত্রু, দুনিয়া তাদেরও শত্রু। কেননা, দুনিয়ার বিপদাপদ তাদের থেকে বারবার ধৈর্যের পরীক্ষা নেয়। দুনিয়া আল্লাহর শত্রু। কারণ, দুনিয়া বান্দার মুখ আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। দুনিয়া মানব সত্তাকে খেয়ে ফেলে। এটা এভাবে যে, দুনিয়ার সম্পদ পাহারা দেওয়ার জন্য কোষাগার ও প্রহরীর দরকার হয়। কোষাগার ও প্রহরী রাখতে হলে সম্পদের জরুরত হয়। আর সম্পদ মানে হলো দীনার দিরহামের মতো কাচা টাকা। কাজেই এভাবে কুঁড়ে কুঁড়ে সম্পদ অর্জনে সে উৎসুক হয় না। পৃথিবীতে জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু সম্পদ সে উপার্জন করে। আর যে প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ নিজের কাছে রাখে, সে কখনো কৃপণ নয়। তাই সে অধিক সম্পদের পেছনে ছুটে নিজের সময় ব্যয় করে না। বরং তা হবে বহমান নদীর পানির মতো। যাকে কেউ নিজের বলে দাবি করে না এবং তা গ্রহণ কিংবা অন্যকে দানে কেউ কৃপণতা করে না।

ধনসম্পদ সম্পর্কে জরুরি নির্দেশনা

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ধনসম্পদ একদিক দিয়ে কল্যাণ এবং একদিক দিয়ে অনিষ্ট। এটা যেন সাপের মতো। যারা মন্ত্র জানে, তারা সাপকে ধরে তার মধ্য থেকে বিষের প্রতিক্রিয়া নষ্টকারী পাথরটি বের করে নেয়, যা অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি একে ধরলে তার মারাত্মক বিষে বেঘোরে প্রাণ হারায়। নিচে বর্ণিত পাঁচটি বিষয় লক্ষ না রাখলে ধনসম্পদের বিষ থেকে কেউ আত্মরক্ষা করতে পারে না।

প্রথমত, ধনসম্পদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ও কারণ জানতে হবে। এটা জানা থাকলে মানুষ যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই জীবিকা উপার্জন করবে এবং ততটুকুর জন্য ব্যস্ত হবে।

দ্বিতীয়ত, উপার্জনের মাধ্যমের প্রতি লক্ষ রাখবে। যা পুরোপুরি হারাম, তা থেকে বেঁচে থাকবে। যা বেশির ভাগ হারাম কিংবা মাকরূহ, তা থেকেও বিরত থাকবে। উদাহরণত কোনো ঘুষখোরের হাদিয়া গ্রহণ করা এবং মানুষের কাছে হাত পেতে কোনো কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে।

তৃতীয়ত, জীবিকার পরিমাণের প্রতি খেয়াল রাখবে, যাতে প্রয়োজনের বেশিও না হয়, কমও না হয়। প্রয়োজন হচ্ছে তিনটি— অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এদের প্রত্যেকটির তিনটি করে স্তর রয়েছে– নিম্ন, উচ্চ ও মধ্যবর্তী। মানুষের মন যতক্ষণ স্বল্পতা ও প্রয়োজনের প্রান্তসীমায় পড়ে থাকবে ততদিন তাকে মনের মধ্যে ভয় নিয়ে চলতে হবে। আর যদি সম্পদ প্রয়োজনের সীমার থেকে নিচে নেমে যায় তাহলে সে এমন অতল এক গহ্বরে নিপতিত হবে, যার তল খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হয়ে যাবে। এই মর্যাদার বিস্তারিত বিবরণ আমি যুহদ অধ্যায়ে দিয়ে এসেছি।

চতুর্থত, ব্যয়ের খাতের প্রতি লক্ষ রাখবে এবং ব্যয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। হালাল উপার্জনকে হালাল খাতেই ব্যয় করবে।

পঞ্চমত, অর্থ অর্জন, বর্জন, ব্যয় ও ব্যয় না করার ক্ষেত্রে নিয়ত ঠিক রাখবে। অর্থাৎ, যে অর্থ অর্জন করবে, তাতে ইবাদতে সাহায্য লাভের নিয়ত করবে এবং যে অর্থ বর্জন করবে, তাতে সংসার নির্লিপ্ততা ও ধন-সম্পদের নিকৃষ্টতার নিয়ত করবে। এমন করলে ধনসম্পদ ক্ষতিকর হবে না।

আলী (রা) বলেন, যদি কেউ পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদ হস্তগত করে নেয় এবং নিয়ত আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনেই হয়, তবু সে সংসারত্যাগীই থাকবে। পক্ষান্তরে যদি কেউ পৃথিবীর সমস্ত ধনসম্পদ বর্জন করে এবং "আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন" নিয়ত না হয়, তবে সে সংসারত্যাগী হবে না। সুতরাং মানুষের প্রত্যেকটি গতিবিধি ও স্থিরতা আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত। অর্থাৎ, গতি ও স্থিতি সে ক্ষেত্রেই করবে, যা ইবাদত কিংবা ইবাদতের জন্য সহায়ক। দেখো, ইবাদতের সর্বাধিক পরিপন্থি কাজ হচ্ছে খাওয়া ও মলমূত্র ত্যাগ করা। কিন্তু এগুলোর দ্বারাও ইবাদতে সহায়তা হয়। সুতরাং যদি কেউ সহায়তার নিয়তে আহার ও মলমূত্র ত্যাগ করে, তবে এগুলো তার জন্য ইবাদত হিসেবে লেখা হবে। এমনিভাবে জামা পায়জামা, বিছানা, পাত্র ইত্যাদির সংরক্ষণেও এই নিয়ত রাখা উচিত। কেননা, ধর্মকর্মে এগুলোরও প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে ধনসম্পদ থাকে, তাতে

আল্লাহর কোনো বান্দার উপকার করার নিয়ত করবে। সুতরাং উদ্বৃত্ত অংশে কেউ চাহিদা করলে তাকে দিতে অস্বীকার করবে না।

যে ব্যক্তি উপর্যুক্ত নিয়মাবলি মেনে চলবে, ধনসম্পদের আধিক্য তার জন্য ক্ষতিকর হবে না। কিন্তু এটা সে-ই অর্জন করতে পারে, যে ধর্মকর্মে পাকাপোক্ত এবং ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ, তারা এই মনে করে ধনসম্পদ সঞ্চয় করে যে, কিছু সাহাবী বিত্তশালী ছিলেন এবং তাদের কাছে অগাধ ধনসম্পদ ছিল। আমিও তেমনি অর্থ সঞ্চয় করি। এরূপ ব্যক্তির অবস্থা সেই নির্বোধ বালকের মতো, যে কোনো তন্ত্রমন্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তিকে সাপ ধরতে দেখে মনে করে, সে সুন্দর আকৃতি ও নরম ত্বকের কারণে সাপ ধরেছে। এরপর সেও তার দেখাদেখি সাপ ধরে এবং তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বলাবাহুল্য, সাপে কাটা ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে মরে গেছে। কিন্তু অর্থসম্পদ যাকে দর্শন করে, সে মরে গেছে বলে জানা যায় না।

মোটকথা, পাহাড়ে আরোহণ করা, নদীর তীরে ভ্রমণ করা এবং দুর্গম পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে যেমন অন্ধ ও দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সমান নয়, তেমনি ধনসম্পদ গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষ আলেমের সমান হতে পারে না।

প্রাচুর্যের ভর্ৎসনা ও দারিদ্র্যের প্রশংসা

শোকরকারী ধনীর মর্যাদা ঊর্ধ্বে, না ধৈর্যশীল গরীবের মর্যাদা ঊর্ধ্বে এ বিষয়ে মনীষীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। এ সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ! এখানে শুধু এতটুকু লিপিবদ্ধ করতে চাই যে, প্রাচুর্যের তুলনায় দরিদ্রতাই মোটামুটি ভালো। দরিদ্রতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এখানে আমরা হারেছ মুহাসিবী (র)-এর একটি বক্তব্য পেশ করবো, যা তিনি জনৈক ধনী আলেমের বক্তব্যের জবাব এক পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করেছেন। ধনী আলেম তার ধনসম্পদ সঞ্চয়ের প্রমাণস্বরূপ সাহাবায়ে কেরামের প্রাচুর্য এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর বিশাল ধনৈশ্বর্যের কথা উল্লেখ করে নিজেকে তাদের সাথে তুলনা করেছিলেন।

পারস্পরিক সম্পর্ক ও লেনদেন সম্পর্কিত জ্ঞানে তিনি ছিলেন উম্মাহর অনন্য ব্যক্তিত্ব। নফসের দোষ-ত্রুটি, আমলের বিপদাপদ এবং ইবাদতের

স্বরূপ তিনি যতটুকু লিখে গেছেন অন্য কেউ ততটুকু লিখে যাননি। তিনি প্রথমে বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, ঈসা (আ) নিকৃষ্ট আলেমদের সম্পর্কে বলেছেন— হে নিকৃষ্ট আলেমরা! তোমরা নামায পড়, রোযা রাখ এবং দান-সদকা কর। কিন্তু যা করতে বলা হয়েছে, তা করো না। তোমরা নিজেরা যা করো না, তা মানুষকে শিক্ষা দাও। তোমাদের এ কাজ খুবই খারাপ। বাহ্যত তোমরা মুখে তাওবা কর, কিন্তু অন্তরে রিপুর কামনা-বাসনা অনুযায়ী আমল কর। বাইরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ভিতরে কদর্যতা কোনো উপকারে আসবে না। আমি সত্য বলছি, তোমরা চালনির মতো হয়ো না, যার ছিদ্র দিয়ে আটা বের হয়ে যায়; কিন্তু ভুসি থেকে যায়। তোমাদের মুখ দিয়েও প্রজ্ঞার কথাবার্তা বের হয়, কিন্তু অন্তর আবর্জনার স্তূপ হয়ে থাকে। হে দুনিয়ার সেবাদাসরা! যে লোক দুনিয়ার খাহেশ ছিন্ন করে না, সেকি পরকালের সফলতা পাবে? আল্লাহর কসম! তোমাদের অন্তর তোমাদের আমল দেখে কাঁদছে। দুনিয়াকে তোমরা মাথায় করে রেখেছো আর আমলকে ঢেলে দিয়েছো পায়ের তলায়। তোমরা নিজেদের পরকাল বরবাদ করেছ। আখেরাতের কল্যাণ দুনিয়ার কল্যাণ লাভের চেয়ে অনেক বেশি উত্তম। তোমাদের মতো হতভাগা লোক পুরো দুনিয়াতে নেই। হায়! তোমরা যদি বুঝতে পারতে। তোমরা আর কতদিন অন্ধকারের পথিকদের রাস্তা বলে দেবে এবং নিজেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। মনে হয়, তোমরা দুনিয়াদারদের হাত থেকে দুনিয়াকে এজন্য ছাড়িয়ে নাও, যাতে সবটুকু দুনিয়াই তোমাদের কুক্ষিগত হয়ে যায়। যদি তোমাদের মুখ থেকে ইলমের নূর বের হয় এবং অন্তর অন্ধকারে ডুবে থাকে, তবে এতে লাভ কী? হে দুনিয়ার গোলাম! তোমরা পরহেযগার নও, স্বাধীনচেতা আল্লাহ ভক্তদের মতো নও। বিস্ময়ের কী থাকতে পারে, যদি দুনিয়া তোমাদেরকে উপুড় করে মাটিতে নিক্ষেপ করে! আর এমনি অবস্থায় টানাহেঁচড়া শুরু করে! তোমাদের গুনাহ তোমাদের মাথার চুল ধরে রাখবে এবং ইলম পেছন দিক থেকে ধাক্কা দেবে। এরপর তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সোপর্দ করবে। সেখানে না থাকবে কোনো সঙ্গীসাথী, না থাকবে কোনো সহৃদয় ব্যক্তি। এরপর সেখানে তোমরা নিজ নিজ কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করবে। (তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৬৮ : ৫৯০ ও ৪৭ : ৪৬০)

এরপর হারিছ মুহাসিবী (র) বলেন, এ হচ্ছে মন্দ আলেমদের অবস্থা। এরাই মানুষরূপী শয়তান এবং সকল ফিতনার মূল। এরা দুনিয়া তথা জাঁকজমক ও উচ্চ মর্যাদার লোভে পরকালকে ত্যাগ করেছে এবং ধর্মকে অপমানিত করেছে। আল্লাহ তাআলা নিজ দয়ায় ক্ষমা না করলে এরা পরকালে নিশ্চিতই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এরপর জানা দরকার, যে লোক দুনিয়াতে ডুবে থাকে, আমি দেখেছি, তার আনন্দ অসল নয়। সে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্টে জড়িত থাকে এবং তা দ্বারা বিভিন্ন পাপকাজ সম্পাদিত হয়। পরিণামে ধ্বংস ও বিপর্যয় ছাড়া তার কোনো প্রাপ্তি জুটে না। সে আশায় আশায় সুখী থাকে; কিন্তু না পায় দুনিয়া, না থাকে সহীহ দীন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে,

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ ، ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.

সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়াতে ও আখেরাতে; এটাই তো স্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা হজ : ১১)

হায়! এর চেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে? ভাইসব! আল্লাহর ধ্যান করো, শয়তানের কুমন্ত্রণার জালে বন্দী হয়ো না এবং শয়তানের বন্ধুদের ধোঁকায় পড়ো না। যারা মিথ্যা প্রমাণের ভিত্তিতে দুনিয়া হাসিল করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছে, তারা এ ওযর পেশ করে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণের নিকটও বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ছিল। এটা এ জন্য করে, যাতে ধনসম্পদ সঞ্চয়ে মানুষ তাদেরকে ক্ষমাযোগ্য মনে করে। অথচ এটা শয়তানের একটি কুমন্ত্রণা, যা তারা অনুভব করতে পারছে না। হে দুর্ভাগারা! আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধনসম্পত্তির প্রমাণ উপস্থাপন করা তোমাদের জন্য শোভা পায় না। শয়তান তোমাদের ধ্বংস করতে তোমাদের মুখ থেকে এ প্রমাণ বের করায়। কেননা, যখন তোমরা বলো, সাহাবায়ে কেরাম অঢেল ধনসম্পদ সঞ্চয় করেছিলেন, তখন তাদের গীবত কর এবং তাদের প্রতি দোষারোপ কর। আর যখন বলো, হালাল ধনসম্পদ সঞ্চয় করা তা ত্যাগ করার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তখন তোমরা যেন রাসূলুল্লাহ (স) ও পয়গম্বরগণকে ভ্রান্ত ও মূর্খ বলে প্রতিপন্ন কর, আর বলো যে, তাঁরা অনর্থকই সংসারবিমুখতা অবলম্বন করেছিলেন। সম্পদ সঞ্চয়ের যে যুক্তি তোমরা উদ্ভাবন করেছ, তা তারা বুঝতে সক্ষম হননি। এছাড়া তোমাদের মতো তাঁরাও সম্পদ সঞ্চয় করতেন। তোমাদের বক্তব্য

থেকে এ কথাও ওয়াজিব হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মতে রাসূলুল্লাহ (স) উম্মতের মঙ্গলকামী ছিলেন না; সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) যেন উম্মতকে কল্যাণকর বিষয় শিক্ষা না দিয়ে প্রতারণা করেছেন। আল্লাহর কসম! তোমাদের এ সব বক্তব্য পাগলের প্রলাপ বৈ কিছু নয়। রাসূলুল্লাহ (স) উম্মতের মঙ্গলকামী এবং তাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন।

তোমরা অর্থ সঞ্চয় করাকে উত্তম বলে থাকো। এ থেকে এটাও জরুরি হয়ে পড়ে যে, তোমাদের মতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি মোটেই মনোযোগ দেননি। কারণ, তিনি আমাদের অর্থ সঞ্চয় করতে নিষেধ করেছেন। অর্থ সঞ্চয় করার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব-এ কথা আল্লাহ তাআলা জানতে পারলেন না এবং না জেনেই নিষেধ করে দিয়েছেন। আর তোমরা অর্থের কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্ব চমৎকাররূপে জেনে নিয়েছ। তাই অর্থের পাহাড় গড়ে তুলছ। আল্লাহ আমাদেরকে এমন মূর্খতা থেকে রক্ষা করুন!

আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধনসম্পদ প্রমাণস্বরূপ পেশ করা তোমাদের জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। কিয়ামতের দিন তিনি স্বয়ং বাসনা প্রকাশ করবেন যে, দুনিয়ায় যদি আমি কোনোমতে জীবনধারণ করার মতো উপকরণ পেতাম, তাহলেই ভালো হতো। এক বর্ণনায় আছে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফের মৃত্যুর পর কোনো কোনো সাহাবী বললেন, আবদুর রহমান যে ধনসম্পদ রেখে গেছেন, এসব ধনসম্পদের কারণে তার জন্য আমাদের খুব ভয় হয়। কা'ব (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ! ভয় কীসের। তিনি হালাল ধনসম্পদ উপার্জন করেছেন, হালাল পথে খরচ করেছেন এবং হালাল উপার্জন রেখে গেছেন। এ উক্তি আবু যর গিফারী (রা)-এর কানে গেলো। তিনি রাগে অস্থির হয়ে একটি চুলের রশি হাতে নিয়ে কা'বের খোঁজে বের হয়ে পড়লেন। কা'ব (রা) এ সংবাদ শুনে পালালেন এবং খলীফা উসমান (রা)-এর শরণাপন্ন হয়ে ঘটনার বিবরণ শুনালেন। আবু যর (রা)-ও তাঁকে অনুসরণ করে উসমানের ঘরে গেলেন। তাঁকে দেখামাত্রই কা'ব (রা) খলীফার পেছনে গিয়ে বসলেন। আবু যর (রা) তাঁকে উদ্দেশ্য করে সজোরে বললেন, হে অমুকের সন্তান! তুমিই বলেছিলে যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) যে সম্পত্তি রেখে গেছেন, তাতে কোনো দোষ নেই। অথচ রাসূলে আকরাম (স) একবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশে

গেলেন। সেখানে তিনি আমাকে ডাক দিলেন, আবু যর! আমি উত্তর দিলাম, লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন,

اَلْاَكْثَرُوْنَ هُمُ الْاَكْثَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا مَنْ قَالَ هٰكَذَا وَ هٰكَذَا عَنْ يَّمِيْنِهٖ وَشِمَالِهٖ وَقُدَّامِهٖ وَخَلْفِهٖ وَهُمْ قَلِيْلٌ.

অর্থাৎ, অধিক ধনীরাই কিয়ামতের দিন কম পুঁজিবিশিষ্ট হবে, কিন্তু তারা ছাড়া যারা ডান হাতে ও বাম হাতে, সামনে ও পিছনে এমন এমন করবে। তাদের সংখ্যা খুবই কম হবে।

এরপর তিনি পুনরায় আমার নাম ধরে ডাকলেন। আমি লাব্বায়কা বললে তিনি বললেন, যদি আমার নিকট উহুদ পাহাড়ের সমান ধনভান্ডার থাকে, আমি তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করি, কিন্তু ইন্তেকালের দিন তা থেকে দুটি যব পরিমাণও আমার পরে থেকে যায়, এটাকে আমি ভালো মনে করি না। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি দুটি স্তূপের কথা বলছেন? তিনি বললেন, না, বরং দুটি যব অবশিষ্ট থাকার কথা বলছি। আমি তো কম বলি, আর তুমি বাড়িয়ে বলো। এখন রাসূলুল্লাহ (স) তো এ কথা বলেন, আর তুমি আবদুর রহমান ইবনে আওফের বিশাল সম্পত্তি ছেড়ে যাওয়ার মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পাও না। তুমিও মিথ্যাবাদী এবং যে এ কথা মানে, সেও মিথ্যাবাদী। আবু যরের এ স্পষ্টোক্তির জবাব কোনো সাহাবী দেননি। তিনি তাঁর কথা বলে সেখান থেকে বেরিয়ে যান। (সহিহ বুখারী : ৬৪৪৪, সহিহ মুসলিম : ৯৪)

আমরা আরও হাদীস প্রাপ্ত হয়েছি যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফের পণ্যবাহী উট ইয়ামান থেকে ফিরে আসলে মদীনায় হঠাৎ ধুমধাম ও গোলমালের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। আয়েশা (রা) বললেন, গোলমাল কীসের? লোকেরা আরয করল, আবদুর রহমান ইবনে আওফের উট এসেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ ও রাসূল সত্য বলেছেন। আবদুর রহমান এই সংবাদ পেয়ে এই হাদীসটি সম্পর্কে আয়েশাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি– আমি জান্নাতে মুহাজির ও মুসলমানদের মধ্যে যারা ফকির, তাদেরকে খুব উৎফুল্লতার সাথে দেখেছি এবং ধনীদের কাউকে তাদের সাথে জান্নাতে যেতে দেখিনি। তবে আবদুর রহমান ইবনে আওফ হামাগুড়ি দিয়ে তাদের

সাথে যাচ্ছিল। আবদুর রহমান এই হাদীস শুনে বললেন, এই উটগুলো তাদের সমুদয় বোঝাসহ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলাম। আর যে সকল গোলাম এসব উটের দায়িত্বে নিয়োজিত, তাদেরকেও আমি মুক্ত করে দিলাম, যাতে ফকিরদের সাথে আমিও দৌড়ে জান্নাতে যেতে পারি। (মুসনাদে আহমাদ : ৬ : ১১৫)

আমরা আরও একটি বর্ণনা পেয়েছি যে, রাসূলুল্লাহ (স) একবার আবদুর রহমান ইবনে আওফকে বললেন, আমার উম্মতের ধনীদের মধ্যে সর্বপ্রথম তুমি জান্নাতে যাবে; কিন্তু সম্ভবত হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করবে। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৩ : ৩১১, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৩০৬৪)

আবদুর রহমান (রা) আল্লাহভীতি, অনুগ্রহ ও আল্লাহর রাস্তায় অর্থ খরচে অগ্রণী সাহাবীগণের অন্যতম ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এবং জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ছিলেন। তারপরও তিনি ধন-সম্পদের কারণে কিয়ামতের ময়দানে ফকিরদের পিছনে পড়ে থাকবেন। অথচ এ ধনসম্পদ তিনি হালাল উপায়ে উপার্জন করেছিলেন, যাতে অপরের নিকট ভিক্ষা করতে না হয়। এ ধনসম্পদ দ্বারা তিনি মানুষের উপকারও করেছেন। নিজের জন্য মধ্যপন্থায় খরচ করেছেন এবং আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে বিলিয়েছেন। তবু তিনি জান্নাতে মুহাজির ফকিরদের সাথে যেতে পারবেন না। তাঁরই যখন এ অবস্থা, তখন দুনিয়ার ব্যস্ততায় মশগুল আমাদের কী অবস্থা হবে?!

বিস্ময়ের ব্যাপার! তোমরা সর্বক্ষণ সন্দেহযুক্ত ও হারাম ধনসম্পদের উপর ঝাঁপিয়ে পড় এবং এ হাতের ময়লার জন্য অন্যদের সাথে গর্ব করতে থাকো। তোমরা খাহেশ, সাজসজ্জা, অহংকার ও নানা ধরনের অবাঞ্ছিত কাজে আঁটকে আছো। এমতাবস্থায় আবদুর রহমান ইবনে আওফের ধন-সম্পদের প্রমাণ কী করে পেশ করতে পারো? এটা শয়তানি তুলনা। শয়তান তার বন্ধুদেরকে এ ধরনের প্রমাণাদি উপস্থাপন করে থাকে।

এখন আমি তোমাদেরকে সাহাবায়ে কেরামের এবং পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের অবস্থা বর্ণনা করে শুনাচ্ছি, যাতে তোমরা নিজেদের নিকৃষ্টতা ও সাহাবায়ে কেরামের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে পারো। মনে রাখবে, কোনো কোনো সাহাবীর নিকট অর্থসম্পদ থাকার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল পরমুখাপেক্ষিতা থেকে আত্মরক্ষা এবং আল্লাহর রাস্তায় অকাতরে খরচ করা। তাঁরা হালাল

উপায়ে উপার্জন করেছেন, পবিত্র সম্পদ ভোগ করেছেন এবং মধ্যবিত্তের ন্যায় পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ করেছেন। তারা দুনিয়াতে কারও অধিকার ক্ষুণ্ন করেননি এবং কৃপণতাও করেননি। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের অধিকাংশ ধনসম্পদ দান করেছেন। কোনো কোনো সাহাবী আল্লাহর রাস্তায় তাদের সমুদয় অর্থই বিলিয়ে দিয়েছেন। এখন আমার প্রশ্ন, তোমরাও কি তেমনি? না, তোমরা এমন হবে কী করে? বিশ্ব-জাহানের সাথে সামান্য মাটির কি তুলনা হয়?

এছাড়া বেশিরভাগ সাহাবী ছিলেন দরিদ্রতা প্রিয়, নিঃস্বতার ভয় থেকে মুক্ত, জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, তাকদীরে সন্তুষ্ট, বিপদাপদে সম্মত, নিয়ামতের শোকরগুজার, দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহর প্রশংসাকারী এবং গর্ব ও অহংকার থেকে দূরে। এখন বলো, তাদের সাথে কি তোমাদের তুলনা চলে?

তাঁদের নীতি ছিল, দুনিয়ার সম্পদ তাঁদের হাতে এসে গেলে তাঁরা দুঃখ করে বলতেন— মনে হয় আল্লাহ তাআলা কোনো গুনাহের শাস্তি দুনিয়াতেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ, তারা দুনিয়ার আগমনকে শাস্তি মনে করতেন। অথচ যখন দরিদ্রতা দেখতেন, তখন খুশি হয়ে বলতেন— ভালো হয়েছে। নেককার বান্দাদের বৈশিষ্ট্য আমরা পেয়ে গেছি। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ৫)

বর্ণিত আছে, এক বুযুর্গ সকাল বেলায় ঘরে কিছু মালসম্পদ দেখলে দুঃখিত ও বিষণ্ন হতেন, আর ঘরে কিছু না থাকলে খুশি হতেন। তাঁকে কেউ জিজ্ঞেস করল, মানুষ তো ঘরে কিছু না থাকলে দুঃখ করে এবং থাকলে খুশি থাকে। আপনার অবস্থা এর বিপরীত কেন? তিনি বললেন, কারণ, আমি পরিবার-পরিজনের নিকট ভোরবেলা উঠে যখন কিছু না দেখি, তখন এ ভেবে খুশি হই যে, আজ রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ নসীব হয়েছে। অপরদিকে ঘরে যখন কিছু থাকে, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ না হওয়ার কারণে দুঃখিত হই। তাদেরকে যখন আশার পথে পরিচালিত করা হতো তারা ভয়ে ভীত হয়ে পড়তো এবং দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে যেতো। তারা বলতো, কী হলো আমাদের? দুনিয়া আমাদের থেকে কী চায়? তাদের কথা শুনলে মনে হতো, তারা ভয়ের ডানায় চড়ে বসে আছে। তাই তারা দুঃখ-দুর্দশার শিকার হলে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে

উঠতো। বলতো, এই প্রতিশ্রুতিই প্রভু আমাদের থেকে নিয়েছিলেন। মোটকথা, পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের এই অবস্থা ছিল। আমরা এখানে কমই উল্লেখ করেছি। তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল অসংখ্য ও অগণিত। এখন তোমরা বলো, তোমাদের অবস্থাও কি তেমনি? নাউযুবিল্লাহ! তোমরা এমন হবে কেন? তোমাদের অবস্থা তো তাদের বিপরীত। তোমরা প্রাচুর্যে গর্ব কর, নিয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতায় গাফেল হয়ে যাও। বিপদ এলে তোমরা ক্রুদ্ধ হও এবং নিঃস্বতায় নিরাশ হয়ে যাও। তোমরা আল্লাহর বিধিবিধানে সন্তুষ্ট নও। দরিদ্রতাকে খারাপ মনে কর এবং দরিদ্রতার কারণে অতিষ্ঠ হয়ে যাও। দরিদ্রতার কারণে পয়গম্বরগণ গর্ব করতেন। তাঁদের গর্বের বস্তু তোমাদের নিকট খারাপ লাগে। দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা ধনসম্পদ জমা কর। এতেও আল্লাহর প্রতি অন্যায় ধারণা করা হয় এবং তিনি রিযিক পৌছানোর যে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তা বিশ্বাস না করার সমান হয়ে পড়ে। এতটুকু গুনাহ কি কম? আমার মনে হয়, তোমরা দুনিয়ার আনন্দ এবং আড়ম্বর হাসিলের জন্যই ধনসম্পদ জমা কর। অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে খারাপ প্রকৃতির লোক তারাই, যারা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত-পালিত হয় এবং এতেই তাদের দেহ ফুলে-ফেঁপে উঠে। (ইবনু আবিদ দুনিয়া : আস-সামতু ওয়া আদাবুল লিসান : ১৫০, ইবনু আদি : আল-কামিল : ৫ : ৩১৮, আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৮ : ১০৭, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ৯০)

এক আলেম বলেন, কিয়ামতের দিন কিছু লোক তাদের পুণ্যসামগ্রী দেখতে চাইবে। তখন তাদেরকে বলা হবে,

اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا.

'তোমরা পার্থিবজীবনেই তোমাদের সুখ-সম্ভার পেয়ে গেছ এবং সেগুলো ভোগও করেছ। (সূরা আহকাফ : ২০)

তোমরা কি জানো না যে, দুনিয়ার নিয়ামতের কারণে পরকালের নিয়ামত থেকে মাহরূম হয়েছ?

এটা বিস্ময়কর যে, তোমরা গর্ব, অহংকার ও জাগতিক সাজসজ্জার জন্য সম্পদ জমা কর। অথচ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে লোক গর্ব, অহংকার ও প্রাচুর্যের জন্য ধনসম্পদ জমা করে, সে আল্লাহর নিকট এমনভাবে যায় যে,

আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হন। (ইবনু আবী শায়বা : মুসান্নাফ : ২২৬২৫, ইবনু আবিদ দুনিয়া : আল ইয়াল : ৩২, আবু নুআইম : আল হিলইয়া : ৩ : ১০৯, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি : ৯৮৯০)

হয়তো বা আল্লাহর নিকট যাওয়া অপেক্ষা দুনিয়ায় থাকা তোমাদের নিকট উত্তম। এ জন্য আল্লাহর দীদারকে খারাপ মনে কর। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তোমাদের প্রতি নাখোশ। দুনিয়ার কোনো জিনিস তোমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেলে সেজন্য দুঃখ প্রকাশ কর। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে,

مَنْ اَسَفَ عَلٰى دُنْيَا فَاتَتْهُ اِقْتَرَبَ مِنَ النَّارِ مَسِيْرَةَ سَنَةٍ.

অর্থাৎ, দুনিয়া হাত ছাড়া হওয়ার কারণে যে লোক অনুশোচনা করে, সে এক বছরের রাস্তা পরিমাণ জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়ে যায়।

অনুশোচনা করলে যে শাস্তি নিকটবর্তী হয়ে যাবে, তোমাদের এ বিষয়ে মাথাব্যথা নেই। বরং বিস্ময়কর নয় যে, দুনিয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে তোমরা দীন থেকেও খারিজ হয়ে যাবে। দুনিয়ার প্রাপ্তিতে তোমরা আনন্দিত ও প্রফুল্ল হয়ে যাও। তোমাদের খবর নেই যে, হাদীসে বলা হয়েছে—

مَنْ اَحَبَّ الدُّنْيَا وَسَرَّبِهَا ذَهَبَ خَوْفُ الْاٰخِرَةِ مِنْ قَلْبِهٖ.

অর্থাৎ, যে দুনিয়াকে মহব্বত করে এবং তাকে নিয়ে উল্লাস করে, তার অন্তর থেকে পরকালের ভয় চলে যায়। (আয যুহদ, ইবনু আবিদ দুনিয়া : ১৬৯, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৭ : ৭৯)

এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন, দুনিয়ায় কোনো উপকরণ হাত ছাড়া হওয়ার কারণে তোমার মনে কষ্টবোধ আসলে, তোমাকে এই কারণে হিসাবের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। দুনিয়ার উপকরণ অর্জন করে আনন্দিত হলেও তোমার হিসাব হবে। দুনিয়া নিয়ে তোমার আনন্দিত হওয়ার অর্থ হলো, আল্লাহর ভয় তোমার মন থেকে দূর হয়ে গেছে।

দুনিয়ার চিন্তা কমে যাওয়ার তুলনায় গুনাহের বিপদ তোমাদের নিকট হালকা মনে হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। কেননা, তোমরা ধনসম্পদ নষ্ট হওয়ার ভয় বেশি কর এবং গুনাহের ভয় কম কর। হাতের এ ময়লা থেকে যা কিছু দীন-দুঃখীকে দান কর, তাও উচ্চ মর্যাদা ও অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব

অর্জনের অভিলাষে দান কর। আল্লাহ তাআলা নাখোশ হলেও মানুষ তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুক এবং তোমাকে সম্মান করুক, এটাই তোমরা চাও। মানুষের মর্যাদা যেন তোমাদের নিকট আল্লাহর চেয়ে বেশি। নাউযুবিল্লাহ! যখন এতগুলো দোষ তোমাদের মধ্যে রয়েছে এবং এমন সব আবর্জনার সাথে তোমরা জড়িত, তখন জ্ঞানীদের সামনে কোন মুখে বলো, তোমাদের ধনসম্পদও আল্লাহর নেক বান্দাদের ধনসম্পদের মতো? কোথায় তোমরা এবং কোথায় তাঁরা? তাঁরা তো হালাল মালের প্রতিও এতটুকু বিমুখ ছিলেন, যা তোমরা হারাম সম্পদের প্রতিও নও। তাদের দ্বারা কোনো সগীরা গুনাহ হয়ে গেলে তারা তাকে এত বড় মনে করতেন, যা তোমরা কবিরা গুনাহকেও মনে করো না। যদি তোমাদের হালাল ও পবিত্র ধনসম্পদ তাদের সন্দেহযুক্ত ধনসম্পদের মতোও হতো, তাহলে তা হতো ভাগ্যের কথা। হায়! তোমরা যদি তোমাদের মন্দ কাজের কারণে এতটুকু ভীত হতে, যতটুকু তারা তাঁদের সৎকাজ কবুল না হওয়ার ভয়ে ভীত হতেন। অথবা তোমাদের রোযা পালন যদি তাঁদের রোযা না পালনের সমান হতো অথবা তোমাদের পরিশ্রম তাঁদের ইবাদতের অলসতা ও নিদ্রার সমতুল্য হতো! কিংবা তোমাদের সমস্ত নেকী তাদের একটি নেকীর সমান হতো! এক বর্ণনায় আছে, জনৈক সাহাবী বলেন, সিদ্দীকগণ থেকে যে পরিমাণ দুনিয়া ফওত হয়ে যায় এবং পৃথক থাকে, সে পরিমাণে তাদের জন্য সেটা আশীর্বাদ হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং যে লোক এমন নয়, সে দুনিয়াতেও তাদের সঙ্গী না, পরকালেও না।

এখন দেখা যাক, উভয়পক্ষের ব্যবধান কতটুকু। একপক্ষ সাহাবায়ে কেরাম, যারা আল্লাহ তাআলার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং অপরপক্ষ তোমরা এবং তোমাদের মতো লোক, যারা নিম্নস্তরের মর্যাদার অধিকারী। যদি আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে ক্ষমা করেন।

হে আত্মগর্বী! তোমরা বলো, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণেই তোমরা ধন-সম্পদ জোগাড় করে থাকো, যাতে চাওয়ার দরকার না পড়ে এবং আল্লাহর রাস্তায় দান করা যায়। তোমাদের ভাবা উচিত, সাহাবায়ে কেরামের যুগে হালাল উপার্জন যতটুকু সহজলভ্য ছিল, বর্তমান যুগে তা আছে কি না। তাঁরা হালাল উপার্জনে যে পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন, তোমাদের দিয়ে সেটা সম্ভব কি না। আমি একজন সাহাবী সম্পর্কে জানতাম, তিনি

বলতেন, আমরা হালাল পন্থার ৭০টি পথ এজন্য ছেড়ে দিতাম যে, না জানি কোথাও হারামে লিপ্ত হয়ে পড়ি। তোমরাও কি নিজেদের পক্ষ থেকে এমন সতর্কতা আশা কর? আল্লাহর কসম! তোমরা এমন সতর্ক থাকবে— তা আমি কামনা করি না কখনো। জেনে রেখো, দয়া ও সৎকর্মের জন্য ধনসম্পদ জমা করা শয়তানের একটি ধোঁকা। শয়তান দয়া ও দান-খয়রাতের ছুতায় তোমাদেরকে সন্দেহযুক্ত ও হারাম মিশ্রিত সম্পদ উপার্জনে ব্যাপৃত করতে চায়। হাদীসে আছে, যে লোক দুঃসাহস করে সন্দেহপূর্ণ কাজ করে, তার খুব দ্রুত হারামে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হে দাম্ভিক! তোমাদের জানা উচিত, সন্দেহপূর্ণ সামগ্রী উপার্জন করে আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়ে সবসময় সন্দেহে জড়িত হওয়াকে ভয় করা ভালো। যাতে আল্লাহ তাআলার সামনে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সে হিসেবে আলেমগণ বলেন, যদি কোনো লোক হালাল না হওয়ার ভয়ে এক টাকা ত্যাগ করে, তাহলে এটা তার জন্য সন্দেহযুক্ত এক হাজার আশরাফী দান করার তুলনায় শ্রেষ্ঠ। তোমরা নিজেদেরকে যদি বড় মুত্তাকী ও আল্লাহভীরু মনে কর, যে জন্য শয়তান তোমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারবে না, তবে আমি বলি, তোমরা মুত্তাকী হলেও কিয়ামতের হিসাব নিজেদের উপরে রাখা ঠিক হবে না। কেননা, শ্রেষ্ঠ সাহাবীরাও কিয়ামতের মাঠে জবাবদিহিতাকে ভয় করতেন। সেজন্যই জনৈক সাহাবী বলেন, প্রতিদিন আমি যদি এক হাজার আশরাফী হালাল পথে উপার্জন করি এবং সমস্তই আল্লাহর পথে খরচ করি— এতে আমার জামাতের নামাযও বিঘ্নিত হয় না, তবু এভাবে দানখয়রাত আমি পছন্দ করি না। লোকেরা জানতে চাইল, কেন? তিনি বললেন, শূন্যহস্ত থাকলে আমি কিয়ামতের দিন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া থেকে বেঁচে যাব। ধনীদেরকে প্রশ্ন করা হবে— হে বান্দা! বলো, কোথা থেকে তুমি আয় করেছ? কোথায় খরচ করেছ? কাজেই দেখো, তাঁরা ছিলেন মুত্তাকী। সে যুগে হালাল রুজিরোজগার ছিল; কিন্তু তারপরও হিসাবের ভয়ে তাঁরা ধনসম্পদ ত্যাগ করেছেন। আর তোমরা যে যুগে বাস করছ, সে যুগে তো হালালের বালাই নেই। কাজেই, তোমরা কী জমা করছ? কোনো কোনো সাহাবী তো উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধন-সম্পদও এ আশঙ্কায় গ্রহণ করতেন না যে, কোথাও অন্তরে পরিবর্তন ও ভ্রষ্টতা এসে না যায়। তোমরা কি নিজেদেরকে সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে

বেশি মুত্তাকী মনে কর? এমন মনে করলে তোমরা নফসে আম্মারার প্রতি খুব সুধারণা পোষণ করছ বলতে হবে। আমার বক্তব্য হলো, প্রয়োজন পরিমাণ ধনসম্পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা তোমাদের কর্তব্য। সৎকর্ম করার উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করে হিসাবের সম্মুখীন না হওয়া উচিত। হাদীসে আছে, যাকে হিসাবে জড়িত করা হবে, সে আযাবে পতিত হবে।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন যে হারাম উপায়ে অর্থ উপার্জন করেছে এবং হারামেই খরচ করেছে, এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়া হবে। এরপর আরও এক লোককে আনা হবে, যে হালাল উপায়ে রুজিরোজগার করেছে এবং হালাল পথেই খরচ করেছে। তাকে বলা হবে— থামো, সম্ভবত তুমি ধনসম্পদের তালাশে অন্য কোনো ফরয কাজে ত্রুটি করেছ। যেমন সঠিক সময়ে নামায আদায় করনি। অথবা রুকু, সিজদা ও ওযু ভালোমতো করনি। সে আরয করবে, হে রব! আমি হালাল উপায়ে উপার্জন করেছি এবং হালাল পথেই খরচ করেছি। তোমার কোনো ফরয বিনষ্ট করিনি। অহংকার ও গর্বও করিনি এবং কারও হক আত্মসাৎও করিনি। এরপরও তাকে বলা হবে, আমি তোমাকে পানাহার ও আনন্দের যেসব বস্তু দান করেছিলাম, সবগুলোর কৃতজ্ঞতা উপস্থাপন করো।

মোটকথা, এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ হতে থাকবে। এখন আমি বলি, এই তৃতীয় ব্যক্তি, যে হালাল পথে উপার্জন করেছে, হালাল পথে ব্যয় করেছে এবং সকল হক ও ফরযসমূহ যথাযথ আদায় করেছে, তাকেই যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন আমাদের মতো লোকের কী অবস্থা হবে, যারা দুনিয়ার ফেতনা, সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি, খাহেশ ও সাজসজ্জায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছে? হে হতভাগারা! এসব জিজ্ঞাসাবাদের কারণেই মুত্তাকীগণ দুনিয়ার সাথে জড়িত হওয়া থেকে বিরত থাকেন এবং প্রয়োজন পরিমাণ ধনসম্পদে সন্তুষ্ট থেকে বিভিন্ন প্রকার সৎকর্ম সম্পাদন করেন। তোমাদের উচিত, এমন মুত্তাকীগণের অনুসরণ করা।

আর যদি এ কথাই মনে কর যে, তোমরা সর্বাধিক মুত্তাকী, ধনসম্পদও হালাল পথে উপার্জন কর, ব্যয়ের মধ্যেও কারও হক তোমাদের যিম্মায় থাকে না, অন্তরে কোনো বিরূপ পরিবর্তনও আসে না এবং সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী কর, তবে এমনটা হওয়া যদিও সম্ভব নয়, তবু

তোমাদের উচিত, প্রয়োজন পরিমাণ ধনসম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, কিয়ামতের দিন ধনীদের জিজ্ঞাসাবাদ থেকে মুক্ত থাকা এবং প্রথম কাফেলাতেই জান্নাতে প্রবেশ করার গৌরব অর্জন করা।

নবী কারীম (স) ইরশাদ করেছেন— ফকীর মুহাজিরগণ জান্নাতে ধনীদের চেয়ে ৫শ' বছর আগে প্রবেশ করবে। অন্য এক হাদীসে আছে— ফকীর মুমিনগণ জান্নাতে ধনীদের আগে প্রবেশ করবে। তারা আহার করবে এবং ফূর্তি করবে। আর ধনীরা হাঁটু গেড়ে বসে থাকবে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলবেন, তোমাদের কাছেই আমার দাবি। তোমরা মানুষের শাসক ছিলে। বলো, আমি যা কিছু দিয়েছি, তা দিয়ে তোমরা কী কী কাজ করেছ?

ভাইসব! এমন চেষ্টা করো, যাতে হালকা-পাতলা হয়ে পয়গম্বরগণের কাফেলায় শামিল হয়ে যাও এবং রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পেছনে পড়ে থাকাকে ভয় করো। আমি এমন বর্ণনাও পেয়েছি যে, একজন সাহাবী তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি চাইলে লোকেরা তাকে মধুর শরবত এনে দিল। তিনি যখন সেটি আস্বাদন করলেন, তখন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। নিজেও কাঁদলেন এবং উপস্থিত সকলকে কাঁদালেন। এরপর চোখ থেকে অশ্রু মুছে কিছু কথা বলতে চাইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই কান্না শুরু করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, এই শরবতের কারণেই আপনি কাঁদছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। কক্ষে আমরা দু'জন ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। তিনি হঠাৎ বলতে লাগলেন, আমার কাছ থেকে সরে যাও। আমি আরয করলাম, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ, আমি তো আপনার সামনে কাউকে দেখছি না। আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? তিনি বললেন, এ সময় দুনিয়া আমার দিকে তার মাথা বাড়িয়ে বলল, আমাকে গ্রহণ করুন। আমি তাকে বললাম, আমার কাছ থেকে সরে যাও। সে বলল— হে মুহাম্মদ! যদি আপনি আমার মোহ থেকে বেঁচে থাকেনও, আপনার পরবর্তী লোকেরা আমার মোহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। তাই আমি আশঙ্কা করছি, এই শরবত পান করে আমি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যাই।

ভাইসব! এরা ছিলেন সৎলোক। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কেঁদে বুক ভাসাতেন। আর তোমরা তো নানাবিধ

নিয়ামত ও কামনা-বাসনায় মগ্ন। তোমাদের উপার্জন হারাম ও সন্দেহমুক্ত নয়। কিন্তু তোমরা হাবীবে পাক (স) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় করো না। ধিক্ তোমাদের প্রতি!

এক হাদীসে বলা হয়েছে— যদি কোনো লোক আশরাফীর থলি কোলে নিয়ে বিলিয়ে দেয় এবং অপর ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে, তাহলে প্রথম ব্যক্তির তুলনায় যিকিরকারী ব্যক্তি হবে উত্তম।

প্রথম সারির কোনো এক তাবিঈকে এক লোক প্রশ্ন করল যে, দু'ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়া কামাই করল এবং তা দিয়ে গরিব আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য-সহায়তা করল। অপর ব্যক্তি এ থেকে অনেক দূরে সরে রইল। সে না দুনিয়া চাইল আর না পেল। এ দু'জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? তাবিঈ বললেন, তাদের মধ্যে অনেক ব্যবধান। যে দুনিয়া থেকে দূরে সরে রইল, সে শ্রেষ্ঠ। তার মধ্যে এবং অপর ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান। হে হতভাগ্য! যদি তোমরা দুনিয়া ছেড়ে দাও, তবে দুনিয়াদারদের ওপর তোমরাও এ মর্যাদা পেয়ে যাবে।

দুনিয়া ত্যাগ করার মধ্যে দুনিয়াতেও নানাবিধ ফায়দা রয়েছে। এতে শরীর আরাম পায়। পরিশ্রম বেশি করতে হয় না। সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত হয়। কাজেই ধনসম্পদ জমা করার পক্ষে আর কি কোনো যুক্তি থাকতে পারে? মনে করো, সম্পদ সঞ্চয় করার মধ্যে যদি কোনো শ্রেষ্ঠত্ব থাকেও তবু তোমার উচিত, উত্তম চরিত্রে রাসূলুল্লাহ (স)-এর অনুসরণ করা, যাঁর ওছিলায় তোমরা হিদায়াত পেয়েছ। তিনি যেমন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করেছিলেন, তোমরাও তেমনি করো। বিশ্বাস করো, দুনিয়া থেকে সরে থাকার মধ্যেই সৌভাগ্য ও কল্যাণ রয়েছে। মুহাম্মদ মুস্তফা (স)-এর ঝাণ্ডা নিয়ে প্রথম দলে জান্নাতে যাওয়ার আশা করো।

রাসূলুল্লাহ (স) এক হাদীসে বলেন— মুমিনগণের সরদার হবে সে ব্যক্তি, যে সকালের খাবার পেলে সন্ধ্যায় পায় না, ঋণ চাইলে যাকে কেউ ঋণ দেয় না, যার শরীরের ফরয অঙ্গ ঢাকার অতিরিক্ত পোশাক নেই এবং যে পরিমাণ খাদ্য যথেষ্ট হয়, সে পরিমাণ খেতে অক্ষম, এরপরও যে সকাল-সন্ধ্যা নিজের পালনকর্তার প্রতি খুশি থাকে। এমন লোকদের সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.

(সে) নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ— যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন—তাদের সঙ্গী হবে এবং সঙ্গী হিসেবে তাঁরা কতই না উত্তম! (সূরা নিসা : ৬৯)

বন্ধুগণ! এ ঘোষণার পর যদি তোমরা অর্থ জমা কর এবং সৎকর্ম করার দাবি কর, তাহলে তোমাদের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা হবে। মূলত তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে বিলাসিতা, প্রাচুর্য ও সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্য এবং গর্ব, আত্মম্ভরিতা, লৌকিকতা, খ্যাতি এবং সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ জমা করে যাচ্ছ। আর মুখে বলছ, সৎকর্ম সম্পাদন করার জন্য সঞ্চয় করছ। আল্লাহকে ভয় করো এবং মিথ্যা দাবির জন্য অনুতপ্ত হও। তোমাদের মধ্যে যদি দুনিয়ার ধনসম্পদের মহব্বত প্রবল হয়ে থাকে, তবে এটা মুখে স্বীকার করো। ধনসম্পদ জমা করার সময় নিজেদের হেয় মনে করো এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করো, এটা তোমাদের জন্য মুক্তির কারণ হতে পারে। অর্থ সঞ্চয়ের পক্ষে অনর্থক যুক্তি-প্রমাণ খোঁজ করে কী লাভ?

ভাইয়েরা আমার! সাহাবায়ে কেরামের যুগে হালাল-এর চর্চা বেশি ছিল। কিন্তু তাঁরা ছিলেন সর্বাধিক মুত্তাকী, আল্লাহভীরু, উপর্যুপরি দুনিয়াবিমুখ। আজকাল হালাল উপার্জন প্রায় বিলুপ্ত। এমনকি প্রাত্যহিক খাদ্য এবং জরুরি অঙ্গ আবৃত করার বস্তুও হালাল উপায়ে সহজলভ্য নয়। অতএব এমন যামানায় অর্থ সঞ্চয় করা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুন!

এখন আমাদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মতো তাকওয়া, পরহেযগারি, সতর্কতা কোথায় এবং তাদের অন্তর ও নিয়তের মতো অন্তর ও নিয়ত কোথায়? আল্লাহর কসম! আমাদের অন্তর প্রবৃত্তির ঘূর্ণাচক্রে তার কামনা-বাসনার জালে বন্দি। আমাদেরকে অতিসত্বর কিয়ামতের মাঠে যেতে হবে। ওই ব্যক্তি বড়ই ভাগ্যবান, যে সেদিন হালকা-পাতলা থাকবে। আর যারা অঢেল সম্পদের মালিক— হারাম ও হালাল মিশ্রিত করে ভক্ষণকারী— সেদিন তাদের অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হবে।

আমি নছীহত হিসেবে তোমাদেরকে এসব কথা বললাম। এখন তোমাদের কাজ হলো গ্রহণ করা । সত্যই যারা গ্রহণ করবে— এমন লোকের সংখ্যা

খুবই কম। আল্লাহ তাআলা তাঁর বিশেষ রহমতে আমাদেরকে ও তোমাদেরকে কথাগুলো মানার সক্ষমতা দান করুন! আমীন।

এ পর্যন্ত হারিছ মুহাসিবী (র)-এর সারগর্ভ আলোচনার শেষ হলো। এ থেকে সম্পদের ওপর দারিদ্র্যের শ্রেষ্ঠত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রতীয়মান হলো। এতটুকুই যথেষ্ট। তবে এরই সমর্থক আবু উমামা বাহিলী (রা) থেকে আরও একটি বর্ণনা আছে। তা এই যে, একবার ছা'লাবা ইবনে হাতিব বিনীতভাবে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে ধনসম্পদ দান করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে ছা'লাবা! অল্প ধনসম্পদ, যার তুমি শোকর আদায় করতে পারবে, তা অনেক ধনসম্পদের চেয়ে উত্তম, যার তুমি শোকর আদায় করতে পারবে না। ছা'লাবা আরয করলেন, আপনি দুআ করুন, যেন ধন-সম্পদ পাই। নবীজি বললেন, ছা'লাবা! তুমি কি আমার অনুসরণ করো না? আল্লাহর কসম! আমি যদি ইচ্ছা করি যে, পাহাড় সোনা-রূপায় পরিণত হয়ে আমার পেছনে পেছনে চলুক, তবে তা সম্ভব। ছা'লাবা আবার আরয করলেন, আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, যদি আপনার দুআয় আমি ধনী হই, তাহলে আমি সকল হকদারের হকও আদায় করব, তদুপরি এটা করব, ওটা করব। রাসূলুল্লাহ (স) দুআ করলেন, হে আল্লাহ! ছা'লাবাকে ধনসম্পদ দান করো। এরপর থেকে ছা'লাবার অল্পসংখ্যক বকরি পিপীলিকার ন্যায় বেড়ে যেতে লাগল। এমনকি তার পক্ষে মদীনায় থাকা সম্ভব হলো না। তিনি বকরির পালের সাথে মাঠে-ময়দানে গিয়ে থাকতে লাগলেন। শুধু যোহর ও আসরের জামাতে উপস্থিত হতেন এবং অন্যান্য জামাত ছেড়ে দিতেন। এরপর বকরির সংখ্যা আরও বেড়ে গেল। ফলে সেই জঙ্গলে থাকাও আর সম্ভব হলো না। তিনি আরও দূরে এক জায়গায় চলে গেলেন এবং শুধু মদীনায় আসতেন জুমার নামাযের জন্য।

এদিকে বকরির সংখ্যা বেড়েই চলল। পরে তিনি জুমার নামাযও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। জুমার দিন পথিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সংবাদ জিজ্ঞেস করে নিতেন। এ দিকে রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কেরামের নিকট একদিন ছা'লাবার অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। তারা বকরির প্রাচুর্য, ছা'লাবার মদীনা বর্জন এবং ক্রমান্বয়ে জামাত ত্যাগ করার

ইতিবৃত্ত শুনালেন। সব কথা শুনে তিনি তিনবার বললেন, ছা'লাবার দুর্ভোগ! এ সময়েই নিচের আয়াত অবতীর্ণ হয়,

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ.

আপনি তাদের সম্পদ থেকে 'সদকা' গ্রহণ করুন। এর দ্বারা তাদেরকে পবিত্র করুন এবং পরিশোধিত করুন। আর আপনি তাদের জন্য দুআ করুন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক। (সূরা তাওবা : ১০৩)

আল্লাহ তাআলা এতে মুসলমানদের ওপর যাকাত ফরয করে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে জুহাইনা গোত্রের নিকট থেকে এবং এক ব্যক্তিকে সুলাইম গোত্রের নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্য ঠিক করলেন। তিনি যাকাত সম্পর্কিত ফরমান লিখে তাদের নিকট দিয়ে নির্দেশ দিলেন, তোমরা মদীনার বাইরে মুসলমানদের নিকট থেকে যাকাত আদায় করো। ছা'লাবা ইবনে হাতিব এবং বনী সুলাইমের অমুক ব্যক্তির নিকট গিয়ে যাকাত আদায় করবে।

ফরমান নিয়ে উভয় যাকাত উসুলকারী মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথমে ছা'লাবার নিকট গেল এবং তার ধনসম্পদের যাকাত চাইল। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর লিখিত ফরমানও ছা'লাবার সম্মুখে পেশ করল। তিনি বললেন, এটা তো জরিমানা। ভাই এটা জরিমানা। তোমরা আপাতত যাও, অন্য জায়গার কাজ শেষ করে আমার নিকট এসো। অতঃপর তারা উভয়েই সুলাইম গোত্রের লোকটির নিকট গিয়ে যাকাত চাইল। সে শুনামাত্রই উঠে গেল এবং তার উটের পাল থেকে বেছে বেছে সর্বোত্তম উটগুলো যাকাতের জন্য পৃথক করল। এরপর তাদের সামনে উপস্থিত করে বলল, এগুলো যাকাতের উট। উটগুলো দেখে আদায়কারীরা বলল, সবচেয়ে উত্তম উট যাকাতে দেওয়া তোমার ওপর তো ফরয নয়। আমরা এগুলো নেব না। লোকটি অনুরোধ করল, আপনারা এগুলোই নিন। আমি মনের খুশিতে দিচ্ছি এবং এজন্যই এখানে বেছে বেছে নিয়ে এসেছি।

এরপর তারা সব স্থান থেকে যাকাত আদায় করে আবার ছা'লাবার নিকট এসে যাকাত চাইল। ছা'লাবা বলল, তোমরা আমাকে লিখিত আদেশ

দেখাও। আদেশ দেখার পর সে পুনরায় বলল, এটা তো জরিমানা। ভাই এটা জরিমানা। তোমরা আপাতত যাও। আমি একটু ভেবে দেখি।

এরপর আদায়কারীরা মদীনায় ফিরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে হাজির হলে তিনি তাদের কথা বলার আগেই বললেন, ছা'লাবার দুর্ভোগ! তিনি সুলাইম গোত্রের লোকটির জন্য বরকতের দুআ করলেন। এরপর তারা উভয়েই বর্ণনা করল যে, ছা'লাবা এমন আচরণ করেছে এবং এমন কথা বলেছে, আর বনী সুলাইমের লোকটি এই আচরণ করেছে। তখনই ছা'বালা সম্পর্কে কুরআন কারীমের আয়াত অবতীর্ণ হলো,

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ، فَلَمَّآ اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ، فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল, যদি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদের (সম্পদ) দান করেন, তা হলে আমরা অবশ্যই সদকা দিব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদের দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। তাই শাস্তি হিসেবে তিনি তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করে দিলেন, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত। কারণ, তারা আল্লাহর সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ভঙ্গ করেছিল এবং তারা মিথ্যা বলতো। (সূরা তাওবা : ৭৫-৭৭)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিসে তখন ছা'লাবার এক আত্মীয় হাজির ছিল। সে আয়াতটি শুনল এবং ছা'লাবার নিকট গিয়ে বলল, তোমার মা মৃত্যুবরণ করুক! আল্লাহ তাআলা তোমার সম্পর্কে এমন নির্দেশ নাযিল করেছেন। তিনি ছুটতে ছুটতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে এসে আবেদন করলেন, আমি যাকাত দিচ্ছি। আপনি গ্রহণ করুন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমার যাকাত গ্রহণ করতে আল্লাহ তাআলা আমাকে নিষেধ করেছেন। একথা শুনে ছা'লাবা নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি যেমন করেছিলে, তেমনি ফল ভোগ করেছ। আমি যা বলেছিলাম, তা তুমি শুনলে না। তিনি যখন দেখলেন

রাসূলুল্লাহ (স) তার যাকাত কবুল করবেনই না, তখন বাড়িতে ফিরে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের পর আবু বকরের খিদমতে যাকাত উপস্থিত করা হলে তিনিও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর উমরের খিদমতে পেশ করা হলে তিনিও তা প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর ছা'লাবা ইন্তেকাল করেন। (তাফসিরে তাবারি : ৬ : ১০ : ২৩৬, আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৮ : ২১৮, আবু নুআইম : মারিফাতুস সাহাবা : ১ : ৪৯০, শুআবুল ঈমান, বায়হাকি)

উপর্যুক্ত ঘটনা থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, ধনসম্পদের ঔদ্ধত্য ও দুর্ভাগ্য কতটুকু। দারিদ্র্যে বরকত এবং প্রাচুর্যে অমঙ্গল নিহিত বিধায় রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্য এবং পরিবারবর্গের জন্য দারিদ্র্যকে পছন্দ করেছেন।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে সম্মানীত মনে করতেন। একবার তিনি আমাকে বললেন— হে ইমরান! তুমি আমার নিকট মর্যাদাশালী ব্যক্তি। আমার আদরের দুলালী ফাতেমা অসুস্থ। তাকে দেখতে চাইলে তুমি আমার সাথে চলো। আমি আরয করলাম, খুব ভালো। এরপর আমরা উভয়েই ফাতেমার ঘরে গিয়ে দরজায় টোকা দিলাম। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আসসালামু আলাইকুম। আমি ভেতরে আসব? ফাতেমা জবাব দিলেন, আসুন। রাসূলুল্লাহ (স) আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমি এবং আমার সাথী উভয়েই আসব? প্রশ্ন হলো, আপনার সাথী কে? তিনি বললেন, ইমরান ইবনে হুসাইন। ফাতেমা আরয করলেন, আল্লাহর কসম! যিনি আপনাকে নবীরূপে পাঠিয়েছেন, আমার নিকট একটি "আবা" (আরবদেশীয় বিশেষ কাপড়) ব্যতীত অন্য কোনো কাপড় নেই। রাসূলুল্লাহ (স) হাতে ইশারা করে বললেন, সেটি এভাবে শরীরে জড়িয়ে নাও। তিনি বললেন, শরীর তো ঢেকে নিয়েছি। এখন মাথা কীভাবে ঢাকব? রাসূলুল্লাহ (স) নিজের পুরনো চাদরটি তাঁর নিকট নিক্ষেপ করে বললেন, এটা দিয়ে মাথা ঢেকে নাও। এরপর ফাতেমা আমাদেরকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) ভিতরে গিয়ে বললেন, হে কলিজার টুকরা! আসসালামু আলাইকুম, আজ তোমার অবস্থা কেমন? তিনি আরয করলেন, আমার ব্যথা আছে। এ ব্যথার সাথে আরেকটি ব্যথা যোগ হয়েছে, আজ আমার নিকট খাওয়ার কিছুই নেই। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছি। রাসূলুল্লাহ (স) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে কলিজার

টুকরা! তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। আল্লাহর কসম! আমি তিনদিন ধরে উপোস আছি। আল্লাহর নিকট তোমার চেয়ে আমার মর্যাদা বেশি। আমি আল্লাহর নিকট চাইলে তিনি আমাকে ক্ষুধার্ত রাখতেন না। কিন্তু আমি দুনিয়ার ওপর আখিরাতকে প্রাধান্য দিয়েছি। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) ফাতেমা (রা)-এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, তোমাকে সুসংবাদ। তুমি জান্নাতী রমনিদের নেত্রী। ফাতেমা (রা) আরয করলেন, তাহলে ফেরাউন-পত্নী আছিয়া, ইমরান-তনয়া মারইয়াম ও খুয়াইলিদ-তনয়া খাদীজা কোথায় থাকবেন? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তারা নিজ নিজ যুগের মহিলাদের নেত্রী ছিলেন। আর তুমি তোমার যুগের মহিলাদের নেত্রী। তোমরা প্রত্যেকে পুষ্প-রাগ নির্মিত ও চুনি-পান্না খচিত ঘরে বসবাস করবে। তাতে কোনো ধরনের কষ্ট ও হট্টগোল থাকবে না। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন, আলীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। আমি এমন ব্যক্তির সাথে তোমার বিয়ে দিয়েছি, যে দুনিয়াতে নেতা এবং পরকালেও নেতা হবে। (আল-আজুররি, আশ শারিআহ : ১৬০৭, সংক্ষিপ্তরূপে উল্লেখ করেছেন : আহমাদ : আল মুসনাদ : ৫ : ২৬, আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ২০ : ২২৯, তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৪২ : ১২৬)

এবার একটু ভেবে দেখুন, ফাতেমা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর আদরের দুলালী হয়েও কতটা দরিদ্র জীবনযাপন করেছেন এবং কীভাবে ধনসম্পদ বর্জন করেছেন। যে কেউ নবী অলীগণের অবস্থা ও তাদের বাণীসমূহ অনুধাবন করবে, সে অবশ্যই জানতে পারবে, ধনসম্পদ না থাকা, থাকার তুলনায় উত্তম। যদিও তা দান-খয়রাতেই ব্যয়িত হয়। কারণ, হক আদায় করা, কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত থাকা এবং দান-খয়রাতে ব্যয় করা সত্ত্বেও ধন-সম্পদের নিম্নতম ক্ষতি এই যে, নিয়ত তারই সংগ্রহে সদা মশগুল থাকে এবং আল্লাহর যিকির হয় না। কারণ, মন ও মস্তিষ্ক খালি থাকলেই যিকির হতে পারে। ধনসম্পদের ব্যস্ততায় মন চিন্তা শূন্য থাকে না।

জারীর (র) লাইছ (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ঈসা (আ)-এর সঙ্গ লাভের জন্য তাঁর সাথে রওয়ানা হলো। তিনি তাকে সাথে নিয়ে নদীর তীরে পৌঁছে নাশতা করলেন। তাঁর সাথে ছিল তিনটি রুটি। দুটি খেলেন এবং একটি বাকী রইল। ঈসা (আ) নদীতে গিয়ে পানি পান করে ফিরে এসে দেখেন, অবশিষ্ট রুটিটি নেই। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, রুটি

কে নিল? লোকটি বললো, আমি জানি না। এরপর তিনি তাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথে একটি হরিণী পাওয়া গেল। তার সঙ্গে ছিল দুটি বাচ্চা। তিনি একটিকে ডাকলে সে কাছে এল। তিনি বাচ্চাটিকে জবাই করে ভাজা করলেন এবং উভয়ে মিলে খেলেন। এরপর বাচ্চার অবশিষ্টাংশকে বললেন, তুমি আল্লাহর হুকুমে জীবিত হয়ে যাও বাচ্চাটি সাথে সাথে জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে জঙ্গলে চলে গেল। এরপর ঈসা (আ) লোকটিকে বললেন, সেই আল্লাহর কসম! যিনি আমাকে এ মুজিযা দিয়েছেন। বলো, রুটি কে নিয়েছে? সে জবাব দিল, আমি জানি না। এরপর তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে একটি ঝরনার কাছে এলেন। তিনি তার হাত ধরে পানির উপর দিয়ে হেঁটে অপর পাড়ে চলে গেলেন। এরপর লোকটিকে বললেন, তোমাকে এ মুজিযা প্রদর্শনকারী আল্লাহর কসম দিচ্ছি, বলো, রুটি কে খেয়েছে? সে পূর্বের ন্যায় বলল, আমি জানি না। এরপর উভয়ে এক জঙ্গলে গেলেন। সেখানে বসে ঈসা (আ) মাটি ও বালু একত্রিত করতে লাগলেন। এরপর একটি স্তূপ তৈরি করে বললেন, আল্লাহর হুকুমে স্বর্ণ হয়ে যাও। অমনি স্তূপটি স্বর্ণ হয়ে গেল। তিনি সেটিকে তিন ভাগ করলেন এবং বললেন, এক ভাগ আমার, এক ভাগ তোমার এবং এক ভাগ তার, যে রুটি খেয়েছে। এ কথা শোনামাত্র লোকটি বলে উঠল, রুটি আমি খেয়েছি। তিনি বললেন, এগুলো সব তুমিই রাখো। এরপর ঈসা (আ) লোকটিকে স্বর্ণস্তুপের কাছে রেখে নিজ গন্তব্য পথে চলে গেলেন। লোকটি স্বর্ণের স্তূপ নিয়ে জঙ্গলে রয়ে গেল। এমন সময় দু'জন লোক তার নিকটে এল এবং তাকে হত্যা করে স্বর্ণস্তূপ নিয়ে যেতে চাইল। সে বলল, মিছামিছি ঝগড়া করার দরকার কি? এটি আমরা সমান ভাগে ভাগ করে নেব। আগে এক ব্যক্তি গ্রামে গিয়ে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসুক। তাই তাদের একজন খাবার আনতে চলে গেল। যেতে যেতে সে ফন্দি আঁটল, যদি খাবারে বিষ মিশিয়ে দেই, তাহলে দু'জনই মারা যাবে এবং গোটা স্বর্ণস্তূপটি আমিই পেয়ে যাব। তাই সে খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিল। এদিকে দু'জন পরামর্শ করল, যদি তৃতীয় জন মারা যায়, তাহলে স্বর্ণস্তূপ আধাআধি আমাদের ভাগে পড়বে। কাজেই সে খাবার নিয়ে আসার সাথে সাথেই তাকে মেরে ফেলা উচিত। পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন তৃতীয় ব্যক্তি খাবার নিয়ে সেখানে আসলো, তখন দু'জন মিলে তাকে মেরে ফেলল এবং তার নিয়ে আসা খাবার তারা দু'জন খেয়ে নিল। বিষক্রিয়ার ফলে তারাও

সেখানে লুটিয়ে পড়ল। স্বর্ণস্তূপ যেমন ছিল, তেমনি জঙ্গলে পড়ে রইল। তার আশেপাশে পড়ে থাকলো তিন ব্যক্তির লাশ। ঈসা (আ) ফেরার পথে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সঙ্গীদেরকে বললেন, এ হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থা। তোমরা এ দুনিয়া থেকে বেঁচে থাকো। (আয যুহদ, ইবনু আবিদ দুনিয়া : ১৭৭, তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির : ৪৭ : ৩৯৪)

কথিত আছে, যুলকারনাইন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের নিকট অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি বলতে কিছুই ছিল না। তারা কবর খনন করে রেখেছিল। সকালে সব কবর ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখত এবং এগুলোর পাশে নামায পড়ত। জীবিকাস্বরূপ তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো চরে ঘাস খেত। আল্লাহর কুদরতে সব রকম ঘাস তাদের জন্য সেখানে বিদ্যমান ছিল। যুলকারনাইন তাদের সরদারের নিকট এক লোক পাঠিয়ে বললেন, বাদশাহ যুলকারনাইন তোমাদেরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। লোকটি খবর দিলে সরদার বলল, আমার কোনো দরকার নেই। যদি তার কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাকে আমার নিকট আসতে বলো। যুলকারনাইন এ জবাব শুনে বললেন, সে ঠিকই বলেছে। তিনি স্বয়ং সরদারের নিকট গিয়ে বললেন, আমি তোমাকে ডেকেছিলাম। তুমি যেতে অস্বীকার করায় আমি নিজেই এসে পড়েছি। সরদার বলল, আমার কোনো দরকার থাকলে অবশ্যই যেতাম। যুলকারনাইন বললেন, অমি তোমাদের যে অবস্থা দেখছি, তেমন ইতঃপূর্বে কারও দেখিনি। দুনিয়ার কোনো বস্তু তোমাদের নিকট নেই কেন? তোমরা সোনা-রূপা উৎপন্ন করো না কেন? এতে তো তোমাদের জীবনে সুখ আসত। সরদার উত্তর দিল, আমরা সোনা-রূপাকে অশুভ মনে করি। কেননা, এগুলো যে-ই পায়, তার মন আরও শ্রেষ্ঠ বস্তু পাওয়ার নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠে। যুলকারনাইন বললেন, তাহলে তোমরা কবর খনন করে রেখেছ কেন? সে বলল, এ উদ্দেশ্যে যে, যদি দুনিয়ার লোভ আমাদেরকে পেয়েই বসে, তাহলে কবরগুলো দেখে তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারব এবং দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকার আশা আমাদের মন থেকে চলে যাবে। যুলকারনাইন জিজ্ঞেস করলেন, এবার বলো, তোমরা ঘাস খাও কেন? পশুপালন করে সেগুলোর দুধ, মাংস ইত্যাদি খাও না কেন? সরদার বলল, আমরা আমাদের পেটকে পশুদের কবর বানাতে চাই না। মাটিতে উৎপন্ন ঘাস, শাক-সবজি দিয়েই প্রয়োজন মিটে যায়। জীবন ধারণের জন্য

সামান্য জিনিসই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এরপর সে হাত বাড়িয়ে যুলকারনাইনের পিছন থেকে একটি খুলি তুলে নিল এবং জিজ্ঞেস করল, আপনি বলতে পারেন এটা কার খুলি? যুলকারনাইন বললেন, আমি কি করে জানব? সে বলল, সে ছিল দুনিয়ার একজন সম্রাট। আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়ার রাজত্ব দান করেছিলেন। কিন্তু তাকে মানুষের উপর অত্যাচার-অবিচার করতে দেখে মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দিলেন। এখন সে একটি ঢিলের মতো পড়ে রয়েছে। তার সমস্ত কর্মকাণ্ড আল্লাহ জানেন। কিয়ামতের দিন সে তার পরিণাম ফল ভোগ করবে। এরপর আরও একটি পুরনো খুলি নিয়ে সরদার বলল, এটা কার খুলি বলতে পারেন? যুলকারনাইন বললেন, না। সে বলল, এটা আরেক রাজার খুলি, একটু আগে যার খুলিটি দেখলেন তার পরেই তার শাসনকাল ছিল। সে পূর্বসূরির জুলুমের কথা জানত। সে মানুষের প্রতি বিনয় ও ন্যায়বিচার করেছে। আল্লাহ তাআলা তার আমলও সংরক্ষণ করে রেখেছেন। হাশরের দিন সে তার প্রতিদান পাবে।

এরপর সরদার যুলকারনাইনের মস্তকের দিকে লক্ষ করে বলল, হে যুলকারনাইন! এ খুলিটিও আগের দুটি খুলির মতো পড়ে থাকবে। সুতরাং আপনি ভেবে-চিন্তে কাজ করুন। যুলকারনাইন বললেন, হে সরদার! তুমি আমার সাথে চলো, আমি তোমাকে আমার ওয়ারিস, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সাম্রাজ্যের অংশীদার করব। সরদার বলল, আমার এবং আপনার একই স্থানে একত্রে থাকা সম্ভব নয়। কারণ, আপনার নিকট অগাধ ধনৈশ্বর্য ও বিপুল বিলাস-বৈভব থাকার কারণে জনসাধারণ আপনার দুশমন। অপরদিকে সকল মানুষ আমার বন্ধু। শত্রুতার কারণ হচ্ছে দুনিয়া। আমি দুনিয়াকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছি। এ কথায় যুলকারনাইন তার নিকট থেকে চলে গেলেন। সরদারের সাথে তার আলাপচারিতাকে চরম বিস্ময়, শিক্ষা ও নসীহত হিসেবে গ্রহণ করলেন। (আল আযামাহ, আবুশ শায়খ : ৯৫৮; আল-মুনতাজিম, ইবনুল জাওজি : ১ : ১৮৫)

এ ঘটনার বর্ণনা থেকেও ধনৈশ্বর্যের ক্ষতি ও বিপদাপদ সম্পর্কে জানা যায়। (মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের ধনসম্পদের ক্ষতি হতে হেফাযত করুন। আমিন!)

অহংকার ও আত্মপ্রীতির নিন্দা

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِيْ وَالْعَظَمَةُ اِزَارِيْ فَمَنْ نَازَعَنِيْ قَصَمْتُهُ.

অর্থাৎ, অহংকার আমার চাদর এবং মহত্ত্ব আমার পায়জামা। যে লোক এ দুটি বিষয়ে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে, আমি তাকে ধ্বংস করে দেব। (সহিহ মুসলিম : ২৬২০; আবু দাউদ : ৪০৯০)

অপর এক হাদিসে আছে–

ثَلَاثُ مُهْلِكَاتٍ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ.

অর্থাৎ, তিনটি বিষয় ধ্বংসকারী। এক, কৃপণতা, মানুষ যার অনুগত হয়। দুই, মানবিক প্রবৃত্তি, মানুষ যার অনুগামী হয়। তিন, আত্মপ্রীতি। (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান : ৭৩১; তবারানি, মুজামে আওসাত : ৫৪৪৮)

সুতরাং, অহমিকা ও আত্মপ্রীতি মারাত্মক ব্যাধি। অহংকারী ও আত্মপ্রিয় মানুষ অসুস্থ এবং আল্লাহর দুশমন। ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থের উক্ত এক চতুর্থাংশে 'মুহলিকাত' তথা ধ্বংসকারী বিষয়সমূহ বর্ণনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিধায় অহংকার ও আত্মপ্রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা অত্যন্ত জরুরি। নিচে দুটি বিষয় পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রথম পর্বে অহংকারের বিভিন্ন দিক আলোচিত হবে। যেমন, অহংকার নিন্দা। দর্প ভরে চলা। বিনয় ও নম্রতার ফযিলত। অহংকারের প্রকৃতি ও লাভ-ক্ষতি। অহংকারকৃত ব্যক্তির মর্যদা এবং অহংকারের পরিণতি। অহংকারের প্রকার। কেন অহংকার করে? অহংকার রোগ দূর করা ও বিনয়ের গুণ অর্জনের উপায়।

অহমিকার নিন্দা

পবিত্র কুরআনের বহু সূরায় আল্লাহ তাআলা অহমিকা ও আত্মঅহংকারীদের নিন্দা করেছেন। যেমন, ইরশাদ হয়েছে,

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রদর্শন করে, তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে রাখি। (সূরা আরাফ : ১৪৬)

وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا.

আর কেউ তাঁর ইবাদতকে ছোটো মনে করলে এবং দম্ভ করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন। (সূরা নিসা আয়াত : ১৭২)

اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ.

তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে এবং তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য দেখাতে, সেজন্য আজ তোমাদের অবমাননার শাস্তি দেওয়া হবে। (সূরা আনআম : ৯৩)

فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

কতই না নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাসস্থল। (সূরা যুমার : ৭২)

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ.

এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির অন্তরে মোহর করে দেন। (সূরা মুমিন : ৩৫)

وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ.

তারা (রাসূলগণ) বিজয় কামনা করল এবং প্রত্যেক উদ্ধত স্বৈরাচারী ব্যর্থ মনোরথ হলো। (সূরা ইবরাহিম : ১৫)

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِيْنَ.

নিশ্চয় তিনি অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা নাহল : ২৩)

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا.

তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা গুরুতররূপে সীমালংঘন করেছে । (সূরা ফুরকান : ২১)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মুমিন : ৬০)

মোটকথা, অহংকারের নিন্দা কুরআন মাজীদের বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ.

যার মনে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না এবং যার মনে সরিষাদানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (সহিহ মুসলিম : ১৪৮; জামে তিরমিযি : ১৯৯৮)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (স) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, অহংকার আমার চাদর এবং মহত্ব আমার পায়জামা। যে লোক এদুটি বিষয়ে আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করবে, আমি তাকে কোনো ভ্রুক্ষেপ ব্যতীত জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। (মুসলিম : ২৬২০)

আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান বর্ণনা করেন, একদা আবদুল্লাহ ইবনে আমর ও আবদুল্লাহ ইবনে ওমর মারওয়া নামক স্থানে একত্র হলেন। সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর প্রথম জন চলে গেলেন এবং দ্বিতীয় জন

কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমর আমাকে একটি হাদিস শুনিয়ে গেলেন যে, নবী কারীম (স)-কে তিনি বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে উপুড়মুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (মুসনাদে আহমদ : ২ : ২১৫)

অন্য এক হাদিসে রয়েছে— মানুষ নিজেকে এত উচ্চে নিয়ে যায় যে, পরিণামে সে অহংকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ফলে সে ওই আযাবের অংশীদার হয়, যে আযাব অহংকারীরা পায়। (জামে তিরমিযি : ২০০০)

একদিন সুলাইমান (আ) মানুষ, জিন ও পশুপাখিদের ময়দানে একত্র হতে আদেশ করলেন। আদেশ মতে দুলাখ মানুষ, দুলাখ জিন একত্র হলো। এরপর সুলাইমান (আ) এত উঁচুতে উঠলেন যে, ফেরেশতাদের তাসবীহ তিনি শুনতে পেলেন। এরপর তাঁকে নিচে নামানো হলো, এমনকি তাঁর পদযুগল সমুদ্র স্পর্শ করল। সেখানে তিনি এই আওয়াজ শুনতে পেলেন— যদি তোমাদের প্রভু অর্থাৎ, সুলাইমানের অন্তরে বিন্দু পরিমাণও অহংকার থাকে, তাহলে তাকে যতটুকু উপরে উঠানো হয়েছে, তার চেয়েও বেশি পাতালে নামিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে জাহান্নাম হতে একটি গর্দান (মাথা) বের হবে। এর দুটি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে। দুটি কান থাকবে, যা দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহ্বা থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে। সে বলবে, তিন ধরনের লোকের জন্য আমাকে নিয়োজিত করা হয়েছে : ১. প্রতিটি অবাধ্য অহংকারী জালিমের জন্য। ২. আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কোনো কিছুকে যে ইলাহ বা মাবুদ বলে ডাকে তার জন্য। ৩. ছবি অঙ্কনকারীদের জন্য। (জামে তিরমিযি : ২৫৭৪)

হাদিসে বর্ণিত আছে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যে আলোচনা হলো। জাহান্নাম বলল, আমি অহংকারী লোকদের পাব। জান্নাত বলল, তাহলে আমি কী দোষ করলাম যে, দুর্বল ও অক্ষমরাই আমার মধ্যে স্থান পাবে? আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে বললেন, তুমি আমার রহমত। আমি যাকে ইচ্ছা তোমার দ্বারা রহমত দেব। এরপর জাহান্নামকে বললেন, তুই আমার আযাব। আমি যাকে ইচ্ছা তোর দ্বারা আযাব দেব এবং জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়কে পরিপূর্ণ করে দেব। এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে— খারাপ প্রকৃতির বান্দা সে-ই লোক, যে জবরদস্তি ও বাড়াবাড়ি করে এবং

সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভুলে যায়। দুষ্ট প্রকৃতির বান্দা সে-ই লোক, যে জুলুম অহংকার করে এবং মহান আল্লাহর প্রতি আগ্রহী হয় না। মন্দ বান্দা সে-ই, যে ভুল ও ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত থাকে এবং কবরে গিয়ে মাটি হয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে না। অধম বান্দা সে-ই, যে অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং শুরু ও পরিণতির কথা কোনোদিনও ভেবে দেখে না। (জামে তিরমিযি : ২৪৪৮)

সাবিত (রা) বলেন, কোনো এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খিদমতে নিবেদন করল, অমুক লোক অতিশয় অহংকারী। তিনি বললেন, তার কি মৃত্যু নেই?

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মৃত্যুর সময়ে নূহ (আ) তাঁর দুই ছেলেকে ডেকে বললেন, আমি তোমাদের দুটি বিষয় থেকে নিষেধ করছি এবং দুটি বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি। শিরক ও অহংকার থেকে নিষেধ করছি এবং কালেমায়ে তাইয়েবার আদেশ দিচ্ছি। কারণ, আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু যদি এক পাল্লায় রাখা হয় এবং কালেমায়ে তাইয়েবা অন্য পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে কালেমায়ে তাইয়েবার পাল্লাই ভারি হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়ের আদেশ দিচ্ছি, তা হচ্ছে "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী" বেশি বেশি পাঠ করবে। কেননা, এর মাধ্যমেই প্রত্যেককে রিযিক দেওয়া হয়। (মুসনাদে আহমদ : ২ : ১৬৯)

ঈসা (আ) বলেন, সৌভাগ্যবান সেই বান্দা, যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাব শিক্ষা দেন এবং যে অহংকারমুক্ত হয়ে দুনিয়া ছেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জাহান্নামি হচ্ছে যে ব্যক্তি অহংকারী, সম্পদ জমাকারী, দান বিমুখী আর জান্নাতি হচ্ছেন পরাস্ত দরিদ্র ব্যক্তি। (মুসনাদে আহমদ : ২ : ২১৪)

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পরকালে আমার নিকটবর্তী ও প্রিয়পাত্র হবে ওই সকল লোক, যাদের চরিত্র সুন্দর এবং আমার থেকে দূরে ও ক্রোধের পাত্র হবে ওই সকল লোক, যারা বাচাল ও বড় মুখে কথা বলে।

অন্য এক হাদিসে আছে— কিয়ামতের দিন অহংকারীরা পিঁপড়ার আকৃতিতে পুনরুত্থিত হবে। মানুষ এদের পদতলে পিষ্ট করে চলবে।

যাবতীয় লাঞ্ছনা তাদের ঘিরে ফেলবে। জাহান্নামীদের পুঁজ ও কাদা পান করতে দেওয়া হবে। (জামে তিরমিযি : ২৪৯২)

আবু হুরায়রার (রা) থেকে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, প্রভাবশালী ও অহংকারী লোক কিয়ামতে পিঁপড়ার আকৃতিতে উত্থিত হবে। মানুষ তাদেরকে পদতলে পিষ্ট করবে। কারণ তারা আল্লাহকে দুনিয়াতে হেয় জ্ঞান করেছিল।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (র) বলেন, আমি বিলাল ইবনে আবি বুরদার নিকট গিয়ে বললাম, তোমার বাবা আমার নিকট তার পিতার বর্ণনায় নবী কারীম (স)-এর এই হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন— জাহান্নামে 'হাবহাব' নামক একটি জঙ্গল রয়েছে। আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অহংকারীরা তাতে বসবাস করুক। সুতরাং হে বিলাল! নিজেকে অহংকারমুক্ত রাখো। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, নিশ্চয় জাহান্নামে একটি স্থান রয়েছে, যেখানে অহংকারীদের নিক্ষেপ করা হবে এবং তার দরজা বন্ধ করে রাখা হবে।

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে আল্লাহ! আমি অহংকারের ফুৎকার থেকে পানাহ চাই।

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে— যে লোক তিনটি বিষয় থেকে মুক্ত হয়ে মারা যাবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে- এক, অহংকার, দুই, করয এবং তিন, খিয়ানত তথা বিশ্বাস ভঙ্গকরণ। (জামে তিরমিযি : ১৫৭২)

গর্ব-অহংকারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে অনেক মনীষী মূল্যবান কথা বলেছেন।

আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, এক মুসলমান যেন অপর মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন না করে। কেননা, মুসলমানদের মধ্যে যে ছোটো, সে আল্লাহর নিকট বড়। ওয়াহাব (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা 'জান্নাতে আদন' সৃষ্টি করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, অহংকারী ব্যক্তির জন্য তুমি হারাম। আহনাফ বিন কায়েস মুসআব বিন যুবায়েরের সাথে বসতেন। একদা তিনি মুসআবের কাছে আসলে দেখতে পান যে, তিনি পা ছড়িয়ে বসে রয়েছে। আহনাফ তার পা বরাবর বসে গেলেন। হঠাৎ করে তার পাশে ভিড় দেখা গেল। তিনি লক্ষ করলেন যে, এতে করে তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, বনী আদমের ওপর অবাক লাগে যে তারা অহংকার করে অথচ সে পেশাবের স্থান থেকে দুইবার বের হয়েছে।

হাসান (র) বলেন, আশ্চর্যের বিষয়! মানুষ প্রতিদিন একবার অথবা দুবার নিজ হাতে শৌচকার্য করে, এরপরও অহংকার করে এবং আকাশ ও জমিনে যিনি প্রভাবশালী তাঁর মুকাবিলা করে। (আত তাওয়াযু ওয়াল খুমুল : ২০৯)

মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী (রা) বলেন, মানুষের অন্তরে যে পরিমাণে দাম্ভিকতা আসে, সেই পরিমাণ জ্ঞানবুদ্ধি কমে যায়। গর্ব অল্প হলে বুদ্ধির ক্ষতিও অল্প হবে এবং বেশি হলে বেশি। (আত তাওয়াযু ওয়াল খুমুল : ২২৬)

সালমান (রা)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, সেই নিকৃষ্ট কাজ কোনটি যার ফলে সৎকর্ম কল্যাণময় হয় না? তিনি বললেন, অহংকার। (আত তাওয়াযু ওয়াল খুমুল : ২২৯)

নুমান ইবনে বশীর (র) বলেন, শয়তানের অনেক ফাঁদ আছে। এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে আল্লাহর নিয়ামত পেয়ে অহংকার করা এবং মনের ইচ্ছার অনুসরণ করা। (আল আদাবুল মুফরাদ : ৫৫৩)

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই মারাত্মক পীড়া থেকে হিফাজত করুন। আমিন!

পোশাক ঝুলিয়ে বা দর্প ভরে চলা

নবী কারীম (স) বলেন,

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

এমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ নজর দিবেন না, যে লুঙ্গি হেঁচড়িয়ে গর্ব করে চলে। (সহিহ বুখারী : ৫৭৮৮)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এক ব্যক্তি তার দুটি চাদর পরিধান করে অংহকারের সাথে চলাফেরা করছিল এবং নিজেকে সে ভালো মনে করছিল। হঠাৎ আল্লাহ তাকে জমিনে ধসিয়ে দিলেন। কিয়ামত অবধি সে মাটিতে ধসতে থাকবে। (সহিহ বুখারী : ৫৭৮৮)

অপর হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গর্বের সঙ্গে পরনের কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে চলাফেরা করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না।

যায়েদ ইবনে আসলাম (রা) বর্ণনা করেন— আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ নতুন জামা-কাপড় পরে তাঁর নিকট দিয়ে চলে গেলেন। তিনি বললেন, বেটা! লুঙ্গি আরও উঁচুতে পরিধান করো। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি গর্ব করে লুঙ্গি টেনে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না। (আত তাওয়াযু ওয়াল খুমুল : ২৩৯)

বর্ণিত আছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (স) নিজের হাতের তালুতে থুতু নিক্ষেপ করলেন। এরপর তাতে আঙুল রেখে বললেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার হাত থেকে বেঁচে যাবে? আমি তোমাকে এরই ন্যায় বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর যখন তোমাকে বলিষ্ঠ করেছি, তখন এমন সব জামা কাপড় পরে গর্ব করে চলো যে, পৃথিবী পর্যন্ত কাঁদতে থাকে। তুমি ধনসম্পদ জমা করো এবং কাউকে কিছু দাও না। যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, তখন বলতে আরম্ভ কর, আমি দান-খয়রাত করব। তখন কি দান-খয়রাতের সময়? (সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৭০৭)

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার উম্মত যখন অহংকার করে চলতে আরম্ভ করবে এবং পারস্য ও রোমবাসীরা তাদের সেবা করতে থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের একজনকে অপরের ওপর চাপিয়ে দেবেন। (জামে তিরমিযি : ২৩৬১)

এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, যে ব্যক্তি নিজের মনে বড় সাজে এবং গর্ব ভরে চলে, সে যখন আল্লাহর নিকট যাবে, তখন আল্লাহ তার প্রতি রাগান্বিত হবেন। (মুসনাদে আহমদ : ২ : ১১৮)

আবু বকর হুযালী (র) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা কয়েকজন হাসান বসরী (র)-এর পাশে বসা ছিলাম। এমন সময় শাসক ইবনে আহতাম সে পথ দিয়ে টয়লেটে যাচ্ছিল। তার গায়ে ছিল রেশমী জামা, যা পায়ের গোছার ওপর ভাঁজে ভাঁজে রাখা ছিল। তার চলনভঙ্গিতে অহংকার ফুটে উঠেছিল। হাসান বসরী (র) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই নাক বাড়ানো, কোমর বাঁকানো এবং গ্রীবা ঘুরানোর জন্য আপসোস! হে বোকা! তুমি ডানে-বামে ঘুরে ঘুরে কী দেখছ? তোমার ডানে-বামে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে, সেগুলোর তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোনি। না

মুখে তা উল্লেখ করেছো এবং না এসবের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশিত বিধান পালন করেছ। আল্লাহর কসম! মানুষ এভাবে চলে যেমন পাগল চলাফেরা করে। তার এটা জানা নেই যে প্রতিটি অঙ্গে আল্লাহর নিয়ামত বিরাজমান আর শয়তান সে অঙ্গসমূহ অনৈতিক কাজে ব্যবহারে ব্যস্ত।

ইবনে আহতাম এ কথা শুনে ফিরে এল এবং তার নিকট ক্ষমা চাইতে লাগল। তিনি বললেন, আমার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে না। আল্লাহর কাছে তাওবা করো। তুমি কি আল্লাহ তাআলার এই উক্তি পাঠ করোনি—

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا.

ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে চলো না। তুমি তো কখনোই ভূমি বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনোই পাহাড়সম হতে পারবে না। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৩৭)

একদিন উত্তম পোশাক পরিহিত এক যুবক হযরত হাসান বসরী (র)-এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডেকে বললেন, মানুষ তার যৌবন ও সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করে। মনে করা উচিত যে, কবর শরীর ঢেকে ফেলেছে, কৃতকর্ম সামনে এসেছে। যাও, অন্তরের চিকিৎসা করাও। বান্দার অন্তর সংশোধিত হোক— এটাই আল্লাহ তাআলার কাম্য।

ইসলামের ইতিহাসে বর্ণিত আছে, খলিফা হওয়ার পূর্বে ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) হজ করেন। তাউস (র) তাঁর চালচলনে সামান্য অহমিকা দেখতে পেলেন। তিনি তার পেটে আঙুল দিয়ে খোঁচা মেরে বললেন, যার পেট বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ, তার চালচলন এমন হয় না। ওমর (র) ক্ষমা চেয়ে বললেন, চাচা! চালচলন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার মুরুব্বী আমার প্রতিটি অঙ্গে প্রহার করেছে।

মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসে (র) ছেলেকে অহংকার করতে দেখে কাছে ডেকে বললেন, তুমি কে, জানো? তোমার মাকে আমি দু শ দিরহাম দিয়ে কিনে এনেছিলাম। আর তোমার পিতা এমন যে, আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক বেশি সৃষ্টি না করলেই ভালো হতো।

বর্ণিত আছে, মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ (র) মুহাল্লাবকে রেশমী জুব্বা পরিধান করে গর্ব করতে দেখে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার এই

চলনকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল পছন্দ করেন না। মুহাল্লাব বলল, আপনি জানেন, আমি কে? মুতাররিফ বললেন, হ্যাঁ, জানি। প্রথমে তুমি নাপাক বীর্য ছিলে এবং পরিণামে নাপাক মাটি হয়ে যাবে। বর্তমানে ময়লা বহন করে ফিরছ। মুহাল্লাব এ কথা শুনে চলে গেল এবং গর্ব পরিত্যাগ করল।

আমরা যেখানে অহংকার ও গর্বের নিন্দা লিপিবন্ধ করেছি, সেখানে কিছুটা বিনয়ের ফযিলত লেখাও সমীচীন মনে করছি।

বিনয় ও নম্রতা

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ.

ক্ষমা করার কারণে আল্লাহ তাআলা শুধু বান্দার সম্মানই বৃদ্ধি করেন এবং আল্লাহর জন্যে যে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন। (সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮)

হাদিসে আছে, সব মানুষের সাথে দুজন ফেরেশতা রয়েছেন। তারা লাগামের সাহায্যে তাকে নিয়ন্ত্রণ করেন। যদি সে ব্যক্তি নিজেকে উঁচু করে, তাহলে ফেরেশতারা লাগাম টেনে ধরে বলেন, হে আল্লাহ! আপনি এই ব্যক্তিকে নিচু করে দিন। আর যদি বিনয় ও আনুগত্য করে, তাহলে ফেরেশতারা দুআ করে বলে, হে আল্লাহ! একে উঁচু করুন। আরও বলা হয়েছে— সে ব্যক্তি সুখী, যে গরিব না হয়েও বিনয় করে, সৎপথে উপার্জিত সম্পদ ব্যয় করে, গরিব-দুখীদের প্রতি দয়া করে এবং জ্ঞানীদের সম্মান করে।

আবু সালামা মাদীনী (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার মসজিদে কুবায় রাসূলুল্লাহ (স) রোযা অবস্থায় অবস্থান করছিলেন। ইফতারের সময় আমরা এক পিয়ালা দুধের সাথে কিঞ্চিত মধু মিশিয়ে পেশ করলাম। তিনি তা মুখে দিয়ে যখন মধুর স্বাদ অনুভব করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? আমরা বললাম, দুধের সঙ্গে স্বল্প পরিমাণ মধু মিশ্রিত করেছি। তিনি পিয়ালা রেখে দিলেন এবং বললেন, আমি একে হারাম করি না। এরপর তিনি বললেন,

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ وَمَنِ اقْتَصَرَ اَغْنَاهُ وَمَنْ بَزَرَ اَفْقَرَهُ اللّٰهُ وَمَنْ ذَكَرَ اللّٰهَ اَحَبَّهُ اللّٰهُ.

যে আল্লাহর ওয়াস্তে বিনীত হয়, আল্লাহ তাকে উঁচু (মর্যাদা দান) করেন। যে অহংকার করে আল্লাহ তাকে নিচে নামিয়ে দেন। যে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে সম্পদশালী করেন। যে অপচয় করে, আল্লাহ তাকে ফকির বানান, আর যে আল্লাহর যিকির করে আল্লাহ তাকে বন্ধু করে নেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) কয়েকজন সাহাবীর সাথে বসে খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক ভিক্ষুক আসল, তার শরীরে এমন একটি রোগ ছিল যার কারণে সবাই ঘৃণা করত। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিলেন এবং তাকে নিজের পাশে বসালেন এবং তাকে খাবার খেতে বললেন। এক কুরাইশী ব্যক্তি তার সাথে খেতে সংকোচ বোধ করতে লাগল। পরবর্তী সময় সে ওই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।

এক হাদিসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আমার রব আমাকে দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার এক্তিয়ার (স্বাধীনতা) দিলেন—হয়তো আমি দাস ও রাসূল হব, নতুবা বাদশাহ ও নবী হব। কিন্তু কোনটি বেছে নিব, তা আমার জানা ছিল না। ফেরেশতাদের মধ্যে আমার বন্ধু জিবরাঈল উপস্থিত ছিলেন। আমি তার দিকে মাথা তুলে তাকালে তিনি বললেন, আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করুন। তাই আমি নিবেদন করলাম, আমি দাস ও রাসূল হতে চাই।

মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তাআলা এই মর্মে ওহি পাঠান যে, আমি এমন ব্যক্তির নামায কবুল করি, যে আমার বড়ত্বের সামনে বিনয়ী হয়, আমার বান্দাদের সঙ্গে অহংকার করে না, অন্তরে আমার ভয় রাখে, সর্বক্ষণ আমাকে স্মরণ করে।

এক হাদিসে বলা হয়েছে,

اَلْكَرَمُ التَّقْوٰى وَالشَّرَفُ التَّوَاضُعُ وَالْيَقِيْنُ الْغِنٰى.

মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহভীতি, গৌরব হচ্ছে বিনয় এবং বিশ্বাস হচ্ছে ধনাঢ্য।

ঈসা (আ) বলেন, সুসংবাদ ওই সমস্ত লোকের জন্য, যারা দুনিয়াতে বিনয়ী হয়। তারা কিয়ামতের দিন মিম্বরের ওপর বসবে। সুসংবাদ তাদের জন্য, দুনিয়ায় যারা লোক সমাজে শান্তি স্থাপন করে। কিয়ামতে তারা জান্নাতুল ফিরদাউসের বাসিন্দা হবে। সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা দুনিয়াতে আপন অন্তর পবিত্র রাখে। কিয়ামতে তাদের আল্লাহর দিদার নসিব হবে।

এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি বাণী রয়েছে। তা হলো,

إِذَا هَدَى اللهُ عَبْدًا لِلْإِسْلَامِ وَحَسَّنَ صُوْرَتَهُ وَجَعَلَهُ فِيْ مَوْضِعٍ غَيْرِ شَائِنٍ لَهُ وَرَزَقَهُ مَعَ ذٰلِكَ تَوَاضُعًا فَذَالِكَ مِنْ صَفْوَةِ اللهِ.

যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ইসলামের হেদায়াত দান করেন, তার আকৃতি সুসম করেন, তাকে উপযোগি স্থানে রাখেন এবং তাকে বিনয়ের গুণও দান করেন, এরূপ বান্দা হচ্ছে আল্লাহর নিকটবর্তী বান্দা।

অন্য এক হাদিসে আছে— চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যা শুধু সে ব্যক্তিই পেয়ে থাকে, যাকে আল্লাহ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে নেন— (১) চুপ থাকা, যা ইবাদতের সূচনা, (২) আল্লাহর ওপর নির্ভর করা, (৩) বিনয় এবং (৪) দুনিয়া বিমুখতা।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে লোক বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত মর্যাদা দান করেন।

বর্ণিত আছে, বিনয় মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। তাই বিনয়াবনত হও, আল্লাহ তোমার ওপর রহম করবেন।

এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) খাচ্ছিলেন। এ সময় একজন কালো ব্যক্তি আসলেন। তার চেহারায় গুটি বসন্ত। তাই তিনি যার পাশেই বসেন সে উঠে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে নিজের পাশে বসালেন।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমার কাছে এটা ভালো লাগে যে, মানুষ তার অহংকার দূর করার জন্য পারিবারিক কোনো বিষয় হাতে নিয়ে চলে।

একদা রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদের বললেন, কী হলো, আমি তোমাদের মাঝে ইবাদতের স্বাদ দেখতে পাচ্ছি না! তখন সাহাবিরা বললেন, ইবাদতের স্বাদ কী? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, বিনয়।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যদি আমার উম্মতের বিনয়ীদের দেখতে পাও তাহলে তাদের সাথে বিনয় অবলম্বন করো আর অহংকারীদের সাথে দেখা হলে তাদের সাথে অহংকার করো। কেননা, এটা তাদের অপমানের কারণ হবে।

ওমর (রা) বলেন, বান্দা যখন আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় অবলম্বন করে, তখন আল্লাহ তাআলা তার জ্ঞান-গরিমা বৃদ্ধি করে দেন। আর যখন অহংকার ও জুলুম করে তখন পৃথিবীতেই তাকে ধ্বংস করে দেন এবং হুকুম করেন— দূর হ। আল্লাহ তোকে দূর করে দিয়েছেন। এ ধরনের লোক স্বজ্ঞানে বড় হলেও মানুষের দৃষ্টিতে ছোটো। এমনকি সে তাকে শূকরের থেকেও নিকৃষ্টভাবে।

জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি একদা এমন একটি গাছের নিকট পৌঁছলাম, যেখানে একজন ব্যক্তি শুয়ে ছিলো এবং চামড়া দিয়ে নিজের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছিল। আর যেহেতু সূর্য স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল তাই তার ওপর আলো পড়ছিল। আমি চামড়াটি একটু ঠিক করে দিলাম যাতে তার ওপর আলো না পড়ে। কিন্তু হঠাৎ সে জেগে উঠল। অতঃপর দেখতে পেলাম, তিনি সালমান ফারসি (রা)। আমি যা কিছু করে দিলাম তা তাকে বললাম। তিনি বললেন, হে জারীর! দুনিয়াতে আল্লাহর জন্য বিনয়ী হও। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয়ী হবে, পরকালে তাকে সম্মানিত করা হবে। হে জারীর! তোমার কি জানা আছে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের অন্ধকার কী পরিমাণে হবে? আমি বললাম, না জানা নেই। তিনি বললেন, দুনিয়াতে মানুষ জুলুম করে। এই জুলুমই পরকালে অন্ধকার হিসেবে প্রকাশ পাবে এবং জাহান্নামের শাস্তির রূপ ধারণ করবে।

আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা শ্রেষ্ঠ ইবাদত থেকে বিমুখ। তা হচ্ছে বিনয়।

ইউসুফ বিন আসবাত (র) বলেন, সামান্য তাকওয়া অনেক আমল করা থেকে উত্তম এবং সামান্য বিনয় বহু মুজাহাদার চেয়ে যথেষ্ট।

ফুযাইল (র)-কে কেউ বিনয় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, বিনয় হচ্ছে সত্যের সামনে বিনয় ও অনুগত হওয়া। যদিও সেই সত্য কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা মূর্খের মুখে প্রকাশ পায়। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (র) বলেন, বিনয় হচ্ছে, নিজেকে ওই ব্যক্তির চেয়ে কম মনে করা, যে দুনিয়াবী নিয়ামতে তোমার চেয়ে কম এবং নিজেকে ওই ব্যক্তির তুলনায় অধিক মনে করা, যে দুনিয়াবি নিয়ামতে তোমার চেয়ে বেশি। কাতাদা (র) বলেন, যে ব্যক্তি ধনী, সুদর্শন অথবা জ্ঞানী হয়ে তাতে বিনয় প্রকাশ করে না, কিয়ামতে এগুলো তার জন্য শাস্তি হবে।

কাব আহবার (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তার জীবদ্দশায় যে নিয়ামত দান করেন, সে যদি তার শোকর করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয় প্রদর্শন করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতেও সেই নিয়ামতের উপকার দান করেন এবং আখেরাতেও তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। আর বান্দা যদি সেই নিয়ামতের শোকর এবং বিনয় প্রদর্শন না করে, তবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেও তার উপকার মওকুফ রাখেন এবং পরকালেও তার জন্য জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত করে রাখেন।

আবদুল মালিক বিন মারওয়ানকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম! সে জবাব দিল, ওই ব্যক্তি যিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিনয় অবলম্বন করে। কামনা বাসনা থাকা সত্ত্বেও যুহুদ অবলম্বন করে। শত্রুকে সুযোগ মতো পাওয়া সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ করে না।

একদা ইবনুস সামমাক (র) হারুনুর রশীদের কাছে আসেন এবং বলতে লাগলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! মর্যাদার সঙ্গে বিনয় আপনার মর্যাদা থেকেও উত্তম। হারুনুর রশিদ ইবনে সামমাকের এই উক্তিটি খুব পছন্দ করেন। এরপর ইবনে সামমাক আরও বলেন, হে আমিরুল মুমিনিন! যদি আল্লাহ তাআলা কাউকে সৌন্দর্য, মর্যাদা, ধনসম্পদ দান করেন। আর সে সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে পবিত্র থাকে এবং মালের হক আদায় করে এবং বংশগরিমা না করে তাহলে অলীদের কাতারে তার নাম লেখা হয়। হারুনুর রশিদ কাগজ কলম নিয়ে নিজেই লিখেন ওই নসিহতটি।

সুলাইমান (আ)-এর রীতি ছিল, তিনি সকালে ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দিকে মনোযোগ দিতেন, এরপর ফকির ও মিসকীনদের মাঝে

আসতেন এবং তাদের কাছে এই বলে বসে যেতেন, মিসকীন মিসকীনদের মাঝেই এসেছে।

ইতিহাসে রয়েছে— একবার ইউনুস ইবনে ওবায়েদ, আইয়ুব সাখতিয়ানী ও হাসান বসরী (র) রাস্তায় বের হলেন। যেতে যেতে বিনয় সম্পর্কে আলোচনা শুরু হলো। হাসান বসরী (র) জিজ্ঞেস করলেন, বিনয় কী জানো? বিনয় হলো বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর রাস্তায় যে মুসলমানের সাথে দেখা হয়, তাকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা।

মুজাহিদ (র) বলেন, নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় যখন বন্যায় ডুবে মরল তখন প্রত্যেক পাহাড় পরস্পরের সাথে পাল্লা দিয়ে উঁচু হতে লাগল। কিন্তু জুদী পাহাড় বিনয় অবলম্বন করল। আল্লাহ তাআলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করলেন এবং নূহ (আ)-এর নৌকা তার ওপর অবস্থান নিল।

আবু সুলায়মান দারানী (র) বলেন, আল্লাহ তাআলা লোকেদের অন্তরের অবস্থা যাচাই করেন। তিনি কারও মাঝে মুসা (আ)-এর অন্তরের বিনয় থেকে অধিক বিনয় পাননি। তাই তাকে নিজের সাথে কথা বলার মর্যাদা দান করেন।

ইউনুস বিন ওবায়েদ (র) আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বলেন, যদি আমি তাদের মাঝে না হতাম তাহলে তাদের ওপর রহমত নাযিল হতো। এখন আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার কারণে লোকেরা রহমত থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। বলা হয়, মুমিন যে পরিমাণ নিজেকে বিনয়ী করবে, আল্লাহ তাকে সে পরিমাণ মর্যাদা দান করবেন।

যিয়াদ নুমাইরী (র) বলেন— যে দরবেশের মধ্যে বিনয় নেই, সে ফলশূন্য বৃক্ষের ন্যায়। মালেক বিন দিনার (র) বলেন, যদি কোনো ঘোষক মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে এ ঘোষণা দেয় যে, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বের হয়ে এসো। তাহলে প্রথমে আমি বের হয়ে আসব। অতঃপর ইবনুল মোবারক যখন এ কথা শুনলেন, তখন বললেন, আল্লাহর কসম! মালেককে এজন্যই মালেক বলা হয়।

ফুযাইল (র) বলেন, যার অন্তরে ক্ষমতার লোভ রয়েছে, সে কখনো সফলকাম হয় না।

মূসা বিন কাসেম (র) বলেন, একবার আমাদের এলাকায় ভূমিকম্প হয় এবং অনেক অন্ধকার হয়ে যায়। তখন আমি মুকাতিল বিন সুলায়মান (র) এর কাছে যাই এবং বলি, আপনি তো আমাদের ইমাম। আল্লাহর কাছে দুআ করেন। মুকাতিল (র) এ কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, হায়! যদি আমি তোমাদের হালাক হওয়ার কারণ না হতাম।

মূসা বিন কাসেম (র) বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহ তাআলা মুকাতিল বিন সুলাইমানের কারণে তোমাদের শাস্তি মাফ করে দিয়েছেন।

এক ব্যক্তি শিবলী (র)-এর কাছে গেলেন। তিনি ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, কে তুমি? সাধারণত তিনি এভাবে প্রশ্ন করে থাকেন। ওই আগন্তুক জবাব দিলেন, আমি নিচের নুকতা। এরপর শিবলী (র) বলেন, তুমি এরূপই হয়ে যাও, যেমনটি তুমি বলেছো। শিবলী (র)-এর এ কথাও বর্ণনা করা হয় যে, তিনি বলেন, আমি এতই নিকৃষ্ট যে, ইহুদিদের নিকৃষ্টতাও হার মানবে।

এক বুযুর্গের বাণী, যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণও নিজের মর্যাদার দিকে তাকাবে, সে বিনয়ের গুণ থেকে বঞ্চিত হবে।

ফাতহ ইবনে শুখরূফ (র) বলেন, আমি আলী ইবনে আবি তালেব (রা)-কে স্বপ্নে দেখি। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, হে আবুল হাসান। আমাকে নসীহত করুন। তিনি বললেন, দরিদ্রদের মজলিসে কোনো ধনী ব্যক্তি যদি সওয়াবের আশায় বসে তাহলে তা কত ভালো বিষয় হবে। এর থেকেও উত্তম হচ্ছে কোনো দরিদ্র ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ওপর ভরসা করে ধনী ব্যক্তিদের সাথে অহংকার দেখায়।

আবু সুলায়মান (র) বলেন, মানুষ নিজের পরিচয় জানা ব্যতীত বিনয়ের গুণ অর্জন করতে পারে না।

আবু ইয়াযীদ বিস্তামী (র) বলেন, ব্যক্তি যতক্ষণ মনে করে যে, মানুষের মধ্যে তার চেয়েও অধম কেউ আছে, ততক্ষণ সে অহংকারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, তাহলে বিনয়ী হবে কখন? তিনি জবাব দিলেন, যখন নিজের জন্য কোনো অবস্থান ও মর্যাদার চিন্তা না করে। মানুষ যে পরিমাণ আল্লাহকে ও নিজেকে জানে, সে পরিমাণ বিনয়ী হয়। আবু

সুলায়মান (র) বলেন, আমি যে পরিমাণ নিচু স্তরের, পুরা দুনিয়া যদি আমাকে এর থেকেও নিচে নামাতে চায় তাহলে পারবে না।

উরওয়া বিন ওয়ারদ (র) বলেন, বিনয় মহত্ব অর্জনের একটি মাধ্যম। প্রত্যেক মর্যাদার ওপর হিংসা করা যেতে পারে; কিন্তু বিনয় এমন একটি নিয়ামত, যার ওপর কেউ হিংসা করতে পারে না।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে খালিদ বারমাকী (র) বলেন, ভদ্রলোক ইবাদতকারী হলে বিনয়ী হয় এবং বোকা ব্যক্তি ইবাদতকারী হলে নিজেকে বুযুর্গ মনে করতে থাকে।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুয়ায (র) বলেন, যে লোক ধন-সম্পদের কারণে তোমার সঙ্গে অহংকার করে, তার সঙ্গে তোমার অহংকার করাই বিনয়। সকল সৃষ্টির জন্য অহমিকা একটি খারাপ বিষয় এবং দরিদ্রদের জন্য আরও বেশি। বলা হয়, বিনয়ীরাই সম্মানী হয়। যে আল্লাহকে ভয় করে, সে-ই নিরাপদ। লাভবান ওই ব্যক্তিই, যে নিজেকে আল্লাহর কাছে বিক্রয় করেছে।

আবু আলী জুরজানী (র) বলেন, যখন মানুষের অন্তর অহংকার, লোভ, হিংসায় পরিপূর্ণ হয় তখন আল্লাহ তার ধ্বংসের ইচ্ছা করেন। তাকে বিনয়, অল্পেতুষ্টির গুণ অর্জন থেকে বিরত রাখেন। আর যখন তার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন তখন তার প্রতি দয়ার্দ্র হন। যখন অন্তরে অহংকারের আগুন জ্বলে ওঠে, আল্লাহর মেহেরবানিতে বিনয় তা ঢেকে নেয় এবং যখন হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে তখন নসিহতের আলোকচ্ছটা তা ঠাণ্ডা করে দেয় আর অল্পেতুষ্টি লোভের আগুন নিভিয়ে দেয়।

হযরত জুনাইদ (র) জুমার দিন এক বৈঠকে বলছিলেন, যদি রাসূলুল্লাহ (স) এই ইরশাদ না করতেন যে, 'শেষ যামানায় সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট ব্যক্তি তাদের নেতা হবে তাহলে আমি তোমাদের কিছুই বলতাম না।' (জামে তিরমিযী : ২২১৮)

জুনাইদ (র) এও বলেছেন, একাত্ববাদীদের নিকট বিনয়ও অহংকার। তার কথার এ অর্থ হতে পারে যে, বিনয়ী ব্যক্তি নিজের আত্মার ধ্যান করেন এরপর সে নিজেকে নিচু জ্ঞান করে। একত্ববাদীদের নিকট আত্মার কোনো বাস্তবতা নেই।

ওমর ইবনে শাববাহ (র) বলেন, আমি মক্কায় সফা ও মারওয়ার মাঝে সায়ি করছিলাম। এসময় এক ব্যক্তিকে দেখলাম, খচ্চরে চড়ে আসছে। তার সামনে খাদেম আছে এবং সে রাস্তা খালি করার জন্য লোকদের সরিয়ে দিচ্ছে। কিছু দিন পর আমি মক্কা থেকে বাগদাদে চলে আসি। বাগদাদে পুনরায় ওই লোকটিকে দেখতে পেলাম। খালি পায়ে সে উন্মুক্ত মাথায় চলাফেরা করছে এবং চুল দাড়ি এলোমেলো। আমি তাকে গভীরভাবে দেখতে লাগলাম। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী দেখছেন জনাব? আমি বললাম, মক্কায় এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যিনি দেখতে তোমারই মতো। তখন ওই ব্যক্তি বলল, আমিই ওই ব্যক্তি। আমি তার বর্তমান অবস্থা দেখে পেরেশান হলাম। সে বলল, আমি এমন জাগায় নিজের শান প্রকাশ করেছি যেখানে সবাই বিনয় অবলম্বন করে (অর্থাৎ মক্কায়)। তাই আল্লাহ তাআলা যেখানে সবাই নিজেদের শান প্রকাশ করে চলে সেখানে আমাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছেন।

মুগিরা (র) বলেন, আমরা ইবরাহিম নাখয়ী (র)-কে এমন ভয় করতাম যেমন লোকেরা বাদশাহকে ভয় করে। তিনি বলতেন, এটা খারাপ যুগ। কেননা, আমার মতো মানুষকে কুফার ফকিহ মনে করা হয়।

আতা সুলামি (র) বিদ্যুৎচমকের কারণে কেঁপে উঠতেন এবং বলতেন, এই মুসিবত আমার কারণে তোমাদের ওপর নাযিল হয়েছে। যদি আতা মারা যেতো তাহলে লোকেরা মুসিবত থেকে বেঁচে যেতো।

বিশর হাফী (র) বলেন, দুনিয়াদারদের সালাম করবে না। সালাম না করাটাই তাদের জন্য ভালো। এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের জন্য দুআ করলেন যে, আপনি যা চান আল্লাহ তাআলা আপনাকে তা দান করুন। এরপর তিনি বললেন, আশা তো পরিচয় লাভের পরে হয়। আল্লাহর মারিফাত বা পরিচয়ই তো এখনো হলো না।

একদা কুরাইশরা সালমান ফারসির নিকট গর্ব করতে লাগল। তখন সালমান (রা) বললেন, আমি তো সৃষ্টি হয়েছি নাপাক বীর্য থেকে। অতঃপর মৃত্যুর পর দুর্গন্ধময় মৃতদেহে পরিনত হব। এরপর পাল্লা কায়েম করা হবে। যদি নেকির পাল্লা ভারি হয় তাহলে আমি সফলকাম আর যদি হালকা হয় তালে আমি ব্যর্থ।

আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, তাকওয়ার মাঝে সম্মান, ইয়াকীনের মাঝে ধনাঢ্য এবং বিনয়েম মাঝে মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন! আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বিনয়ের মালায় ভূষিত করুন!

অহংকারের প্রকৃতি ও লাভ-ক্ষতি

অহংকার দুপ্রকার। একটি জাহেরী, অপরটি বাতেনী। জাহেরী অর্থ প্রকাশ্য এবং বাতেনী অর্থ হচ্ছে অপ্রকাশ্য। অপ্রকাশ্য অহংকার হচ্ছে মনের অভ্যাস এবং প্রকাশ্য অহংকার হচ্ছে ক্রিয়াকর্ম, যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা প্রকাশ পায়। মূলত অপ্রকাশ্য অভ্যাসকেই অহংকার বলা যুক্তিযুক্ত। ক্রিয়াকর্ম এই অভ্যাসের ফল। অভ্যাস ক্রিয়াকর্মের কারণ হয়ে থাকে। শরীরের অঙ্গের ওপর যখন অভ্যাসের প্রতিক্রিয়া ভেসে ওঠে, তখন 'অহংকার করেছে' বলা হয়। মোটকথা, মানসিক চরিত্রসমূহের একটি চরিত্রকে বলা হয় অহংকার। তা হচ্ছে নিজেকে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠ দেখে আনন্দ পাওয়া এবং তাতেই আকৃষ্ট হওয়া।

জেনে রাখুন, অহংকার একটি আপেক্ষিক বিষয়। এতে অনেক বিষয়ের উপস্থিতি প্রয়োজন— (১) অহংকারী, (২) যার সাথে অহংকার করা হয়, (৩) যে বিষয় নিয়ে অহংকার করা হয়। অহংকার ও আত্মপ্রীতির মধ্যে পার্থক্য এখানেই। আত্মপ্রীতিতে শুধু কর্তার উপস্থিতিই যথেষ্ট। মানুষ যদি একাই সৃষ্টি হয় এবং তার সাথে অন্য কিছু না থাকে, তাহলে সে আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত হতে পারবে— অহংকার করতে পারবে না। এ থেকে জানা গেল, অহংকারে শুধু নিজেকে বড় মনে করা যথেষ্ট নয়। কেননা, মাঝে মধ্যে মানুষ নিজেকে বড় মনে করে। কিন্তু অপরকে নিজের চেয়েও বড় অথবা সমকক্ষ মনে করায় অহংকার নেই। এমনিভাবে অপরকে হেয় মনে করাও অহংকারের জন্যে যথেষ্ট নয়। কেননা, মাঝে মাঝে মানুষ অপরকে হেয় জ্ঞান করে; কিন্তু নিজেকে তার চেয়েও বেশি হেয় মনে করে। এ অবস্থায় সে অহংকারী হয় না। অপরকে নিজের মতো মনে করলেও অহংকার হয় না। অহংকারের প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে নিজের একটি মর্যাদা জানা এবং অন্যের একটি মর্যাদা জানা। এরপর নিজের মর্যাদাকে অন্যের মর্যাদার চেয়ে বড় মনে করা। মানুষের ভাবনায় এ

তিনটি বিষয় একত্র হলে অহংকার হবে। নিজের মর্যাদা জানার নামই অহংকার নয়। বরং এই জানার কারণে ও বিশ্বাসের ফলে মনের মধ্যে একটি ফুৎকার পড়ে এবং মান-মর্যাদা ও আনন্দের দিকে প্রবাহিত হয়। সম্মান ও আনন্দের দিকে এই প্রবাহকেই অহংকার বলে। হাদিস শরীফে উপর্যুক্ত ফুৎকারের কথা এভাবে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اَعُوْذُبِكَ مِنْ نَفْخَةِ الْكِبْرِيَاءِ.

(হে আল্লাহ!) আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অহংকারের ফুৎকার থেকে।

ওমর (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তি ফজর নামাযের পর ওয়ায করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে বলেছিলেন, আমার ভয় হয় যে, তুমি ফুলে-ফেঁপে সপ্তাকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ থেকে বোঝা গেল, মানুষ যখন অহংকার করে, তখন ফুলে ওঠে। এই ফুলে ওঠাকে মাহাত্ম্যবোধও বলা হয়। সেজন্য ইবনে আব্বাস (রা) নিচের আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন,

اِنْ فِىْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَاهُمْ بِبَالِغِيْهِ.

তাদের অন্তরে শুধু অহংকারই রয়েছে, যে পর্যন্ত তারা সেখানে পৌঁছতে সক্ষম হবে না। (সূরা গাফির : ৫৬)

এমন মাহাত্ম্যবোধ যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ক্রিয়াকর্মের কারণ হয়ে থাকে। এরপর সে ক্রিয়াকর্মকে অহংকার বলা হয়। অর্থাৎ, কারও নিকট যখন তার নিজের মর্যাদা অন্যের চেয়ে বড় সাব্যস্ত হয়, তখন সে অপরকে হেয় জ্ঞান করে তার নিকট থেকে দূরে থাকতে চাইবে। তার নিকট বসা, তার সাথে খাবারে শরীক হওয়া অপছন্দ করবে। অহংকারের মাত্রা যদি বেশি হয় তাহলে মনে করবে, এ লোকটির উচিত আমার সামনে গোলামের মতো মাথা নুয়ে দাঁড়ানো।

যদি অহংকার বেশি হয়, তাহলে তার থেকে খেদমত নিতে আগ্রহী হয় না এবং তার খাদেম হওয়ার যোগ্যও মনে করে না।

আর যদি অহংকার কম হয় তাহলে তাকে নিজের সমকক্ষ মনে করতে লজ্জাজনক মনে করে। সংকীর্ণ রাস্তায় তার আগে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এমনিভাবে বৈঠকে তার আগে বসার চেষ্টা করবে।

তার সালামের অপেক্ষায় থাকবে। যদি সে কোনো কাজে অলসতা করে তাহলে তাকে খারাপ মনে করবে। আর যদি কোনো বিষয়ে বহস বা আলোচনা করে তাহলে তাকে নিচু স্তরের গণ্য করে জবাব দিতে বিরত থাকবে। যদি সে নসিহতমূলক কথা বলতে চায় তাহলে নসিহত গ্রহণকে লাঞ্ছনা মনে করবে। আর যদি সে তাকে নসিহত করে তখন কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে। তার কথার প্রতিউত্তর দিলে রেগে যায়। যদি শিক্ষা দেয় তাহলে সহজ ও কোমলতার পন্থা অবলম্বন করে না; বরং এমন ব্যক্তি ছাত্রদের নিকৃষ্ট মনে করে এবং তাদের কটাক্ষ করে কথা বলে এবং নিজের শিক্ষা দানকে তাদের ওপর অন্ধগ্রহ মনে করে। আর সাধারণ মানুষকে তো গণনাই করে না। তাদের দিকে যদি তাকায় তাহলে মনে হয় গাধার দিকে তাকিয়েছে। অহংকারের কারণে যে কথা, কাজ প্রকাশভঙ্গি প্রকাশ পায় তার তালিকা অনেক বড়, যা লিখে শেষ করা যাবে না। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে তাকালেই তা নির্ণয় করা সম্ভব যে কোনটা অহংকার। অহংকারের পরিণাম ভয়াবহ। অহংকারের কারণে বড় বড় ব্যক্তি বরবাদ হয়ে গেছে এবং আবিদ, সংসারত্যাগী এবং শিক্ষিত লোকগণ কমই এ থেকে বেঁচে থাকে। জনসাধারণের তো প্রশ্নই আসে না। অহংকার যে ধ্বংসাত্মক, তার বড় প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর এই বাণী,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ.

যার মনে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশতে প্রবেশ করবে না। (সহিহ মুসলিম : ৯১; জামে তিরমিযি : ১৯৯৮)

কেননা, অহংকারের কারণে বান্দা ঈমানের কোনো চরিত্র হাসিল করতে পারে না। যেমন, মানুষ যে পর্যন্ত অহংকারী থাকে, সে নিজের জন্য যা প্রিয়, তা অন্য মুমিনের জন্য প্রিয় মনে করবে না। বিনয় হলো মুত্তাকীদের চরিত্রের মূল বিষয়। অহংকারী ব্যক্তি তা করতে পারবে না। অহংকারে নিমজ্জিত থাকাকালে কেউ হিংসা-বিদ্বেষ ছাড়তে পারবে না। সব সময় সত্য কথা বলতে পারবে না। ক্রোধ ও রাগ দমন করতে পারবে না। বিনয় সহকারে নিজে কাউকে উপদেশ দেবে না এবং অন্যের উপদেশও শুনবে না। এমন কোনো মন্দ অভ্যাস নেই, যা অহংকারী ব্যক্তি নিজের অহংকার বজায় রাখার জন্য করতে বাধ্য না হবে। অপর দিকে এমন কোনো

উৎকৃষ্ট গুণ নেই, যা সে নিজের মানহানির ভয়ে বাদও দিবে না। এজন্যই বলা হয়েছে, যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর মন্দ চরিত্র কখনো একা বিদ্যমান থাকে না। দেখা গেছে, কারও মধ্যে একটি মন্দ চরিত্র থাকলে সে অপরটিকেও টেনে নিয়ে আসে।

সর্বনিকৃষ্ট সেই অহংকার, যা অন্যের নিকট থেকে শিক্ষাগ্রহণে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় এবং সত্যকে মেনে নিতে ও তার অনুগত হতে দেয় না। এ ধরনের অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ.

ফেরেশতাগণ হাত বাড়িয়ে (বলবে), তোমরা নিজেদের প্রাণ বের করো। তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে এবং তাঁর নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য দেখাতে, সেজন্য আজ তোমাদের অবমাননার শাস্তি দেওয়া হবে। (সূরা আনআম : ৯৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

তোমরা জাহান্নামের বিভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করো তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য, আর কতই না নিকৃষ্ট ঔদ্ধত্যদের আবাসস্থল। (সূরা মুমিন : ৭৬)

অতঃপর আল্লাহ তাআলা জানিয়েছেন সবচেয়ে ভয়ংকর শাস্তি দেওয়া হবে অহংকারীদের।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا.

অতঃপর প্রত্যেক দলের মধ্যে যে দয়াময়ের প্রতি সর্বাধিক অবাধ্য, আমি তাকে টেনে বের করব। (সূরা মারইয়াম : ৬৯)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

فَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُّنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ.

সুতরাং যারা আখেরাতে বিশ্বাসী নয়, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী। (সূরা নাহল : ২২)

يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ.

যাদের দুর্বল মনে করা হতো তারা ক্ষমতাদর্পীদের বলবে, তোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম। (সূরা সাবা : ৩১)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ.

যারা অহংকারবশে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে। (সূরা মুমিন : ৬০)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰيٰتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রদর্শন করে, তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে রাখি। (সূরা আরাফ : ১৪৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন,

سَأَرْفَعُ فَهْمَ الْقُرْاٰنِ مِنْ قُلُوْبِهِمْ.

আমি তাদের অন্তর থেকে কুরআনের ফাহাম বা বোঝকে উঠিয়ে নেব।

আর কোনো তাফসীরগ্রন্থে রয়েছে,

سَأَحْجُبُ قُلُوْبَهُمْ عَنِ الْمَلَكُوْتِ.

উর্ধ্বলোকের অনুধাবন থেকে আমি তার অন্তরে পর্দা দিয়ে দিব।

আর ইবনে জুরাইজ (র) বলেন,

سَأَصِرْفُهُمْ عَنْ أَنْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْهَا وَيَعْتَبِرُوْا بِهَا.

আমার নিদর্শনাবলী বোঝা ও চিন্তা করা থেকে দূরে সরিয়ে দেবো।

হযরত ঈসা (আ) বলেন, নরম মাটিতে ফসল উৎপন্ন হয়, কিন্তু পাথরে ফসল হয় না। এমনিভাবে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনীত অন্তরে প্রভাব

বিস্তার করে। অহংকারীর অন্তরে বিস্তার হয় না। মানুষ যদি তার মাথা বেশি উঁচু করতে চায় এবং ছাদ পর্যন্তও নিয়ে যায়, তাহলে ছাদে ধাক্কা লেগে তার মাথাই ফেটে যাবে। আর যে ব্যক্তি নুয়ে থাকবে, সে ছাদ দ্বারা আরাম ও ছায়া পাবে।

এ ধরণের দৃষ্টান্ত অহংকারকারীদের জন্য দেওয়া হয়েছে যে তারা কীভাবে হিকমত থেকে বঞ্চিত হয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) সত্যকে অস্বীকার করাকে অহংকার বলেছেন এবং বলেছেন অহংকারী হচ্ছে, যে হক অস্বীকার করে এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

যার সাথে অহংকার করা হয়, তার মর্যাদা এবং অহংকারের ফলাফল

স্বভাবতই মানুষ অত্যাচারী ও মূর্খ। বিধায় সে কখনো সৃষ্টিকর্তার সাথে এবং কখনো মাখলুকের সাথে অহংকার করে। এ ক্ষেত্রে অহংকার তিন ধরনের।

প্রথমত, আল্লাহর সঙ্গে অহংকার করা। এটা সর্বনিকৃষ্ট অহংকার। এর কারণ শুধু মূর্খতা ও অবাধ্যতাই হয়ে থাকে। যেমন, নমরূদ অহংকারের কারণে স্থির করেছিল, সে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করবে কিংবা যেমন অভিশপ্ত ফেরাউন খোদায়ী দাবি করেছিল। সে আল্লাহর গোলাম হতে অস্বীকার করেছিল। এই প্রকার অহংকার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۭ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا.

মসীহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনো লজ্জাজনক বিষয় জ্ঞান করে না এবং নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণও করে না। আর কেউ তাঁর ইবাদতকে ছোটো মনে করলে এবং দম্ভ করলে তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে একত্র করবেন। (সূরা নিসা : ১৭২)

দ্বিতীয়ত : রাসূলগণের সঙ্গে অহংকার করা। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সম্মানী ও উচ্চ মনে করে তাদের মতো মানুষের কাউকে অনুসরণ করতে

অস্বীকার করে। এই অহংকার অনেক সময় চিন্তাভাবনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই সারাক্ষণ অহংকারের কারণে মূর্খতার পাঁকে ডুবে থেকে আনুগত্য বর্জন করে এবং নিজেকে সত্যপন্থি বলে জ্ঞান করতে থাকে। কখনো চিন্তাভাবনা করে, তবে মন রাসূলগণের আনুগত্য করে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে কাফেরদের এমন বহু উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। তারা বলত,

اَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا.

আমরা কি এমন দু ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনব, যারা আমাদেরই মতো! (সূরা মুমিনুন : ৪৭)

اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا.

তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ। (সূরা ইবরাহিম : ১০)

وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ ۙ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ.

যদি তোমরা তোমাদের মতো একজন মানুষের অনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (সূরা মুমিনুন : ৩৪)

وَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۭ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا.

আর যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তারা বলে, 'কেন আমাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না? অথবা কেন আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না?' তারা তো তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে এবং তারা গুরুতররূপে সীমালংঘন করেছে । (সূরা ফুরকান : ২১)

ফেরাউন সম্পর্কে বলা হয়েছে,

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَ جُنُوْدُهٗ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

বস্তুত ফেরাউন ও তার বাহিনী পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করেছিল (সূরা কাসাস : ৩৯)

ফেরাউন তো আল্লাহর সঙ্গে এবং রাসূলের সঙ্গে অহংকার করেছিল। সেজন্য ওয়াহাব (র) বলেন, মূসা (আ) দাম্ভিক ফেরাউনকে বলেছিলেন,

তুমি ঈমান আনো। তোমার রাজত্ব তোমার হাতেই থাকবে। ফেরাউন বলল, আমি হামানের সাথে শলাপরামর্শ করে নিই। হামানকে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, এখন আপনি মাবুদ। জনগণ আপনার পূজা করে। ঈমান আনলে আপনি হয়ে যাবেন দাস এবং অন্যজনের পূজা করতে হবে। এরপর ফেরাউন আল্লাহ তাআলার গোলাম হতে এবং মূসা (আ)-এর আনুগত্য করতে অস্বীকার করল। মক্কার কুরাইশদের কথা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ হয়েছে,

وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ.

এবং তারা বলে, 'এ কুরআন কেন নাযিল হলো না দুই জনপদ থেকে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির ওপর?' (সূরা যুখরুফ : ৩২)

কাতাদা (র) বলেন, এ ছিল ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং আবু মাসউদ ছাকাফীর কথা। তারা বলত, মুহাম্মদ তো একজন ইয়াতীম ছেলে। তাকে আল্লাহ কী করে আমাদের নবী বানালেন? কোনো বড় সরদারকে নবী বানালেন না কেন? আল্লাহ তাদের উত্তরে বলেন,

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ.

তারা কি আপনার প্রতিপালকের করুণা বণ্টন করে? (সূরা যুখরুফ : ৩২)

কুরাইশরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে আরও বলেছিল, আপনার দরবারে আমরা কীভাবে বসতে পারি? এখানে তো সর্বক্ষণ গরিব মুসলমানরা আনাগোনা করে। তাদের এই হেয় জ্ঞান করার জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ.

যারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তাদের আপনি তাড়িয়ে দিবেন না। (সূরা আনয়াম : ৫২)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَ لَا تَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ.

আপনি নিজেকে ধৈর্য সহকারে রাখবেন তাদেরই সংসর্গে, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর

আপনি পার্থিবজীবনের শোভা কামনা করে, তাদের থেকে আপনার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। (সূরা কাহাফ : ২৮)

অতঃপর আল্লাহ তাদের অবাক হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। যখন তারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে এবং ওই সব লোককে অনুপস্থিত দেখে যাদের খারাপ মনে করত।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ قَالُوْا مَا لَنَا لَا نَرٰى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْاَشْرَارِ.

তারা আরও বলবে, 'আমাদের কী হলো, আমরা যে সকল লোককে মন্দ গণ্য করতাম তাদের দেখতে পাচ্ছি না। (সূরা সোয়াদ : ৬২)

সম্ভবত এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো আম্মার (রা), বেলাল (রা), সুহাইব (রা), মিকদাদ (রা) প্রমুখ সাহাবি।

সারকথা : অনেক কুরাইশ কাফের এমন ছিল, যারা অহংকারবশত চিন্তাভাবনা থেকে দূরে ছিল এবং রাসূলুল্লাহ (স) যে সত্য নবী ছিলেন, এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। আবার কিছু কিছু এমন ছিল, যারা জানতো, তিনি সত্য নবী; কিন্তু অহংকার করে মুখে স্বীকার করতো না। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ.

অতঃপর তিনি যখন তাদের কাছে আসলেন, যাকে তারা চিনত; তখন তারা তাকে অস্বীকার করল। (সূরা বাকারা : ৮৯)

তৃতীয়ত, মানুষের সাথে অহংকার করা। অর্থাৎ, নিজেকে বড় ও অন্যকে হেয় মনে করার কারণে কারও আনুগত্য না করা। এটা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার অহংকারের চেয়ে কম হলেও দুই কারণে ভয়াবহ। প্রথম কারণ, বড়ত্ব, মাহাত্ম্য ও সম্মান সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্যই মানায়। মানুষ যেহেতু দুর্বল ও অক্ষম সেজন্য তার অহংকার করা ঠিক নয়। সুতরাং মানুষ যখন অহংকার করে, তখন সে যেন আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণে তাঁর শরীক হতে চায়। এটা গোলামের মাথায় রাজার মুকুট পরে সিংহাসনে বসার মতো। এখানে একটু চিন্তা করে দেখুন, রাজা এ ধরনের কাজে গোলামের প্রতি কতটুকু ক্ষুব্ধ হবেন। কেননা, গোলামের কাজটি অবশ্যই ধৃষ্টতাপূর্ণ।

এ কারণেই হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, মাহাত্ম্য আমার পায়জামা এবং অহংকার আমার চাদর। এতে যে আমার সাথে দ্বন্দ্ব করবে, আমি তাকে ধ্বংস করে দেব। (মুসতাদরাকেক হাকেম : ১: ২৩৫)

বান্দার সাথে অহংকার করা আল্লাহ তাআলারই বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে লোক বান্দার সাথে অহংকার করবে, সে আল্লাহর সাথে দ্বন্দ্বকারী হিসেবে গণ্য হবে। এটা নিঃসন্দেহে গুরুতর অন্যায়। কেননা যে ব্যক্তি বাদশার খাস গোলামকে নিকৃষ্ট মনে করে। তার কাছ থেকে খেদমত নেয় এবং তাদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায় এবং তার সাথে ওই মুআমালা করে যা বাদশার সাথে করা উচিত, এ ব্যক্তি যদিও এমন নয়, যে ব্যক্তি বাদশাহি মুকুট মাথায় পরিহিত এবং আসনে বসে একা রাজত্ব করার ইচ্ছা করেছিল। ওই ব্যক্তি বাদশাহকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল এবং তার ক্ষমতার অংশ চায়। তবে এই বিতণ্ডা এবং ফেরাউন, নমরুদ-এর বিতণ্ডার মধ্যে ওই পার্থক্য, যা এই দুই ব্যক্তির ঝগড়ার মাঝে ছিল। একজন বাদশাহকে সরিয়ে ক্ষমতায় বসতে চায় আর দ্বিতীয়জন তার ক্ষমতার অংশীদার হতে চায়।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, অহংকারের জন্য মানুষ আল্লাহর বিধানের বিরোধিতা করতে বাধ্য। কেননা, অহংকারী যখন কারও মুখ থেকে ন্যায়ের কথা শোনে, তখন অহংকারবশত তা মানতে নারাজ থাকে। বরং অস্বীকার করতে স্বচেষ্ট থাকে। এজন্যই যেসব শিক্ষিত লোক ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে বিতর্ক করে, তাদের দাবি এটাই থাকে, নিছক সত্য আবিষ্কার করা ও তা কায়েম করা। কিন্তু এরপর তারা সত্যকে গ্রহণ করতে অহংকারীদের ন্যায় অস্বীকার করে। এক পক্ষের মুখ দিয়ে সত্য জাহির হয়ে গেলে অপরপক্ষ তা মানে না এবং মিথ্যা প্রমাণ করা ও তা খণ্ডন করার জন্য তৎপর থাকে। এটা কাফের ও মুনাফেকদের স্বভাব। কুরআনে কারীমে রয়েছে–

وَ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَ الْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ.

কাফেররা বলে, 'তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা পাঠ করার সময় শোরগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।' (সূরা হা-মীম সিজদা : ২৬)

যারা অপরের ওপর প্রবল হওয়ার এবং অপরকে নিরুত্তর করে দেওয়ার লক্ষ্যে বিতর্ক করে— সত্য গ্রহণ ও কায়েমের জন্য নয়, তারা এ চরিত্রে মুনাফেকদের অংশীদার।

এমনিভাবে অহংকার মানুষকে সত্য অস্বীকারের দিকে নিয়ে যায়। ওয়াজ-নসিহত গ্রহণ করতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ اِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ.

যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তখন তার আত্মমর্যাদাবোধ তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। (সূরা বাকারা : ২০৬)

ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন তিনি এ আয়াত শুনেছেন তখন বলে উঠেন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' এবং বলেন, এক ব্যক্তি সৎকাজে আদেশের জন্য দাঁড়িয়েছে ফলে তাকে হত্যা করা হয়েছে। আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলছে, তোমরা কেন তাদের হত্যা করছ যারা সৎ কাজের আদেশ দেয়? অহংকারীরা এ ব্যক্তিকেও ছাড় দেয়নি।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, মানুষ গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, যখন তাকে বলা হলো, আল্লাহকে ভয় করো তখন সে বলে, প্রথমে নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো, পরে আমার জন্য চিন্তা করো।

রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তিকে বললেন, ডান হাতে খাও। সে বললো, আমি পারবো না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এমনই হোক। রাবী বলেন, এর পর থেকে তার ডানহাত অকেজো হয়ে যায়। (সহিহ মুসলিম : ২০২১)

মানুষের সাথে গর্ব অহংকার মজ্জাগতভাবেই আছে। এর কারণে আল্লাহ তাআলার হুকুমের সাথে অহংকার হয়ে যায়। অহংকারে নিমজ্জিত কুখ্যাত শয়তানের কথা কুরআন মাজীদে এ কারণেই বর্ণিত হয়েছে, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। সে বলেছিল, আমি মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি আগুন দিয়ে সৃষ্ট আর মানুষ মাটি দিয়ে সৃষ্ট। শয়তানের এ অহংকারের পরিণতিতে সে সিজদার হুকুম মানতে অস্বীকার করেছে। অতএব, তার অহংকার প্রারম্ভে ছিল আদম (আ)-এর সাথে এবং পরিণামে হয়ে গেল আল্লাহর সাথে। ফলে সে চিরতরে বরবাদ হয়ে গেল।

হাদিসে বর্ণিত আছে, সাবিত ইবনে কাইস ইবনে শাম্মাম (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, আপনি তো জানেন, আমি খুব বেশি পরিচ্ছন্নতা প্রিয়। আমার এ অভ্যাস কি অহংকারের মধ্যে গণ্য হবে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, না, এটা অহংকার নয়। বরং অহংকার হলো, সত্য বিষয়ে অবাধ্য হওয়া, মানুষের ত্রুটি খুঁজে বের করে তাদের হেয় করা। (সহিহ মুসলিম : ৯১)

আরেক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে সত্য অস্বীকার করবে, সে মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। অথচ তারা তার মতোই আল্লাহর বান্দা অথবা তার চেয়েও উত্তম। এটা প্রথম মুসিবত আর দ্বিতীয় হচ্ছে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা।

সুতরাং যে লোক নিজেকে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে, অন্য মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার চোখে দেখে এবং সত্যকে স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করে, সে বান্দার ব্যাপারাদিতে অহংকারী হবে। অপরদিকে যে লোক আল্লাহর আনুগত্য করতে কুণ্ঠাবোধ করে এবং রাসূলের অনুসরণ করে বিনম্র হতে লজ্জাবোধ করে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারাদিতে অহংকারী হবে।

মানুষ কেন অহংকার করে?

দেখা যায় যে, এমন মানুষই অহংকার করে, যে নিজেকে বড় মনে করে। আর নিজেকে সে-ই বড় মনে করে, যে জানে, তার মধ্যে কোনো জাগতিক অথবা পারলৌকিক পূর্ণতার গুণ বর্তমান রয়েছে। পরকালীন পূর্ণতা দুটি— ইলম ও আমল। অপরদিকে জাগতিক পূর্ণতা পাঁচটি — বংশ, সৌন্দর্য, শক্তি, ধনসম্পদ এবং বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গী-সাথীদের ধনৈশ্বর্য। অতএব, এ সাতটি বিষয়ই হলো অহংকারের কারণ। নিচে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করা হলো।

অহংকারের প্রথম কারণ ইলম

অর্থাৎ জ্ঞান। জ্ঞানী লোকেরা খুব তাড়াতাড়ি অহংকারী হয়ে যায়। তাই হাদিসে বলা হয়েছে—

آفَةُ الْعِلْمِ الْخُيَلَاءُ.

অহংকার হচ্ছে জ্ঞানের বিপদ। (মুজামে কাবীর, তাবারানি : ৩:৬৮)

জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণতা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে নিজেকে বড় এবং অন্যদের মূর্খ ও তুচ্ছ মনে করতে থাকে। ফলে দুনিয়াবি কাজকর্মে সে নিজেকে অগ্রগণ্য মনে করে। অপরের কাছ থেকে প্রথমে সালাম পাওয়ার আশা করে। অন্যরা তার সাথে সদাচরণ করে। কিন্তু সে কারও সাথে সদাচরণ করে না। করলেও এটাকে তার প্রতি অনুগ্রহ মনে করে এবং কৃতজ্ঞতা আশা করে এবং এ বিশ্বাস করে যে, সে তাদের মধ্যে মর্যাদাশীল। সে তাদের সাথে এমন আচরণ করে, যা সমীচীন নয় এবং সে কামনা করে যে তারা তার সেবা করবে, তার প্রতি কৃতার্থ হবে। আর সাধারণত দেখা যায়, তারা তার সাথে ভালো ব্যবহার করে; কিন্তু সে ভালো ব্যবহার করে না। তারা তার সাক্ষাতে আসে; কিন্তু সে কখনো তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় না। সে অসুস্থ হলে তারা তাকে দেখতে আসে। কিন্তু সে কোনো অসুস্থ ব্যক্তির খোঁজখবর নেয় না। তাদের কাছ থেকে খেদমত নেয়। কোনো ভুল হলে অসৎ আচরণ করে। আচরণ দেখে মনে হয়, তারা তার গোলাম বা কর্মচারী। শিক্ষাদানকেও ইহসান মনে করে এবং এ ধারণা করে যে, আমরা তাদের ইলম দিয়ে ধন্য করছি। তাই তাদের থেকে খেদমত নেওয়া আমাদের হক। এটা হচ্ছে দুনিয়াবি বিষয়ে তার অবস্থা।

ধর্মীয় বিষয়াদিতে জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যের সাথে এভাবে অহংকার করে যে, সে নিজেকে আল্লাহর কাছে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম মনে করে। ফলে অন্যের জন্য সে যতটুকু ভয় করে, নিজের জন্যে ততটুকু করে না; বরং নিজের মুক্তির ব্যাপারে অন্যের চেয়ে বেশি আশাবাদী হয়। এমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে অজ্ঞ বলাই যুক্তিযুক্ত। কে তাকে জ্ঞানী করেছে? সত্যিকার জ্ঞান হলো, যার মাধ্যমে আল্লাহভীতি, বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পরিণাম কী হবে তার পরিচয় লাভ করে এবং এই ধারণা করে যে, আল্লাহ তাআলা ওলামায়ে কেরামকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবেন। প্রকৃত ইলম হচ্ছে, যা আল্লাহভীতি, বিনয়, নম্রতা বৃদ্ধি করে। যার এ ধরনের ইলম অর্জিত হয়েছে, সে কখনো নিজেকে বড় ভাবতে পারে না; বরং এ ধারণা করে যে, সব লোক আমার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহর পাকড়াওয়ের মুখাপেক্ষী আমাকে বেশি হতে হবে। এজন্যই আবু দারদা (রা) বলেছেন, যার ইলম বেশি তার কষ্টও বেশি। আর তিনি সঠিকই বলেছেন।

এখন কথা হলো, জ্ঞানের কারণে কিছু লোকের অহমিকা বেড়ে যাওয়ার কারণ কী? এর কারণ ২টি।

প্রথমত, এ সকল লোক এমন জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ত হয়, যা নামে মাত্রই জ্ঞান—আসল জ্ঞান নয়। আসল জ্ঞান দ্বারা খোদাভীতি বৃদ্ধি পাবেই। যেমন, আল্লাহ বলেন—

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির : ২৮)

এছাড়া অন্য যে সব বিষয় রয়েছে যেমন চিকিৎসাবিজ্ঞান, অংকশাস্ত্র, ভাষা, কবিতা, নাহু-সরফ, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি অর্জনে যখন মানুষ একেবারে নিমগ্ন হয়ে যায় তখন তার মাঝে অহংকার ও নিফাক সৃষ্টি হয়। এটাকে শিল্পকর্ম বলা যায়। ইলম নয়; বরং ইলম হচ্ছে, যার দ্বারা দাসত্ব ও প্রভূত্বের পরিচয় লাভ করা যায় এবং ইবাদতের পদ্ধতি জানা যায়। এই ইলমই বিনয় সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয়ত, যখন এ সমস্ত লোক জ্ঞানচর্চা করে, তখন তাদের অন্তরাত্মা বিশুদ্ধ থাকে না। বরং কুচরিত্র দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। ফলে যে শিক্ষাই হাসিল করুক না কেন, তা তাদের মনে ভালো জায়গা পায় না। ফলে জ্ঞানের ফলও ভালো হয় না।

ওয়াহাব (র) এর একটি উপমা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, জ্ঞান হলো আসমানের পানির সদৃশ, যা মিষ্ট ও পরিষ্কার থাকে। কিন্তু গাছগুলো যখন আপন শিরা-উপশিরা দ্বারা সেই পানি নিজেদের মধ্যে শুষে নেয়, তখন মূলত যে গাছের যে স্বাদ, সে পানিকে সেভাবেই বদলে নেয়। পানি পেয়ে তিক্ত গাছের তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পায় এবং মিষ্ট গাছের মিষ্টতাও তেমনি বেড়ে যায়। জ্ঞানের অবস্থাও তাই। যে জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যেরূপ সাহসিকতা ও অভিলাষ থাকে, সে জ্ঞান তার জন্য তেমনি হয়ে যায়। এর জন্য অহংকারীর অহংকার এবং বিনয়ীর বিনয় বৃদ্ধি পায়।

অহমিকার অধিকারী, যার লক্ষ্য হচ্ছে নিজের বীরত্ব প্রকাশ, সে জাহেল। যখন সে জ্ঞানার্জন করে, তার অহংকার বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর লোক

যখন অজ্ঞতা সত্ত্বেও ভীত থাকে তখন তার ইলম বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জানে যে, ইলমের কারণে তার ওপর পাকড়াও-হিসাব বেশি হবে তখন সে বিনয়ী ও মুত্তাকি হবে। সুতরাং ইলম হচ্ছে অহংকারের একটি বড় কারণ।

তাইতো আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেছেন,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

এবং যে সকল মুমিন আপনার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি সদয় হোন। (সূরা শুআরা : ২১৫)

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ.

যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন, তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়তো। (সূরা আলে ইমরান : ১৫৯)

এবং আল্লাহ তাঁর অলীদের ব্যাপারে বলেছেন,

اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ.

তারা মুমিনদের প্রতি কোমল ও কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। (সূরা মায়েদা : ৫৪)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এমন এক সম্প্রদায় রয়েছে বা হবে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করবে কিন্তু তা কণ্ঠনালীর উপরেই থেকে যায়। তারা বলবে, আমরা কুরআন পড়েছি। কে আমাদের থেকে ভালো কারী রয়েছে এবং আমাদের থেকে বড় আলেম আর কে আছে? এরপর রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বলেন, তারা তোমাদের মধ্য থেকেই এবং তারাই জাহান্নামের ইন্ধন। (আযযুহদ, ইবনুল মুবারক : ১৫২)

এজন্যই ওমর (রা) বলেছেন, অহংকারী আলেম হয়ো না, যাতে তোমাদের ইলম অজ্ঞাতার বরাবর না হয়ে যায়।

তাইতো তামিমে দারি (রা) ওমর (রা)-এর কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন ওয়াজ ও ঘটনা বর্ণনা করার জন্য। এরপর ওমর (রা) বলেন, এটা জবাই করার বরাবর। এক ব্যক্তি ফজরের পর ওয়াজ করার অনুমতি চান। এরপর ওমর (রা) উত্তর দেন, আমার ভয় এ কারণে যে, তুমি অহংকারে সুরাইয়া তারকা না হয়ে যাও।

একাবর হুযাইফা (রা) কিছু লোকের ইমামতি করেন। নামাযের পর ঘোষণা দেন। আমার পরিবর্তে অন্য কোনো ইমাম তালাশ করো অথবা একা নামায পড়ো। কেননা, নামাযের মধ্যে আমার অন্তরে এ বিষয়টি এসেছে যে, এসব লোকের মধ্যে আমিই উত্তম। সুতরাং যখন হুযাইফা (রা)-এর মতো ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত নয় (অর্থাৎ, তিনি অহংকারকে ভয়াবহ খারাপ মনে করতেন) তাহলে এই উম্মতের পরবর্তী লোকেরা কীভাবে বেঁচে থাকবে? এ পৃথিবীতে এমন লোক পাওয়া মুশকিল, যিনি আলেম কিন্তু তার অন্তরে অহংকার নেই। আর যদি এমন কাউকে পাওয়া যায় তাহলে সে তার যুগের সিদ্দীক। তার আঁচল আকড়ে ধরে থাকা উচিত। তার চালচলন ওঠাবসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা তো ভালো ও সওয়াবের কাজই। এছাড়াও তার দিকে তাকানো তার সাথে সাক্ষাৎ করাও সওয়াবের কাজ। যদি এমন কোনো ব্যক্তি পাওয়া যায় তাহলে তার সংশ্রব অর্জন করা থেকে বিরত থাকবো না। কিন্তু আপসোস! যুগ এ ধরনের ব্যক্তিত্ব আর জন্ম দেয় না।

যদি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে এই বর্ণনা না থাকত যে,

سَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ تَمَسَّكَ فِيْهِ بِعُشْرِ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ نَجَا.

এমন এক যুগ আসবে, যদি সেই যুগের লোকেরা তোমাদের আমল, আখলাকের দশ ভাগের এক ভাগও অর্জন করে তাহলে সে মুক্তি পাবে।

তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। আমাদের বদ আমলের এ অবস্থা যে, হতাশ ও নিরাশা ছাড়া কিছুই নেই। এমন আমলও নেই, যার দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে। যদি মুক্তি পাওয়া যায় তাহলে এটা আল্লাহর দয়া। হাদিসে এক দশমাংশ অর্জনকারীর জন্য সুসংবাদ রয়েছে। আমাদের জন্য তো এতটুকুও করা সম্ভব হয় না। আল্লাহর কাছে আবেদন করি, যাতে তাঁর সন্তুষ্টিমূলক কাজ করতে পারি।

অহংকারের দ্বিতীয় কারণ আমল

অর্থাৎ, ইবাদত। অনেক দুনিয়াবিমুখ ইবাদতকারী অহংকার, সম্মান ও মানুষকে আকৃষ্ট করার প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তাদের আচার-ব্যবহার থেকেও দুনিয়াবি ও আখেরাতমুখী উভয় ধরনের কাজকর্মে

অহংকার অনুভূত হয়। দুনিয়াবি কাজকর্মে তাদের নিকট মানুষের আসা, মানুষের নিকট তাদের যাওয়ার তুলনায় উত্তম গণ্য হয়। তারা মানুষের নিকট আশা করে যে, মানুষ তাদের অভাব-অনটন দূর করুক, সমীহ করুক, পরহেযগার ও খোদাভীরু প্রচার করুক। আখেরাতের ব্যাপারে তাদের গর্ব এই যে, তারা নিজেদের মুক্তিপ্রাপ্ত এবং অন্য সকলকে ধ্বংসপ্রাপ্ত মনে করে। মূলত তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, সব মানুষ ধ্বংস হয়ে গেছে— যখন তোমরা কাউকে এ কথা বলতে শুন তখন মনে করো, সর্বাধিক ধ্বংস সেই হবে।

এ কথা এজন্য বলেছেন, লোকদের ধ্বংসের দাবি করা এটা এ কথার প্রমাণ যে সে লোকেদের তুচ্ছ জ্ঞান করছে, এতটুকু নয় যে সে নিজের কথার মাধ্যমে মানুষকে হেয় মনে করেছে বরং সে আল্লাহর আযাব থেকে নির্ভিক। তার জানা নেই যে, সে কেন এতো নির্ভিক। শাস্তির জন্য তার অন্য বিষয় বাদই দেওয়া হোক। শুধু মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছন,

كَفٰى بِالْمَرْءِ شَرًّا اَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

মানুষের ধ্বংসের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে অপর মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। (সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪)

যে ব্যক্তি ইবাদতকারীকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসে এবং আল্লাহর ইবাদতের কারণে তার সম্মান করে, তার মাঝে এবং ইবাদাতকারীর মাঝে অনেক ব্যবধান রয়েছে। সে মুক্তি পাবে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে শামিল হবে। কিন্তু ইবাদতকারী যেহেতু মানুষকে হেয় জ্ঞান করে তাদের নিকট আসা-যাওয়া করতে ঘৃণা করতো, একারণে সে আল্লাহর গযবের উপযোগী হবে। অবাক করার বিষয় যে, মানুষ তো তাকে ভালোবাসার জন্যে তার ইবাদতের মর্যাদা পাবে, অথচ সে নিজেই মানুষকে হেয় মনে করার ফলে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হবে।

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক লোকের মধ্যে মারামারি পছন্দীয় হওয়ার কারণে সবার মাঝে গুন্ডা হিসেবে খ্যাত ছিল। অপরদিকে অন্য

এক লোক প্রচুর ইবাদতের কারণে "আবেদ" নামে খ্যাত ছিল। তার বেশি ইবাদতের ফলস্বরূপ একখণ্ড মেঘ তাকে সব সময় ছায়া দিতো। একদিন গুন্ডা লোকটি আবেদের নিকট দিয়ে গমনের সময় মনে মনে চিন্তা করল— এ আবেদ ইবাদতে অনেক নামধাম করেছেন। আমি তো একজন গুন্ডা। তার নিকট বসলে আল্লাহ হয়তো আমার প্রতি রহম করতে পারেন। এরপর সে ভক্তি সহকারে আবেদের নিকট গিয়ে বসল। এদিকে আবেদ ভাবল— আমি তো একজন আবেদ। এ গুন্ডা লোকটি এখানে কী কারণে বসে? এ ভেবে সে গুন্ডাকে বলল, যা এখান থেকে। আল্লাহ তাআলা সে সময়ের নবীর নিকট ওহি পাঠালেন, তাদের উভয়কে নতুন করে আমল করতে বলো। আমি গুন্ডাকে মাফ করেছি এবং আবেদের সকল ইবাদত বরবাদ করে দিয়েছি। এরপর মেঘখণ্ডের ছায়াও গুন্ডার ওপর চলে গেল।

এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল, আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরের অবস্থা দেখেন। যদি কোনো জাহেল ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে বিনয়ী হয় এবং অন্তরে অনুতপ্ত হয় তো এটা এই বিষয়ের প্রমাণ যে সে অন্তরে আল্লাহর ইবাদত করেছে। সে ব্যক্তি অনেক অহংকারী আলেম ও আবেদ থেকে উত্তম। এমনিভাবে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি এক আবেদের কাছে উপস্থিত হয় এবং সেজদায় পড়ে যায়। আবেদ তার মাথার উপর পা রাখে এবং বলে, মাথা উঠাও আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করবে না। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসল, সে তো ক্ষমা পাবে; কিন্তু তুমি ক্ষমা পাবে না।

এমনিভাবে হাসান বসরি (র) বলেন, কম্বল পরিহিত ব্যক্তি রেশমি কাপড় পরিহিত ব্যক্তির থেকে বেশি অহংকারকারী হয়ে থাকে। কেননা রেশমি কাপড় পরিহিত ব্যক্তি কম্বল পরিহিত ব্যক্তির সাথে নরম ব্যবহার করে এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস করে আর কম্বল পরিহিত ব্যক্তি মনে করে একমাত্র সে-ই শ্রেষ্ঠ।

আরেকটি মুসিবতও রয়েছে, যার থেকে অল্পসংখ্যক আবেদই মাহফুজ রয়েছে। আর সেটা হচ্ছে, যদি কেউ তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে অথবা তাকে কষ্ট দেয় তাহলে সে এটা অমার্জনীয় অপরাধ ভেবে মনে করে আল্লাহ তাকে কখনো মাফ করবেন না। উক্ত কাজের কারণে আল্লাহর কাছে সে

অভিশপ্ত হয়ে গিয়েছে। আর যদি অন্য কোনো মুসলমানের সাথে এ আচরণ হতে দেখে তাহলে তা তার অন্তরে কোনো রেখাপাত করে না। এর কারণ হচ্ছে, সে নিজের মর্যাদার দাবিদার অথচ তার দাবি সরাসরি অজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে। কিছু লোকের বোকামি তাদেরকে এ ধরণের দাবির ওপর বাধ্য করে। এর শেষ পরিণাম খারাপই হবে। সে তার কর্মের শাস্তি পাবে। আর ঘটনাক্রমে তাকে কষ্টদাতা কোনো মুসিবতে আক্রান্ত হয়ে যায় তখন এই আবেদ ওটাকে নিজের কারামত মনে করে এবং বলে, আল্লাহ আমার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। সে এই বিষয়টি লক্ষ করে না যে, কাফের মুশরিকরা আল্লাহ ও রাসূল (স)-কে গালি দিয়েছে এবং এমন লোকও অতিবাহিত হয়েছে, যারা নবীদের বিভিন্ন ধরনের কষ্ট দিয়েছে এবং কয়েকজনকে হত্যাও করেছে। এসত্ত্বেও আল্লাহ তাদের ছাড় দিয়েছেন। দুনিয়াতে তাদের কোনো শাস্তি দেননি বরং পরবর্তীতে অনেকে ইসলামও গ্রহণ করেছেন। ফলে দুনিয়াতে না তার শাস্তি হয়েছে আর না পরকালে। এই জাহেল, অহংকারকারী আবেদ এই ধরণায় রয়েছে যে আমি আল্লাহর নিকটবর্তী, তাইতো তিনি প্রতিশোধ নিয়েছেন অথচ নবীদের সাথেও খারাপ আচরণ কারীদের থেকে প্রতিশোধ নেননি। এই আবেদ তার অহংকারের কারণে যে সে আল্লাহর অভিশাপের কারণ হচ্ছে তা বুঝতেই পারছে না এবং নিজের ধ্বংসের ব্যাপারে গাফেল। তার এ ধারণা অহংকারীদের সাথে মিল রাখে, যারা জ্ঞাশূন্য। জ্ঞানী ও বিচক্ষণ আবেদ তো এটা মনে করে যে যেমনটি আতা সুলামি (র) মনে করতেন, তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, অন্ধকার ছেয়ে গেলে অথবা বিদ্যুৎ চমকানোর সময় আতা সুলামি বলতো, লোকেদের উপর যেই মুসিবত আপতিত হয়েছে তার কারণ হচ্ছি আমি। যদি আমি মারা যাই তাহলে লোকেরা মুক্তি পেত অথবা বিচক্ষণ আবেদ এভাবে বলবে, যেমন এক ব্যক্তি আরাফা থেকে ফিরে আসার পর বলেছিল, আমি যদি না হতাম তাহলে সকল হাজিদের জন্য রহমতের আশা করা যেতো। উভয়ের মাঝে কী বড় ধরনের পার্থক্য! এক ব্যক্তি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ উভয় দিক দিয়েই আল্লাহকে ভয় করে। নিজের নফসের ওপর ভয় করে। নিজের আমলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে এবং আমলকে আরও সুন্দর কীভাবে বানানো যায় সে প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

আর দ্বিতীয় ব্যক্তি, যে তার অন্তরে অহংকার, ধোঁকাবাজি, হিংসা লুকিয়ে রেখেছে এবং শয়তানের খেলার পাত্র হয়ে আছে এবং এ ধারণা করে যে নিজের আমল দিয়ে সে আল্লাহর ওপর অনুগ্রহ করছে। আর এটা বাস্তব সত্য যে, যে ব্যক্তি মনে করে আমি অমুকের চেয়ে বড়, তার সব আমল বেকার হয়ে যাবে। সে তার অজ্ঞতার কারণে তার আমলের পাথেয় শেষ করে দিয়েছে। অজ্ঞতা নিকৃষ্ট পাপ। আল্লাহ থেকে বান্দাকে দূরে সরিয়ে দিতে অজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কোনো কিছু নেই। নিজের ব্যাপারে এ ধারণা করা যে তার থেকে বড় কোনো ব্যক্ত নেই, এটা মস্তবড় অজ্ঞতা এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভিক হওয়ার আলামত অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ.

ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ই আল্লাহর শাস্তি থেকে নির্ভয় থাকে। (সূরা আরাফ : ৯৯)

বর্ণিত আছে, একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে কোনো এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলো। একদিন ওই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসলো। তখন রাসূলের সামনে উপস্থিত সাহাবিরা বললেন, ইনিই সেই ব্যক্তি যার আলোচনা করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি তার চেহারায় শয়তানের ছাপ দেখতে পাচ্ছি। ওই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে উপস্থিত হলো এবং সালাম দিলো। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর শপথ দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অন্তরে কি এটা নেই যে তুমি সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, এমনটা মনে হয়। রাসূলুল্লাহ (স) নবুওয়তের আলো দ্বারা ওই ব্যক্তির আভ্যন্তরীণ খারাবি দেখে ফেলেন। মোটকথা, অহংকার এমন একটি রোগ, যার মধ্যে সবাই নিপতিত। তবে যাদের আল্লাহ হেফাজত করেন তারা বেঁচে যান।

অহংকারের কারণে যে মুসিবত আসে ওই মুসিবতের দিক থেকে আলেম ও আবেদ তিন স্তরের—

প্রথম স্তর : অহংকার তার অন্তরে গেঁথে গেছে এবং সে নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করে, যদিও সে বিনয়ী থাকার চেষ্টা করে এবং এমন আমল করে যা বিনয়ী লোকেরা করে থাকে। এমন ব্যক্তির অন্তরে অহংকারের বৃক্ষ শিকড় গেড়েছে।

দ্বিতীয় স্তর : যে ব্যক্তি নিজের কাজের মধ্যে অহংকার প্রকাশ করে। যেমন, বৈঠকে উচ্চ আসনে বসে এবং কথায় সাথীদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি তার সম্মান প্রদানে অলসতা করবে তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়। আর আলেমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা অন্যদের থেকে চেহারা ফিরিয়ে বিমুখতা দেখায় আর আবেদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারা ভ্রুকুঞ্চিত করে। কেমন যেন সে তাদের অপছন্দ করছে বা তাদের ওপর রাগও করছে, যা এই হতভাগাদের জানা নেই। এসবের মাঝে পরহেযগারি নেই।

বরং পরহেযগারি হচ্ছে অন্তরের বিষয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তাকওয়া এখানে এবং বুকের দিকে ইশরা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চরিত্রবান ও মুত্তাকি এবং হাস্যোজ্জ্বল এবং প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। এজন্য সাহাবি হারেস বিন জায (রা) বলেন, শিক্ষিত লোকেদের মধ্য থেকে ওই সব লোকেদের আমার ভালো লাগে, যারা আন্তরিক, হাস্যোজ্জ্বল। আল্লাহ তাআলা তাদের পরিমাণ কম করুন যারা ভ্রুকুঞ্চিত করে শুকনো মুখে মানুষের সাথে মিশে ও কথা বলে এবং তার অনুগ্রহ অন্যের ওপর রয়েছে বোঝায়। আল্লাহ তাআলার যদি অহংকার পছন্দই হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ নির্দেশ দিতেন না।

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.

এবং যে সকল মুমিন আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি সদয় হোন। (সূরা শুআরা : ২১৫)

এই দুই স্তরের অধিকারী হচ্ছে ওইসব লোক, যাদের কথাবার্তা, চালচলনে অহংকার প্রকাশ পায়। এর পরও তারা তৃতীয় স্তরের লোকেদের চেয়ে কম আক্রান্ত।

তৃতীয় স্তর : ওই সব লোক, যাদের মুখে সর্বদা অহংকারে কথা বের হয়। এমনকি তারা সব সময় তা দাবি করতে থাকে এবং গর্ব ও অহমিকার কথা বলতে থাকে। নিজের আত্মশুদ্ধি প্রকাশ করতে থাকে এবং ইলম ও আমলে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কৌশল করতে থাকে। যেমন, আবেদ অন্যের ওপর অহংকার করে এ ধরনের কথা বলতে থাকে যে সে কোথাকার আবেদ? সে কী ইবাদত করে? তার পরহেযগারি কোথায়? তার

ভুল, দোষ খুঁজে বের করে বলতে থাকে। অতঃপর নিজের কামালাত বয়ান করতে থাকে যে আমি এতদিন যাবত ইফতার করিনি অথবা বলে, আমি রাতে ঘুমাই না। প্রতিদিন একবার কুরআন খতম করি। আর অমুক ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাকে। সে বেশি তেলাওয়াত করে না। এ তো হলো স্পষ্ট ভাষায় নিজের প্রশংসা আর কখনো ইশারা ও ইঙ্গিতে, নিজের প্রশংসা করে থাকে যে অমুক ব্যক্তি আমার সাথে বেআদবি করেছে ফলে তার সন্তান মারা গেছে অথবা বলে, তার সম্পদ লুট হয়ে গেছে অথবা বলে, সে অমুক রোগে আক্রান্ত হয়ে গেছে।

এমনিভাবে বলে সে নিজের কারামত প্রকাশ করে। ঘটনাক্রমে এসব লোক যদি রাত্রি জাগরণে বাধ্য হয় তখন নিরুপায় হয়ে রাত্রি জাগরণ করে এবং খুব নামায পড়ে। এমনিভাবে ইবাদতেও শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে, যাতে লোকেরা এ কথা না বলতে পারে যে, তার থেকে অমুক ব্যক্তিতো বেশি ইবাদত করে এবং তার থেকে শক্তিশালী।

আলেম এভাবে অহংকার করে যে, সে দাবি করে, তার সমসাময়িক অন্য ওলামায়ে কেরামের চেয়ে তার বিভিন্ন শাস্ত্রের জ্ঞান বেশি। আমি সব ফনের অধিকারী আমার কাছে সবকিছু স্পষ্ট। আমি অমুক অমুক শায়খ ও ওস্তাদ পেয়েছি, তাদের কাছে পড়েছি। আর তুমি! তোমার অবস্থাইবা কী? তুমি কার কাছে পড়েছো? এসব কথা সে এজন্য বলে, যাতে উপস্থিত ব্যক্তিকে হেয় জ্ঞান করা যায় এবং নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করা যায়। আর মুনাজারার সময় সর্বাত্মক চেষ্টা করে, যাতে প্রতিপক্ষের ওপর বিজয় লাভ করতে পারে। নিজে কখনো পরাস্ত হতে চায় না। সে দিনরাত এমন ইলম অর্জনে অতিবাহিত করে, যার দ্বারা মাহফিলে নিজেকে বরিত ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে। যেমন ইলমে মুনাজারা, জাদাল, বাকপটুতা, ইবাদত দৃষ্টিনন্দ ইত্যাদি। এত কষ্ট ত্যাগ এজন্য করে যাতে সমসাময়িক আলেমদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারে। সে হাদিসের শব্দ সনদসহ হিফজ করে ফেলে, যাতে ভুল ধরতে পারে। এভাবে সে নিজের ইলম ও ফযিলত সকলের মাঝে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। একারণেই যখন কেউ ভুল করে তখন শুধু এই ধারণায় খুশি হয় যে আমি তার ভুল ধরতে পারবো আর ওই ব্যক্তি ভুল না করলে আপসোস করতে থাকে এবং এ ভয় করতে থাকে যে, লোকেরা না জানি ওই ব্যক্তিকে বড় আলেম ভেবে বসে।

এ সকল বিষয় অহংকারের ফল। ইলম ও আমলের মাধ্যমে বড় হওয়া ওইসব আচরণের মূল কারণ। কে আছে যে উপরিউক্ত সব বিষয় বা আংশিক থেকে মুক্ত। আমার বোঝে আসে না, যে ব্যক্তি উপরিউক্ত চরিত্রের অধিকারী, সে আবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিস ও জানে, তা হচ্ছে 'যার অন্তরে সরিষাদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না' এরপরও সে কীভাবে অহমিকা দেখায়! রাসূলুল্লাহ (স) তো তাকে জাহান্নামী বলেছেন আর জাহান্নামী কি সম্মানী হয়? সম্মানীতো তারা হয় যারা উপরিউক্ত দোষমুক্ত হবে। যার অহংকার করবে না। প্রকৃত আলেম ওই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর ওই বাণী তার বাস্তব অর্থে বিশ্বাস করে। তা হচ্ছে 'আমার কাছে তোমার মূল্যায়ন ততক্ষণ থাকবে, যতক্ষণ তোমার অন্তরে তোমার মূল্যায়ন থাকবে না। তুমি যদি নিজ অন্তরে নিজের কোনো মর্যাদা দেখো তাহলে আমার কাছে তোমার কোনো মর্যাদা নেই।' যে ব্যক্তি বা আলেমের মধ্যে এই অনুধাবন নেই তাকে আলেম বলা যায় না।

অহংকারের তৃতীয় কারণ বংশ-মর্যাদা

যার বংশ কুলীন, সে নিচ বংশের লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তারা শিক্ষা-দীক্ষা ও কর্মে বড় থাকলেও। কেউ কেউ বংশগত গর্বে এতটা অন্ধ যে, তারা অন্যদের মনে করে গোলাম এবং তাদের সাথে ওঠাবসা, চলাচল করতে ঘৃণা করে।

বংশ গরিমার ফল হচ্ছে মুখ দিয়ে এভাবে প্রকাশ পায় যে অপর ব্যক্তিকে বলে, হে নাবতি, হিন্দি, আরমানি! কে তুমি? তোমার বাপ কে? আমি অমুকের ছেলে অমুক। তোমার কী মর্যাদা আছে যে আমার সাথে কথা বলছো? আমার দিকে তাকাচ্ছো?

কুলীন বংশের ধার্মিক ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও এ রোগ থেকে মুক্ত নয়। কিন্তু সাধারণভাবে এটা তাদের মধ্যে গোপন থাকে— মুখে ফুটে ওঠে না। তবে রাগের প্রাধান্যে জ্ঞানবুদ্ধির আলো বিলীন হয়ে যায়। তখন কথার্বাতায়ও অহংকার প্রকাশ পায়।

এক বর্ণনায় আবু যর (রা) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপস্থিতিতে এক ব্যক্তির সাথে আমার কথা কাটাকাটি হয়। রাগের মাথায়

আমি তাকে বলে বসলাম— হে কৃষ্ণাঙ্গ নারীর সন্তান! রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বললেন, হে আবু যর!

طَفَّ الصَّاعِ طَفَّ الصَّاعِ لَيْسَ لِابْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَى ابْنِ السَّوْدَاءِ فَضْلٌ.

অর্থাৎ, 'উভয় পাল্লা সমান। কৃষ্ণাঙ্গ নারীর সন্তানের ওপর শ্বেতাঙ্গ নারীর সন্তানের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।' (তারিখে দিমাশক : ১০:৪৬৪)

আবু যর (রা) বলেন, প্রিয়নবীর এ কথা শুনে আমি মাটিতে শুয়ে গেলাম এবং লোকটিকে বললাম, তুমি আমার গলায় লাথি মারো। লক্ষণীয় যে, আবু যর (রা) নিজেকে যখন শ্বেতাঙ্গ নারীর সন্তান বলে গর্ব করলেন তখন আল্লাহর রাসূল (স) তাঁকে কীভাবে সাবধান করে দিলেন। আরও লক্ষ করার বিষয় যে, তিনি কীভাবে তাওবা করলেন এবং মন থেকে অহংকারের শিকড় উপড়ে দিলেন। তিনি বুঝে নিলেন, সম্মানের শিকড় অসম্মান ছাড়া উৎপাটিত হয় না। তাই যার সঙ্গে অহংকার করেছিলেন, তারই পায়ের নিচে নিজ গলা এগিয়ে দিলেন।

এধরনের আকেরটি ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে দুই ব্যক্তি অহংকার প্রদর্শন করছিল। একজন আরেকজনকে বলছিল, আমি অমুকের ছেলে অমুক। কিন্তু তুমি কে? তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, দুই ব্যক্তি মুসা (আ)-এর সামনে পরস্পর অহংকার প্রদর্শন করছিল। তখন একজন বলল, আমি অমুকের ছেলে অমুক। এরপর পূর্বপুরুষের নাম উল্লেখ করতে গিয়ে নবম পুরুষ পর্যন্ত উল্লেখ করল এরপর আল্লাহ তাআলা মুসা (আ)-এর কাছে ওহি নাযিল করলেন, হে মুসা! তুমি বলে দাও, যে ব্যক্তি অহংকার করেছ তোমার ওই নয় পুরুষ জাহান্নামি। আর তুমি হচ্ছো দশম জাহান্নামি। (মুসনাদে আহমদ : ৮:২৫৪)

এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ، إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجِعْلَانِ الَّتِيْ تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ.

লোকেরা নিজেদের (কফের) পূর্বপুরুষের গৌরব করে থাকে অথচ তারা জাহান্নামে কয়লা হয়ে গেছে অথবা আল্লাহর কাছে এমন কীট থেকেও নিকৃষ্ট, যেগুলো তাদের নাক দিয়ে ময়লা দূর করে। (আবু দাউদ : ৫১১৬)

অহংকারের চতুর্থ কারণ রূপ-লাবণ্য

এ রোগটি মহিলাদের মধ্যে বেশি পাওয়া যায়। অহংকারের আতিশয্যে অপরের ত্রুটিবিচ্যুতি ও গীবত মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, একবার এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর দরবারে আসলে আমি হাতের ইশারায় বললাম, 'বেঁটে'। এতে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আয়েশা! তুমি তার গীবত করেছ। বলার অপেক্ষা রাখে না, গোপন অহংকারই এর কারণ ছিল। আয়েশা (রা) নিজে যদি বেঁটে হতেন, মহিলাকে বেঁটে বলতেন না। তিনি যেন নিজের দেহাবয়বকে উত্তম ভেবে তা বলেছেন।

পঞ্চম কারণ ধনসম্পদ

এ ধরনের অহংকার রাজা-বাদশারা তাদের বিত্ত-বৈভব নিয়ে, ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক জমানো ধনসম্পদ নিয়ে, গ্রামীণ লোকেরা তাদের জায়গা-জমি নিয়ে এবং জৌলুসকারীরা তাদের পোশাক ও বাহন নিয়ে করে থাকে। সুতরাং ধনী লোক গরীব লোকদের সাথে অহংকার করে বলে, মিয়া! তুমি তো ভিখেরি-মিসকিন। ইচ্ছা করলে তোমাকে কিনে নিতে পারি। আমি তোমার চেয়েও বড় ব্যক্তি থেকে খেদমত নিয়েছি। তুমি কে? তোমার সাথে কে আছে? আমার ঘরের আসবাব পত্র তোমার সমস্ত সম্পদের সমান। আমি একদিন যে পরিমাণ খরচ করি, তুমি তা সারা বছরেও খাও না।

ধনী হওয়ার বিপদ ও দারিদ্র্যের ফযিলত সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই ধনীরা এ ধরনের কথাবার্তা বলে। কুরআন পাকে এ ফযিলতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّ اَعَزُّ نَفَرًا.

অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সে তার বন্ধুকে বলল, ধনসম্পদে আমি তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জনবলে তোমার অপেক্ষা শক্তিশালী। (সূরা কাহফ : ৩৪)

জবাবে সঙ্গী বললো,

اِنْ تَرَنِ اَنَا اَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا. فَعَسٰى رَبِّيْۤ اَنْ يُّؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيْدًا زَلَقًا. اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيْعَ لَهٗ طَلَبًا.

তুমি যদি সম্পদে ও সন্তানে আমাকে তোমার অপেক্ষা তুচ্ছ মনে কর— তবে হয়তো আমার প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু দেবেন এবং তোমার বাগানে আকাশ থেকে নির্ধারিত কোনো বিপর্যয় প্রেরণ করবেন। যার ফলে তা উদ্ভিদশূন্য ময়দানে পরিণত হবে অথবা তার পানি ভূগর্ভে নেমে যাবে এবং তুমি কখনো তার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না। (সূরা কাহফ : ৩৯-৪১)

কারুনের অহংকারও ছিল তেমনই। সে যখন খুব সাজগোজ করে নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে উপস্থিত হতো তখন তারাও তার মতো ধন-সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত।

অহংকারের ষষ্ঠ কারণ দৈহিক শক্তি

যা নিয়ে দুর্বল অক্ষমদের সাথে অহংকার করা হয়।

সপ্তম কারণ অনুগামী, সাহায্যকারী, শাগরিদ, চাকর-বাকর, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের আধিক্য

রাজা-বাদশারা অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে এবং শিক্ষিকরা অধিক ছাত্র নিয়ে অহংকার করে— যদিও তাদের সৈন্যসামন্ত ও ছাত্রবর্গ সর্বনাশ ও আযাবের কারণ হয়। মোটকথা, ওই নিয়ামতের ওপর গর্ব করা যায় যাকে পূর্ণতামণ্ডিত বলা যায়। যদিও বাস্তবে হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যেমন মুখান্নাস। যারা মুখান্নাস না তাদের ওপর গর্ব করতে পারে এভাবে যে, তার মাখলুকের ব্যাপারে যে পরিমাণ জ্ঞান রয়েছে যা অন্য কারও নেই। সে তার কর্মকে ভালো মনে করছে। যদিও তার কর্ম শাস্তির কারণ। এমনিভাবে ফাসেক, মদখোর তার সহযাত্রীদের ওপর গর্ব প্রকাশ করে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করে অথচ তাদের এই ধারণা মূর্খতার ছাড়া আর কিছু না। এহচ্ছে ওইসব বিষয়, যার দ্বারা মানুষ গর্ব করে থাকে ওইসব লোকের ওপর, যারা এসবের অধিকারী নয় অথবা আছে; কিন্তু কম।

অহংকারের প্রতি প্রবৃত্তকারী বিষয়সমূহ

ইতঃপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অহংকার একটি অভ্যন্তরীণ রোগ। এ রোগের কারণে যে সব কাজ প্রকাশ পায় তা-ই অহংকারের ফলাফল। ওই কাজ ও চরিত্রকে অহংকার বলা হবে। অহংকার অভ্যন্তরীণ বিষয়ের নাম,

যার অর্থ হচ্ছে নিজেকে বড় মনে করা অন্যের ওপর। এর কারণ হচ্ছে আত্মপ্রীতি। সামনে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। মানুষ যখন নিজেকে এবং তার ইলম ও আমলকে বা নিজের অন্য কোনো বিষয়কে পছন্দ করবে তখন অন্যের ওপর নিজেকে বড় মনে করবে।

জাহেরি অহংকারের তিনটি স্তর রয়েছে,

প্রথমটি অহংকারকারীর মধ্যে হয়। দ্বিতীয়টি যার সাথে অহংকার করা হয় তার মধ্যে আর তৃতীয় আরেকটি কারণ যা এদুয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে না। যে কারণটি অহংকারকারীর মধ্যে পাওয়া যায় তা হচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ আর অপর দুই ক্ষেত্রে পাওয়া যায় রিয়া। তাহলে সার্বিকভাবে চারটি কারণ হলো, ১. আত্মপ্রীতি ২. শত্রুতা ৩. হিংসা ৪. কপটতা।

আত্মপ্রীতি : এ ব্যাপারে আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি যে, এর কারণে অভ্যন্তরীণ অহংকার সৃষ্টি হয়। অতঃপর ভিতর থেকে কাজে, কথায়, আচরণে প্রকাশ পায়।

শত্রুতা : এটা আত্মপ্রীতি ব্যতীতও অহংকারের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি অপরকে নিজের সমতুল্য বা বড় মনে করে। কিন্তু কোনো কারণে তার ওপর অসন্তুষ্ট হলো। যার ফলে তার ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো এবং এত প্রবল হলো যে এখন আর তার সাথে বিনয় ও নম্র আচরণ করতে পারে না। যদিও সে জানে যে ওই ব্যক্তি তার সমকক্ষ বা বড় হওয়ার কারণে বিনয় ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য। কত নিকৃষ্ট ব্যক্তি রয়েছে, যে আকাবির মনীষীদের সাথে বিদ্বেষ রাখে। এই বিদ্বেষ তাদের হক কথা বলতে ও মেনে নেওয়ার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যদি হক কথা এমন ব্যক্তি বলে যার ব্যাপারে তার অন্তরে বিদ্বেষ রয়েছে, সে সেই হক কথা গ্রহণ করতে পারে না এবং চেষ্টা করে তার আগে থাকার। কিন্তু সে জানে, সে আগে থাকার যোগ্য নয়। আর যদি তার ওপর জুলুম করে, এরপর না তার কাছে মাফ চায়, না ওযর পেশ করে। তার অজ্ঞাত বিষয় সে তার কাছে জিজ্ঞেসও করে না।

হিংসা : হিংসার কারণে যার সাথে হিংসা করা হয় তার ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। যদিও ওই ব্যক্তি তাকে কোনো কষ্ট না দিয়ে থাকে বা এমন কোনো কারণও না পাওয়া যায় যার কারণে হিংসা করা যায়।

হিংসার কারণে মানুষ হক কথা ছেড়ে দেয় এবং নসিহত গ্রহণ করে না। অনেক জাহেল ব্যক্তি এমন পাওয়া গেছে, যে ইলমের আগ্রহ রাখে কিন্তু তার জাহালাত বা অজ্ঞতা তার আগ্রহের প্রধান প্রতিবন্ধক। কেননা, সে তার শহরের আলেমদের সাথে বিদ্বেষ রাখে। হিংসা করার ফলে তাদের থেকে ইলম অর্জন করতে পারে না। এটা জানা সত্ত্বেও সে হিংসা করে যে ওই আলেম তার থেকে বড় এবং সে তার থেকে সম্মান পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু হিংসা তাকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাই তার সাথে সে অহংকারী ব্যক্তিদের মতো আচরণ করে। অন্তরে যদিও এ ধারণা রাখে যে সে তার সমকক্ষ নায়।

কপটতা : রিয়াও অহংকারীদের চরিত্র দাবি করে। এমনকি মানুষ তার থেকে বড় ব্যক্তিদের সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। দুজনের মাঝে পূর্বপরিচিতি ও হিংসা না থাকা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তির সামনে বিনয়ী হয় না। এবং তার হক কথাও মেনে নেয় না। নসিহত গ্রহণ করে এজন্য যে মানুষ যাতে এ ধারণা না করে বসে তার চেয়ে ওই ব্যক্তি বড় আলেম। মোটকথা, এই অহংকারের মূল কারণ হচ্ছে রিয়া বা কপটতা। আর যদি এমন জায়গায় ওই আলেমের সাথে সাক্ষাৎ হয় যেখানে কেউ নেই তখন আবার অহংকার দেখায় না। এর বিপরীত হচ্ছে যারা আত্মপ্রীতি, বিদ্বেষ, হিংসার কারণে অহংকার করে তারা নির্জনেও তাদের অহংকার থেকে ফিরে আসে না। কতিপয় লোক রিয়ার কারণে উচ্চবংশীয় ভাব নেয়। অথচ সে জানে তার দাবি মিথ্যা। কিন্তু এই বংশ গরিমার মাধ্যমে অহংকার করে থাকে।

মজলিসে উঁচুস্থানে গিয়ে বসে। রাস্তায় আগে আগে চলে। সম্মান মর্যাদায় তার সমকক্ষ ব্যক্তিকে পছন্দ করে না। অথচ সে জানে, সে এই বাড়াবাড়ির যোগ্য নয়। কেননা তার মিথ্যা বংশ গরিমার বিষয়টি তার জানা আছে তাই সে ভিতরে অহংকার করে না; কিন্তু রিয়া তাকে অহংকারীদের ন্যায় আচরণ করতে বাধ্য করে।

সাধারণত অহংকারী বলা হবে, যে ব্যক্তি পূর্বের আচরণ করবে ভিতরের অহংকারবশত, যা সৃষ্টি হয় আত্মপ্রীতি ও অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করার কারণে। রিয়ার কারণে অন্যকে তুচ্ছজ্ঞানকারীকেও অহংকারকারী বলা হয়, সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে।

বিনয়ীদের চরিত্র এবং বিনয় ও অহংকার প্রকাশকারী কাজ

অহংকার মানুষের অভ্যাস ও কর্মে প্রকাশ পায়। যেমন মুখ ফুলানো, চোখের কিনারা দিয়ে আড়চোখে তাকানো, মাথা একদিকে হেলিয়ে রাখা, হেলান দিয়ে বসা অথবা কথার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এমনকি শব্দ উচ্চারণ ও উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। অহংকার চলাফেরা, ওঠাবসায়ও হয়ে থাকে। কিছু অহংকারকারী এমন রয়েছে, যারা সব কাজে ও কথায় অহংকার করে থাকে। আর কিছু অহংকারী কিছু ক্ষেত্রে অহংকার করে আর কিছু ক্ষেত্রে বিনয় প্রকাশ করে। নিচে এর কিছু আলোচনা করা হলো।

১. কিছু লোক প্রত্যাশা করে যে অন্যরা তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। অথবা তাকে দেখে দাঁড়িয়ে যাবে। আলী (রা)-এর বাণী, যে ব্যক্তি কোনো জাহান্নামিকে দেখতে চায়, সে যেন ওই ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে নিজে তো আরামে বসে আছে কিন্তু তার সামনে একদল লোক আদবের সাথে দাঁড়িয়ে আছে।

আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সাহাবিদের যে পরিমাণ ভালোবাসা ছিল, অন্য কারও সাথে তা ছিল না। সাহাবিরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন রাসূলুল্লাহ (স) তা পছন্দ করেন না।

কিছু অহংকারী ব্যক্তি তার পিছনে যদি লোক না থাকে তাহলে সে চলতে অপছন্দ করে। আবদুর রহমান ইবনে আওফকে তার গোলাম ও খাদেমদের মধ্যে থেকে চেনা যেত না। কেননা তিনি একদম সাদামাঠা জীবনযাপন করতেন।

কিছু লোক হাসান বসরি (র)-এর পিছনে পিছনে চলতে লাগলে তিনি তাদের বাধা দেন এবং বলেন, তোমাদের এ আচরণ আমার অন্তর থেকে অনেক কিছু বের করে দিবে। মাঝে মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর সাহাবিদের নিয়ে চলার সময় সাহাবিদের সামনে রাখতেন এবং নিজে তাদের পিছনে পিছনে চলতেন। এরূপ করতেন সাহাবিদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য অথবা নিজ অন্তর থেকে শয়তানি ওয়াসওয়াসা দূর করার জন্য। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামাযের মধ্যে দামি পোশাক মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল তাই ওই পোশাকের পরিবর্তে পুরাতন পোশাক পরিধান করেন।

২. কিছু কিছু অহংকারকারীদের অবস্থা এরূপ হয় যে, সে অন্যের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায় না। চাই সাক্ষাৎ করলে দীনি লাভই হোক না কেন।

এ আচরণ বিনয় পরিপন্থি। বর্ণিত রয়েছে, সুফিয়ান সাওরি (র) রামাল্লা নামক স্থানে যান। ইবরাহিম বিন আদহাম (র) তাঁর কাছে এই বার্তা পাঠান যে, আমার কাছে আসুন এবং কিছু হাদিস শুনিয়ে যান। কেউ বলল, হে আবু ইসহাক! আপনি এত বড় আলেমকেও ডেকে পাঠান! উত্তরে তিনি বললেন, এভাবে আমি তার বিনয়ের পরীক্ষা নিচ্ছিলাম।

৩. এটাও অহংকারীদের অভ্যাস যে নিজের চেয়ে নিচু বংশের লোকেদের নিজের বরাবর বা পাশে বসাকে অপছন্দ করে; বরং তার সামনে আদবের সাথে বসাকে পছন্দ করে। এটাও বিনয়ের পরিপন্থি। ইবনে ওহাব (র) বলেন, আমি আবদুল আযিয ইবনে রাওয়াদ-এর কাছে বসে ছিলাম। আমার হাটু তাঁর হাটুর সাথে লেগে ছিল। আমি তার থেকে সরে গিয়ে বসতে চাইলাম তখন তিনি আমার কাপড় ধরে টান দিলেন এবং বললেন, তুমি আমার সাথে এ আচরণ কেন করছো? আমিতো তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন মদিনার (বাচ্চা) ছেলেমেয়েরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাত ধরতেন। এরপর তারা যতক্ষণ না হাত গুটিয়ে নেয় রাসূলুল্লাহ (স) নিজ থেকে কখনো হাত ছেড়ে দিতেন না।

৪. অহংকারীদের এটাও অভ্যাস যে তারা রোগীদের সাথে বসতে চায় না এবং তাদের থেকে দূরে থাকে। এটাও অহংকার। বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলো। তার চেহারায় গুটিবসন্ত এবং তার থেকে পুঁজ বের হচ্ছে। অপরদিকে রাসূলের পাশে বসে কিছু লোক খাবার খাচ্ছিল। ওই অসুস্থ ব্যক্তি মজলিসে আসল এবং দাঁড়িয়ে রইল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) উঠলেন এবং তাকে নিজের পাশে বসালেন।

ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর বাড়িতে রাতের বেলা একজন মেহমান এলো, তিনি তখন লেখালেখি করছিলেন। হঠাৎ প্রদীপের আলো কাঁপতে লাগল। মনে হলো নিভে যাবে। ওই মেহমান বললেন, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে বাতি ঠিক করে দিতে পারি। কারও জন্য উচিত নয় যে সে মেহমানের কাছ থেকে খেদমত নিবে। মেহমান বললেন, আমি কি

খাদেমকে ডেকে আনবো। তিনি বললেন, সে তো এখন শুয়ে আছে। অতঃপর তিনি নিজেই প্রদীপে তেল ভরলেন। মেহমান বললেন, হে আমিরুল মুমিনিন! আপনি একাজ নিজেই করেন! তিনি উত্তরে বললেন, আমি যখন তেল ভরার জন্য দাঁড়িয়েছি তখনও ওমর ছিলাম এবং যখন তেল ভরার কাজ শেষ করেছি তখনও ওমরই আছি। এ কাজের ফলে আমার কোনো কমতি বা ঘাটতি হয়নি। সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন যিনি বিনয়ী।

৫. কিছু অহংকারী নিজের জিনিসপত্র নিজে বহন করতে অপছন্দ করে। এটাও বিনয়ীদের আখলাকের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই নিজের জিনিসপত্র বহন করতেন। আলী (রা) বলেন, বাড়ির মালিকের জন্য নিজের জিনিস নিজে বহন করার দ্বারা তার মর্যাদা হানি হয় না এবং না তার মধ্যে কোনো ঘাটতি হয় বরং এতে তার মর্যদা আরও বৃদ্ধি পায়।

আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) যে সময়ে আমির ছিলেন, তিনি নিজেই পানির মটকা বহন করে গোসলখানায় নিয়ে যেতেন। ছাবেত বিন আবি মালেক বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা)-কে বাজার থেকে লাকড়ি বহনরত আসতে দেখেছি।

আসবাগ বিন নাবাতা (র) বলেন, আমি এখনও ওমর (রা)-এর ওই দৃশ্য দেখছি যে, তিনি বাম হাতে গোশত আর ডান হাতে দুধের পাত্র নিয়ে বাজারে ঘোরাফেরা করছেন।

এক তাবেয়ী বলেন, আলী (রা) এক দিরহাম দিয়ে গোশত ক্রয় করলেন এবং নিজের চাদরে তা রেখে হাঁটতে লাগলেন। তাবেয়ী বললেন, আমাকে দিন, আমি নিয়ে যাই। এরপর আলী (রা) বললেন, মালিকের নিজের বস্তু নিজে বহন করাই বেশি যুক্তিসঙ্গত।

৬. পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রেও বিনয় ও অহংকার উভয়টাই প্রকাশ পেয়ে থাকে। এক বর্ণনায় রয়েছে,

اَلْبَذَاذَةُ مِنَ الْاِيْمَانِ.

পোশাক পরিচ্ছদে নম্রতা প্রকাশ ঈমানের অঙ্গ। (আবু দাউদ : ৪১৬১)

এ হাদিসের রাবি বলেন, আমি মাআনকে জিজ্ঞাসা করলাম, বাযায এর অর্থ কী? তিনি বললেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধারণ পোশাক।

যায়েদ বিন ওয়াহাব (র) বলেন, আমি ওমর (রা)-কে দেখলাম, তিনি হাতে দুধের পাত্র নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছেন। তিনি যে পোশাকটি পরিধান করেছিলেন তার মধ্যে চৌদ্দটি তালি ছিল। কিছু চামড়ার তালিও ছিল।

এক ব্যক্তি আলী (রা)-কে তালি দেওয়া পোশাক পরিধান করার কারণে বকা দিচ্ছিল। তিনি বললেন, অন্তরে এর ফলে বিনয় সৃষ্টি হয় এবং লোকেরা অনুসরণ করে।

ঈসা (আ) বলেন, চকচকে কাপড় অন্তরে অহংকার সৃষ্টি করে। তাউস (র) বলেন, আমি এদুটি কাপড় ধৌত করি অতঃপর এ কাপড় যতক্ষণ পর্যন্ত পরিস্কার থাকে ততক্ষণ আমার অন্তর অপরিচিত মনে হয়।

বর্ণিত আছে, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) এক হাজার দিনার দিয়ে পোশাক ক্রয় করতেন। অতঃপর যদি তা নরম হতো, তিনি বলতেন এ কাপড়টি কতইনা ভালো!

এরপর যখন তিনি খলিফা হলেন তখন তার পোশক সাদামাঠা হয়ে যায়। পোশাকের দাম পাঁচ দিরহামে চলে আসে। আর পোশাক যদি নরম না হতো তাহলে তখন বলতেন, এ পোশাকটি কতইনা ভালো!

কেউ তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার সেই পোশাক, বাহন, আতর আজ কোথায় গেল? তিনি বললেন, আমার মন আরাম আয়েশ পছন্দ করে। আর দুনিয়ার যেই স্বাদ ও মজা সে নিয়েছে তার থেকে আরও ভালো ও আরাম প্রত্যাশী এমনকি খেলাফতের স্বাদও নিয়ে ফেলেছে, যা দুনিয়ায় সর্বোচ্চ পদ। সবশেষে এখন সে আল্লাহর কাছে বড় মর্যাদার প্রত্যাশী।

ইবনে সুওয়াইদ (র) বলেন, একদা ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র) জুমার নামায পড়ান এরপর তিনি বসে রইলেন। তখন তার পরিহিত পোশাকে সামনের দিকে তালি ছিল এবং পিছনের দিকেও তালি ছিল। এক ব্যক্তি বলল, হে আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহ তাআলাতো আপনাকে সম্পদ দিয়েছেন তাই ভালো পোশাক পরিধান করলেই তো পারেন। এরপর কিছু সময় মাথা ঝুকিয়ে রাখার পর বললেন, উত্তম ইতিদাল হচ্ছে সম্পদের ক্ষেত্রে ইতিদাল। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেওয়া হচ্ছে উত্তম ক্ষমা। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَنْ تَرَكَ زِيْنَةً لِلّٰهِ وَوَضَعَ ثِيَابًا حَسَنَةً تَوَاضُعًا لِلّٰهِ اِبْتِغَاءً لِمَرْضَاتِهٖ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدَخِّرَ لَهٗ عَبْقَرِيَّ الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য সাজসজ্জা ছেড়ে দিবে এবং বিনয় ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালো কাপড় পরিহার করবে তাহলে আল্লাহর জন্য জরুরি হয়ে যায় যে তাকে জান্নাত দান করবেন।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈসা (আ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী ভালো পোশাক অহংকারের আলামত আর এর বিপরীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ভালো পোশাক পরিধান করা কি অহংকারের আলামত? তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, এটা অহংকার নয়; বরং অহংকার হচ্ছে মানুষ হক কথা বা বিষয় থেকে গাফেল থাকবে এবং লোকেদের দোষ তালাশ করবে। জাহেরিভাবে এই দুই বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্য মনে হচ্ছে। এর জবাব হচ্ছে, নতুন কাপড় সবার ক্ষেত্রেই এবং সর্বাবস্থায় অহংকারের কারণ হবে-বিষয়টি এমন নয়। রাসূলুল্লাহ (স) এই বাস্তবতার দিকেই ইশারা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) এ বিষয়টি ওই সময় বুঝেছেন যখন সাবেত বিন কায়েস নিজের অবস্থা বর্ণনা করেন যে আমার তো সৌন্দর্য ভালো লাগে।

তিনি তার একথা থেকে এ বিষয়টি বোঝাতে পেরেছেন যে সাবেত একটু ভালো পোশাক পরিধান করতে ভালোবাসে অপরের জন্য অহংকার প্রদর্শনের জন্য নয়। কেননা ভালো থাকার জন্য আবশ্যক নয় যে অহংকার করতেই হবে। আর অহংকারের জন্য ভালো পোশাকই হতে হবে বিষয়টিও এমন নয়। অনেক লোক রয়েছে হালকা পোশাক পরিধান করেই অহংকার করে থাকে।

অহংকারীর আলামত

যখন মানুষ তার দিকে তাকায় তখন নিজেকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে। আর যখন একা থাকে তখন তার কোনো খবরই থাকে না। আর সৌন্দর্য পছন্দের আলামত হচ্ছে, প্রত্যেক বিষয়েই সৌন্দর্য খুঁজে বেড়ানো। এমনকি একাকি থাকার সময়ও এবং ঘরের কোণে অবস্থানের সময়ও এটা অহংকার নয়। সুতরাং ঈসা (আ)-এর কথা ওই অবস্থার ওপর

প্রয়োগ হবে যখন ভালো পোশাকের কারণে অহংকার সৃষ্টি হয়। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথাও আপন জায়গায় সঠিক। কেননা, অহংকার ও ভালো পোশাক একে অপরের জন্য আবশ্যক নয়। যদিও মাঝে মধ্যে ভালো পোশাকের কারণে অহংকার সৃষ্টি হয় তবে উত্তম পোশাক হচ্ছে মধ্যম ধরনের পোশাক পরিধান করা।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبَسُوْا وَتَصَدَّقُوْا فِيْ غَيْرِ سَرْفٍ وَلَا مُخَيَّلَةٍ.

পানাহার করো, পরিধান করো, সদকা করো অহংকার ও অপচয় করা ব্যতীত। (সুনানে নাসায়ী : ৫ : ৭৯)

আরও বলেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ يُرٰى أَثَرُ نِعْمَتِهٖ عَلٰى عَبْدِهٖ.

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মাঝে তাঁর নিয়ামতের আলামত দেখতে পছন্দ করেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৪ : ১৩৫)

বকর বিন আবদুল্লাহ (র) বলেন, বাদশাদের পোশাক পরিধান করো এবং খোদাভীতির মাধ্যমে অন্তরকে মেরে ফেলো। আবু বকর মুযানি (র) এ কথা ওইসব ব্যক্তিদের বলেছেন, যারা মুত্তাকিদের পোশাক পরিধান করে অহংকার করে।

ঈসা (আ) তার সহচরদের বলেন, কী হলো তোমাদের, সন্ন্যাসীদের পোশাক পরিধান করো অথচ ভিতরে হিংস্রপ্রাণীর অন্তর নিয়ে আসো! তোমাদের উচিত, বাদশাদের পোশাক পরিধান করা এবং খোদাভীতির মাধ্যমে অন্তরকে মেরে ফেলা।

৭. প্রকৃত বিনয় হচ্ছে, যদি কেউ গালি দেয় বা কষ্ট দেয় অথবা হক ছিনিয়ে নেয় তখন সহ্য করা ও ধৈর্য ধারণ করা। হিংসা, বিদ্বেষ-এর পর্বে সালাফের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

সারকথা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর উত্তম চরিত্রই উত্তম চরিত্র ও বিনয়ের মাপকাঠি। আমাদের কর্তব্য হলো, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীরাত থেকেই শিক্ষা নেওয়া ও তা অনুসরণ করা।

আবু সালামা (রা) বলেন, আবু সাঈদ খুদরি (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, পাহানার, পোশাক, বাহনের ক্ষেত্রে যে নবআবিস্কার হয়েছে সে ব্যাপারে আপনার মতামত কী? উত্তরে তিনি বললেন, হে ভাই! আল্লাহর জন্য পানাহার ও পোশাক পরিধান করো। এর কোনোটির ক্ষেত্রে যদি রিয়া, অহংকার, মর্যাদার বাসনা থাকে তাহলে তা গুনাহ। ঘরে ওইসব কাজ করো, যেগুলো রাসূলুল্লাহ (স) ঘরে করতেন। রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াতেন, ঝাড়ু দিতেন, সুতা ঠিক করতেন, দুধ দোহন করতেন, কাপড়ে তালি লাগাতেন, খাদেমের সাথে বসে খাবার খেতেন। খাদেম কাজে ক্লান্ত হয়ে গেলে ওই কাজ নিজে করা শুরু করতেন, বাজার করতেন। হাতে বা কাঁধে করে পণ্য নিয়ে আসতে সংকোচ বোধ করতেন না। রাসূলুল্লাহ (স) ধনী, গরীব, ছোট-বড় সবার সাথে মুসাফাহা করতেন। সাদা, কালো ছোট-বড়, স্বাধীন, গোলাম, সকলকে আগে সালাম দিতেন। ঘর ও বাইরের জন্য পৃথক পৃথক পোশাক ছিল না; বরং ঘরের পোশাক পরিধান করেই বাইরে যেতেন। কেউ যদি তাকে দাওয়াত দিতেন, সে হতদরিদ্র হলেও রাসূলুল্লাহ (স) তার দাওয়াত গ্রহণ করতেন। দস্তরখানে যে খাবারই দেওয়া হতো, রাসূলুল্লাহ (স) তা-ই খেতেন। কোনো দোষ ধরতেন না, যদিও তা নিম্নমাণের খেজুর হোক না কেন। দিনের বেঁচে যাওয়া খাবার রাতের জন্য এবং রাতের বেঁচে যাওয়া খাবার দিনের জন্য রেখে দিতেন না। রাসূলুল্লাহ (স)-এ সদা নম্রতা অবলম্বন করতেন। তিনি হাস্যোজ্জ্বল, প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। অট্টহাসি দিতেন না। পেরেশান হলে অস্থির হয়ে যেতেন না, মুসিবতের সময় বিচক্ষণাতার সাথে কাজ করতেন। তিনি বিনয়ী; কিন্তু বিনয় এমন ছিল না যে লাঞ্ছনা বোঝায়। রাসূলুল্লাহ (স) দানশীল ছিলেন। অপচয় করতেন না। আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর অন্তর নরম ছিল, তিনি মাথা নত করে চলতেন। বেশি খাওয়ার কারণে বদ হজম হয়েছে এমন কখনো হয়নি।

আবু সালামা (রা) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-এর খেদমতে হাজির হই এবং যা কিছু আবু সাঈদ খুদরি (রা)-এর কাছ থেকে শুনেছি তা বললাম। এরপর তিনি বলেন, আবু সাঈদ তোমাকে ঠিকই বলেছে। কিন্তু সে তোমাকে এ কথা বলেনি যে রাসূলুল্লাহ (স) কখনো পেট ভরে খাবার গ্রহণ

করেননি এবং না কোনো দিন কোনো অভিযোগ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সম্পদের চেয়ে দরিদ্রতাই বেশি পছন্দনীয় ছিল। যদিও কোনো দিন রাতে ক্ষুধার্ত থাকতে হতো; কিন্তু তা রোজা রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতো না। তিনি যদি চাইতেন তাহলে আল্লাহর কাছ থেকে ধনসম্পদ, আরাম আয়েশ চেয়ে নিতে পারতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তার পেটে হাত বুলিয়ে বলতাম আপনি তো এতটুকু গ্রহণ করতে পারেন, যা আপনার আহারের জন্য যথেষ্ট হবে এবং আপনার ক্ষুধার্ত থাকতে না হয়।

রাসূলুল্লাহ (স) তখন উত্তর দেন, হে আয়েশা! পূর্ববর্তী নবীরা তো এর থেকেও বেশি কষ্ট সহ্য করেছেন এবং এ অবস্থায়ই তারা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন। এসব নবীগণ যখন আল্লাহর কাছে পৌছান তখন তারা অনেক মর্যাদার অধিকারী হন এবং অনেক সওয়াব ও প্রতিদান পান। আমার ভয় হয় যে আমি আরাম আয়েশের পিছনে পড়ে তাদের পিছনে না পড়ে যাই। আয়েশা (রা) বলেন,এক সপ্তাহ না যেতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

উভয়ের বর্ণনা থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর যে আখলাক চরিত্র ও অভ্যাস উল্লেখ করা হয়েছে, এতে বিনয়ীদের সব আখলাক রয়েছে। যে বিনয় তালাশ করছে তার রাসূলের সীরাতের অনুসরণ করা উচিত। যে ব্যক্তি তার মর্যাদা নিজের মর্যাদা থেকে কম মনে করবে সে জাহেল। রাসূলুল্লাহ (স)-কে দীন-দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মর্যাদা দান করা হয়েছে। তাঁরই অনুসরণ ইযযত ও সম্মানের মাধ্যম, তাই তো ওমর (রা) ওই ব্যক্তির প্রতিউত্তরে বলেছেন যিনি ওমর (রা)-কে শামে প্রবেশের সময় বলেছিল, হে ওমর! আপনি কী ধরনের সাদামাঠা পোশাক পড়েছেন? তখন ওমর (রা) বললেন, 'আমরা ওই ব্যক্তি যাদের আল্লাহ তাআলা ইসলাম দ্বারা সম্মান দান করেছেন। আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জিনিসে সম্মান তালাশ করি না।

আবু দারদা (রা) বলেন, আল্লাহর কিছু বান্দা রয়েছে যাদের আবদাল বলা হয়। এসব লোক নবীদের ওয়ারিস এবং জমিনের স্তম্ভ। যখন নবুওয়তি শেষ হলো, তখন উম্মতে মুহাম্মাদি থেকে একদল লোককে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়, যারা অধিক নামায, রোযা ইত্যাদির ভিত্তিতে ভূষিত

নয়; বরং তারা পরহেযগারি, সত্যবাদিতা এবং সৎনিয়তের গুণে গুণান্বিত। তারা সকল মুসলমানদের জন্য কল্যাণকামী। তারা ধৈর্যশীল; কাপুরুষ নয়। তারা বিনয়ী কিন্তু অপদস্ত নয়। এরা ওই ব্যক্তি যাদের আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য নির্বাচিত করেছেন। সংখ্যায় এরা ত্রিশ বা চল্লিশ এর বেশি হবে না। ইবরাহিম (আ)-এর বিশ্বাসের মতো তাদের অন্তরের বিশ্বাস। তাদের স্খলাভিষিক্ত সৃষ্টি করা ব্যতীত তাদের মৃত্যু দান করেন না।

জেনে রাখুন, নেক অন্তর কোনো জিনিসকে খারাপ বলে না। না কাউকে কষ্ট দেয়, না কারও খারাবি বর্ণনা করে। না গালি দেয়, না হিংসা বিদ্বেষ করে। তারা লোকেদের মধ্যে থেকে ভালো গুণের অধিকারী ও নরম তবিয়তের হয়ে থাকে। সত্য সর্বদাই তাদের ভূষণ। এমন হয় না যে আজ আল্লাহকে ভয় করেছে আবার কালকে গাফেল হয়ে গিয়েছে। সে তার বাহ্যিক অবস্থার ওপর অটল থাকে। আল্লাহর সাথে তাদের যে সম্পর্ক তা ঘোর অন্ধকারও দূর করতে পারে না। তাদের অন্তরে আল্লাহর দিদার লাভ ও পরকালে নাজাতের বিষয়টি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কল্যাণকর কাজে ধাবিত হওয়া তাদের অভ্যাস। তারা আল্লাহর দল। তাদের ব্যাপারেই কুরআনে বলা হয়েছে,

اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

শুনে রাখো, আল্লাহর দলই সফল হবে। (সূরা মুজাদালা : ২২)

রাবী বলেন, আবু দারদা (রা)-এর কথা শুনে আমি বললাম, আপনি যেই গুণাবলি উল্লেখ করেছেন তা অনেক কঠিন। আমি এই গুণের অধিকারী কীভাবে হবো? আবু দারদা (রা) উত্তর দিলেন, এর পন্থা হচ্ছে তুমি দুনিয়াকে ঘৃণা করবে। কেননা যখন তুমি দুনিয়াকে ঘৃণা করবে তখন পরকালের ভালোবাসার দিকে ধাবিত হবে। যে পরিমাণ পরকালকে ভালোবাসবে তুমি সে পরিমাণ দুনিয়া বিমুখ হবে এবং সে অনুপাতেই লাভ দেখতে পাবে। আল্লাহ যখন দেখবেন বান্দার পরকালের তলব তখন তাকে সঠিক পথে চলা সহজ করে দিবেন এবং তাকে হেফাজত করবেন। কুরআনে কারীমে এসেছে,

اِنَّ اللهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। (সূরা নাহল : ১২৮)

ইয়াহইয়া বিন কাসীর (র) বলেন, আমরা এই আয়াত নিয়ে চিন্তা করি। এরপর বুঝতে পারি যে, স্বাদ আস্বাদনকারীদের আল্লাহর ভালোবাসা ও তার সন্তুষ্টির মাঝে যে স্বাদ অর্জিত হয় তা আর অন্য কিছু দ্বারা অর্জিত হয় না।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে আপনার ভালোবাসা দান করুন এবং যারা আপনাকে ভালোবাসে তাদের দলভুক্ত করুন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত করুন এবং তার পরিবার ও সাহাবিদের ওপরও।

অহংকার রোগ দূর করা ও বিনয়ের গুণ অর্জনের উপায়

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, অহংকার একটি সর্বনাশা রোগ। খুব কম মানুষই এ রোগ থেকে বাঁচতে পারে। এ ধরনের অহংকার দূর করা ফরযে আইন। শুধু মনে মনে ইচ্ছা করলেই তা দূর হবে না। বরং এমন ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে, যা তাকে সমূলে উপড়ে ফেলে। দুটি উপায়ে এর প্রতিকার সম্ভব। (১) অন্তরে গ্রথিত এর মূল শিকড় উৎপাটন করা এবং (২) যে কারণে মানুষ অহংকার করে, সেগুলোকে নিজের থেকে দূর করা। মূল শিকড় উৎপাটনের জন্যে দুরকম ওষুধ প্রয়োগ করা দরকার—একটি শিক্ষাগত ও অপরটি কর্মগত। শিক্ষাগত ওষুধ এই যে, মানুষ নিজেকে জানবে এবং আল্লাহ তাআলাকে জানবে। এতেই ইনশাআল্লাহ অহংকার দূর হয়ে যাবে। কেননা, মানুষ যখন নিজেকে যথাযথরূপে জানবে, তখন বিশ্বাস করবে যে, সে নিজে যাবতীয় তুচ্ছ জিনিসের চেয়েও তুচ্ছ এবং যাবতীয় সামান্য জিনিসের চেয়েও নগণ্য। অনুনয়, বিনয় ও লাঞ্ছনা ব্যতীত কোনো কিছুই তার প্রাপ্য নয়। এরপর যখন আল্লাহ তাআলাকে জানবে, তখন জানতে পারবে বড়ত্ব ও মহত্ত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্যে মানায় না।

আল্লাহকে জানা ও তাঁর মাহাত্ম্য অনুধাবন করার বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। কেননা, এটাই ইলমে মুকাশাফার সর্বোচ্চ স্তর। যদিও আত্মজ্ঞান

হাসিল করাও দীর্ঘ পথপরিক্রমার ব্যাপার। কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে এ বিষয়বস্তু সম্পর্কে এতটুকু আলোচনা করব, যতটুকু বিনয় অর্জনের ক্ষেত্রে উপকারী। বলাবাহুল্য, এর জন্যে কুরআন কারীমের নিচের আয়াতগুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করে নেওয়াই যথেষ্ট।

قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهٗ. مِنْ اَىِّ شَىْءٍ خَلَقَهٗ. مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ. ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ. ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ. ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ.

মানুষ (কাফের) ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ! (একটু ভেবে দেখুক) তিনি তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন? শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেছেন, অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করেছেন; এরপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন। এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন। (সূরা আবাসা : ১৭-২২)

এসব আয়াতে মানুষের প্রথম সৃষ্টি, পরিণতি ও মধ্যবর্তী অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। মানুষ এ অবস্থাদি চিন্তা করলে আয়াতসমূহের অর্থ ও তার নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

উদাহরণত, প্রথম অবস্থায় যেমন মানুষের কোনো উল্লেখই ছিল না। সে ছিল নাস্তির পর্দায় ঢাকা। দীর্ঘসময় এ অবস্থাই অব্যাহত থাকে। নাস্তির প্রারম্ভ কখন হয়েছে, তাও কেউ জানে না। যে জিনিস অস্তিত্বহীন, তার চেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত আর কী হতে পারে? জন্মের আগেই মানুষ এরকম ছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে একটি ঘৃণিত উপাদান অর্থাৎ, শুক্র থেকে সৃষ্টি করেন। এরপর শুক্র থেকে জমাট রক্ত এবং জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। তারপর হাড় গঠন করেন এবং হাড়কে গোশত ও চামড়ার আবরণ দান করেন। এসব স্তর অতিক্রম করার পর মানুষ দুনিয়াতে উল্লেখযোগ্য হয়েছে। এরপরও জন্মের সাথে সাথে তার মধ্যে বহু নিচ স্বভাব বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ, প্রথমে তাকে পাথরের ন্যায় জড় অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়। সে কিছু শুনতে পেতো না, বুঝতে পারতো না, নড়াচড়া করতে পারতো না, কথা বলতে পারতো না এবং কোনো কিছু ধরতেও পারতো না। এককথায়, সে যেন জীবিত ছিল না। সে শক্তিশালী হওয়ার আগে ছিল দুর্বল, জ্ঞানী হওয়ার আগে ছিল অজ্ঞ, চক্ষুষ্মান হওয়ার

পূর্বে ছিল অন্ধ, শ্রবণকারী হওয়ার পূর্বে ছিল বধির, বক্তা হওয়ার পূর্বে বোবা, পথপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে ভ্রষ্ঠ এবং সক্ষম হওয়ার পূর্বে অক্ষম।

مِنْ اَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ . مِنْ نُّطْفَةٍ ؕ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ.

(একটু ভেবে দেখুক) তিনি তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন। শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেছেন। (সূরা আবাসা : ১৮-১৯)

এ পর্যন্ত আয়াতসমূহে এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

هَلْ اَتٰی عَلَی الْاِنْسَانِ حِیْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْكُوْرًا. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِیْهِ.

নিঃসন্দেহে মানুষের ওপর কালের এমন কিছু সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিলো না। নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। (সূরা দাহর : ১-২)

মানুষকে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তাআলা মানুষের পথ সুগম করে তার প্রতি দয়া করেছেন, যা কুরআনের একটি আয়াত ثُمَّ السَّبِیْلَ یَسَّرَهٗ থেকে বোঝা যায়। এতে মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত যা কিছু হাসিল করে, তার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِیْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِیْعًا بَصِیْرًا. اِنَّا هَدَیْنٰهُ السَّبِیْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا .

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর আমি তাকে শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করেছি। নিশ্চয় আমি তাকে পথের দিশা দিয়েছি। এখন হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। (সূরা দাহর : ২-৩)

এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাকে মৃত অবস্থা থেকে জীবিত করেছেন। প্রথমে মাটি এবং পরে বীর্য থেকে। শ্রবণশক্তিহীন অবস্থা থেকে

শ্রবণশক্তি দান করেছেন। দৃষ্টিহীন অবস্থা থেকে দৃষ্টিমান বানিয়েছেন। দুর্বল থেকে সবল করেছেন। অজ্ঞ থেকে আলেম বানিয়েছেন। তাকে এমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করেন, যাতে কুদরতের নিদর্শন রয়েছে। দরিদ্র থেকে সম্পদশালী করেছেন। ক্ষুধার্ত থেকে তৃপ্ত করেছেন। এর পরও মানুষের অবাধ্যতা দেখুন, সে কতই অকৃজ্ঞ ও জাহেল! আল্লাহ তাআলা হলেন,

اَوَلَمْ يَرَ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ.

মানুষ কি দেখে না, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রানু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। (সূরা ইয়াসিন : ৭৭)

وَ مِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ.

তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানবরূপে সবখানে ছড়িয়ে পড়লে। (সূরা রুম : ২০)

আল্লাহর নিয়ামতের দিকে তাকাও, তিনি কীভাবে মানুষকে লাঞ্ছনা, নাপাকি থেকে বের করে সম্মান ও মর্যদা দান করেছেন। অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। প্রাণহীন অবস্থা থেকে প্রাণ দান করেছেন। নির্বাক থেকে বাকশক্তি দান করেছেন। পথভ্রষ্ট ছিল, তাকে হেদায়াত দান করেছেন। দুর্বল ছিল, তাকে শক্তিশালী করেছেন। অক্ষমতা থেকে সক্ষমতা দান করেছেন। দৃষ্টিহীন ছিল, তাকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন। সে নিশ্চিহ্ন ছিল, সেখান থেকে বর্তমান অবস্থা দান করেছেন। পদদলিত মাটি থেকে সৃজন করেছেন। যাতে তার অস্তিত্বের মূলে কী ছিল তা অনুধাবন করতে পারে এবং তাকে সবধরনের নিয়ামত দান করেছেন, যাতে করে তার রবের পরিচয় লাভ করতে পারে। আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব জানতে পারে। আরও জানতে পারে যে বড়ত্ব শুধু তার জন্যই মানায়। এই সব নিয়ামতের আলোচনা আল্লাহ তাআলা কুরআনে করেছেন,

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ. وَ لِسَانًا وَّ شَفَتَيْنِ. وَ هَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ.

আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুটি চক্ষু? একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট? আর আমি তাকে দুটি পথই দেখিয়েছি। (সূরা বালাদ : ৮-১০)

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى.

সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিলো না? (সূরা কিয়ামাহ : ৩৭)

فَخَلَقَ فَسَوّٰى. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى.

এরপর আল্লাহ তাকে আকৃতি দান করেছেন এবং সুঠাম করেছেন। তারপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী। (সূরা কিয়ামাহ : ৩৮-৩৯)

অতএব, যে মানুষের জন্ম ও জন্ম পরবর্তী অবস্থা এই, কী করে তার গর্ব ও অহংকার করা বৈধ হবে? সে তো বাস্তবে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতম এবং দুর্বল থেকে দুর্বলতম সত্তা। হ্যাঁ, মানুষ যদি পূর্ণাঙ্গ সৃজিত হতো, তার সব কাজ তারই ইচ্ছাধীন থাকতো এবং সে আপন ক্ষমতায় চিরস্থায়ী হতো, তবে আপন সূচনা ও পরিণতি ভুলে গিয়ে অবাধ্য ও অহংকারী হওয়া তার জন্য শোভা পেতো। কিন্তু এখন অবস্থা ভিন্নরকম। সামান্য কদিন জীবনে কঠিন রোগ-ব্যাধি এবং বিভিন্ন বিপদাপদ তাকে ঘিরে রাখে। ক্ষুধা, পিপাসা আরও কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাকে দিন কাটাতে হয়। চারটি ভিন্নধর্মী জিনিস তার ওপর রয়েছে। যথা পিত্ত, কফ, বায়ু, রক্ত। একটি আরেকটির ক্ষতি সাধন করে। মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক বা নাই থাকুক। সে বাধ্য হয়ে ক্ষুধার্ত থাকে। অপারগ হয়ে অসুস্থ হয়। বাধ্য হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

নিজের লাভ-লোকসানের এক্তিয়ার তার নেই। সে অনেক কিছু জানতে চায়; কিন্তু অজ্ঞ থাকে। অনেক কিছু ভুলে যেতে চায়, কিন্তু পারে না। মোটকথা, মানুষের অন্তর-মন তার ক্ষমতার বাইরে। সে এমন বস্তু আশা করে, যাতে তার ধ্বংস নিহিত এবং এমন বস্তুকে পেতে চায় না, যাতে তার জীবন লুকায়িত। সে এমন মজাদার খাদ্যকে মজাদার মনে করে, যা খেয়ে পেটের পীড়ায় ভোগে অবশেষে মৃত্যুবরণ করে এবং তিক্ত ওষুধ, যা উপকারী তা খেতে চায় না। সে তার দিন-রাতের কোনো সময়ে এই আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয় যে তার শ্রবণশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে তার দৃষ্টিশক্তি চলে যেতে পারে বা তার পা অবশ হয়ে যেতে পারে। তার অকেজ চলে যেতে পারে। এমনকি তার প্রাণও চলে যেতে পারে। সে অপারগ, নিকৃষ্ট। সে ক্রয়কৃত কৃতদাসের মতো, তার নিজের কোনো ক্ষমতা নেই।

এমতাবস্থায় সে যদি নিজেকে জানে, তবে অবশ্যই জানতে পারবে যে, তার চেয়ে হীন ও নিকৃষ্ট আর কিছু নেই। আর মূর্খের কাজ অহংকার করা। এরপর যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করবে, তখন সে পূর্বে যেমন জড় পদার্থ ছিল, তেমনি জড়পদার্থে পরিণত হয়ে যাবে। সে হবে একটি অনুভূতিহীন বস্তু। তাকে মাটিতে পুঁতে রাখা হবে। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পচে গলে যাবে। তার দেহকে বিভিন্ন কীট-পতঙ্গ কিলবিল করে ছিঁড়ে ফেঁড়ে খাবে। তখন কোনো প্রাণী তার ধারে কাছে ভিড়বে না। মানুষ তাকে নীচ মনে করবে এবং তীব্র দুর্গন্ধের কারণে তার নিকট থেকে দূরে পালাবে। এরপর এমন মাটি হয়ে যাবে যা দিয়ে পাত্র তৈরি করা হবে এবং দালানকোঠা বানানো হবে। অস্তিত্বের পর আবার অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে। মনে হবে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না। যেমনটি তার সূচনার পূর্বে ছিল।

সে নিথর বস্তুর আকার ধারণ করবে, যেমনটি সে প্রথমে ছিল। অঙ্গসমূহের আকৃতি বাকি থাকবে না। তার মাঝে প্রাণ থাকবে না, না থাকবে কোনো অনুভূতি। নাপাক দুর্গন্ধ যুক্ত মৃতপ্রাণী হয়ে যাবে, যেমনটি পূর্বে নাপাক পানি ছিল। তার গোশত গলে যাবে। হাড় নিঃশেষ হয়ে যাবে। পোকামাকড় দেহ খেয়ে শেষ করে ফেলবে। চোখের গর্তে প্রবেশ করে তা ধ্বংস করে দিবে কপাল, ললাট। একের পর এক খেয়ে শেষ করে দিবে। পরিশেষে কোনো অঙ্গই বাকি থাকবে না বরং সব পোকা মাকড়ের পেটে নাপাক হয়ে যাবে। মানুষ পূর্বে যেমন ছিল তেমনই হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাটি হয়ে যাবে। অতঃপর ওই মাটি দিয়ে পাত্র, বাড়ি ঘর তৈরি করা হবে। অস্তিত্ববহ হওয়ার পর আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এমনভাবে যে, মনে হয় এর কখনো অস্তিত্বই ছিল না। কতই না ভালো হতো! যদি মাটির অংশ হিসেবেই থেকে যেত কিন্তু না, কিয়ামতের দিন আবার পুনরায় জীবিত করা হবে। সমস্ত অঙ্গ আবার একত্র হবে এবং কবর থেকে উঠবে, সে তার চার দিকের অবস্থা দেখে অবাক হয়ে যাবে। আসমান তুলার মতো উড়বে। জমিন আপন অবস্থায় থাকবে না। পাহাড় বাতাসে উড়বে।

কতই না ভালো হতো! যদি এ অবস্থায় মাটি হয়ে যাওয়ার পর সে মুক্তি পেত। এখানেই ঘটনা শেষ নয়। সে আবার জীবিত হবে। দেহের বিচ্ছিন্ন

অংশসমূহ একত্র হয়ে সে কবর থেকে উত্থিত এবং কিয়ামতকে উপস্থিত দেখতে পাবে। সে দেখবে, আকাশ ফেটে চৌচির, পৃথিবী পরিবর্তিত, পর্বতগুলো বিক্ষিপ্ত, তারকারাজি আলোহীন এবং সূর্যগ্রহণে ঢাকা। সর্বত্র অন্ধকারই অন্ধকার। তার সামনে আমলনামা রাখা হবে, এরপর বলা হবে, এটা পড়ো। সে বলবে, এটা কীসের আমলনামা? বলা হবে— তোমার জীবদ্দশায় তোমার দুই কাঁধে দুজন ফেরেশতা ছিল। তুমি যা বলতে এবং যা করতে, তারা তা লিপিবদ্ধ করে রাখত। তোমার ছোট-বড় সকল আমল এতে লেখা রয়েছে। তুমি ভুলে গেলে কী হবে, আল্লাহ তো ভুলে যাননি। এখন চলো, হিসাব দাও। এ কথা শুনতেই সে হতাশ হয়ে পড়বে। এরপর আমলনামা পড়ে বলবে— হায়! হায়! এতে তো ছোট-বড় সকল গুনাহই লিখা রয়েছে। এ হচ্ছে সকল মানুষের শেষ পরিণতি, যা ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এবার চোখ বন্ধ করে একটু ভেবে দেখা দরকার, যে মানুষের এ অবস্থা, সে কীসের ওপর ভিত্তি করে অহংকার করে? গর্ব করা ও বড়াই করা তো দূরের কথা, তার তো এক মুহূর্তের জন্য উৎফুল্ল হওয়াও উচিত নয়। তার প্রথম ও মাঝের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। যদি শেষ পরিণাম প্রকাশ পেতো তাহলে সে কুকুর, শূকর হওয়াকে প্রাধান্য দিবে, যাতে প্রাণীদের কাতারে চলে যায় এবং সে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হতে চাইতো না যাকে আযাবের সম্মুখিন হতে হবে, সুতরাং তার কাছে শূকর উত্তম। কেননা, তার শুরু মাটি থেকে, শেষও মাটিতে। এসব প্রাণীর হিসাব নেই। যদি দুনিয়াবাসী জাহান্নামির শাস্তি দেখতে পেতো, তাহলে জাহান্নামির অবস্থা দেখে ভয়ে পালাতো। এমনকি তার গন্ধও যদি পায় তাহলে তার দুর্গন্ধে মারা যেত।

জাহান্নামিকে যেই শরাব দেওয়া হয় তা যদি দুনিয়ার সমুদ্রে পড়ে তাহলে তা দুর্গন্ধ হয়ে যাবে। যার অবস্থা এরূপ তবে আল্লাহ যাকে মাফ করবেন। কিন্তু মাফ পাওয়া যাবে কি-না তাতেও তো সন্দেহ রয়েছে। কাজেই সে কীভাবে আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকতে পারে ও অহংকার করতে পারে? আর এমন কোনো বান্দা আছে, যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে না? তবে আল্লাহ যাকে মাফ করেন মেহেরবানি করে।

আপনি কি দেখেননি, যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো বাদশার হুকুম লংঘন করে এর ফলে সে শাস্তির যোগ্য হয় হাজার বেত্রাঘাত খেতে হয়। তাকে বন্দি করা হয়। অতঃপর তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করা হয় জনসম্মুখে? সে জানে না, এরপরও কি সে মুক্তি পাবে কি না। কত লাঞ্ছনাই তার ভোগ করতে হয়। সে কি জেলখানাবাসীদের ওপর অহংকার করবে? (কখনোই না) প্রতিটি মুমিন বান্দার জন্য দুনিয়া জেলখানা। সে অপরাধের কারণে শাস্তির যোগ্য হয়েছে। তার জানা নেই, শেষ পরিণাম কী হবে। আর এটাই চিন্তা, ভয়, লাঞ্ছনার জন্য যথেষ্ট। এ হচ্ছে অহংকারের জ্ঞানগত চিকিৎসার বর্ণনা।

যা হোক, এ ধরনের অহংকারী রোগীর আমলগত চিকিৎসা হলো, প্রকাশ্যভাবে বিনয় অবলম্বন করা এবং সব মানুষের সাথে নম্র ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নত ও রীতিনীতির অনুসরণ করবে। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) মাটিতে বসে খানা খেতেন এবং বলতেন, আমি আল্লাহর বান্দা। তাই বান্দার মতোই খানা খাই।

সালমান ফারসি (রা)-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, আপনি নতুন পোশাক পরেন না কেন? তিনি বললেন, আমি গোলাম; যেদিন আযাদ হব, সেদিন নতুন পোশাক পরব। এখানে আযাদ বলে তিনি আখেরাতের আদালতে আযাদ বুঝিয়েছেন।

বিনয় কাজের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। তাই আরব জাতিকে ঈমান ও নামাযের আদেশ করা হয়েছিল। কেননা, বিনয় ও নম্রতা তাদের স্বভাবের বিপরীত ছিল। এমনকি, কারও হাত থেকে বেত পড়ে গেলে তা উঠানোর জন্যে তারা নত হতো না। জুতার ফিতা খুলে গেলে তা নুয়ে বেঁধে নিত না। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) যখন প্রথমবার বায়আত হয়েছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে শর্ত করেছিলেন যে, তিনি রুকু-সেজদা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করবেন। নবীজি (স) তার এ শর্ত মেনে নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য হাকীম বুঝতে পারেন এবং পাক্কা নামাযী হয়ে কামালাতের শীর্ষে পৌঁছান। মোটকথা, আরব জাতির কাছে সেজদা করা ও নত হওয়া ছিল চরম অপমানজনক। তাই নামাযের আদেশ হয়, যাতে তাদের অহংকার চূর্ণ হয় এবং অন্তরে বিনয় আসন গাড়ে। প্রসঙ্গত নামাযের রুকু, সেজদা ও

দণ্ডায়মান থাকার মধ্যে পুরোপুরি বিনয়ভাব বিদ্যমান রয়েছে। এদিক দিয়েই নামাযকে "ধর্মের স্তম্ভ" আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি তার নিজেকে চিনবে। সে যেন তার অন্তরের অহংকার যা চায় তার বিপরীত করে। যাতে করে বিনয় তার চরিত্র হয়ে যায়। কেননা অন্তর ভালো চরিত্র, ইলম ও আমলের সমন্বয় ব্যতীত অর্জন করে না। কারণ, অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাঝে একটি সম্পর্ক রয়েছে। অদৃশ্যমান অঙ্গসমূহ জাহেরি বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে আর অন্তর বাতেনি বিষয়ের সাথে।

দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, অহংকারের কারণগুলো দূর করার মাধ্যমে অহংকারের প্রতিকার করা। আমরা মর্যাদার নিন্দা বর্ণনার অধ্যায়ে লিখেছি যে, প্রকৃত কামাল বা মর্যাদা হচ্ছে ইলম ও আমলের কারণে আর এ ছাড়া অন্য যা কিছু রয়েছে তা ধ্বংসশীল। এ আলোচনার পর আলেমের জন্য অহংকার করা কোনো ভাবেই জায়েয নাই। আমরা উল্লিখিত সব বিষয়ের ইলমি ও আমলি উভয় চিকিৎসা উল্লেখ করে দিয়েছি।

যে সকল বিষয়ে মানব সম্প্রদায় অহংকার করে

প্রথম : বংশ মর্যাদা

বংশ মর্যাদার কারণে যে লোক অহংকার করে, তার দুটি বিষয় জানতে হবে। (১) বংশ নিয়ে গর্ব করা নিছক অজ্ঞতা। কেননা, অন্যের গুণ-গরিমা দ্বারা নিজের ইজ্জত হওয়া অর্থহীন। সুতরাং যে বংশের গর্ব করে, সে যদি হীন স্বভাবের হয়, তবে অন্যের গুণ-গরিমা তার নিচ স্বভাবকে আবৃত রাখবে কীভাবে? বরং যে লোকের বংশ নিয়ে গর্ব করে, সে জীবিত থাকলে এ কথাই বলত যে, শ্রেষ্ঠত্ব আমার মধ্যে রয়েছে। তুই তো আমার পেশাবের কীট। তোর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কোথা থেকে এল? তুমি কি মনে করো, মানুষের পেশাব থেকে সৃষ্ট পোকা উত্তম ঘোড়ার পেশাব থেকে সৃষ্ট পোকার তুলনায়? আপসোস! উভয়টাই বরাবর। মর্যাদা মানুষের পেশাব থেকে সৃষ্ট এজন্য নয়।

দ্বিতীয় বিষয় এই যে, সে তার সত্যিকার বংশ জানার চেষ্টা করবে । অর্থাৎ বাপ, দাদার সঠিক পরিচয় জানবে। তার নিকটবর্তী পিতা দুর্গন্ধযুক্ত বীর্য থেকে সৃষ্টি আর দূরবর্তী পিতা নিকৃষ্ট মাটি থেকে আর আল্লাহ তাআলা মানুষের পরিচয় এভাবে পেশ করেছেন,

الَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ وَبَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ.

তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন সুন্দরতম করে এবং মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে। অতঃপর তিনি তার বংশ উৎপন্ন করেন নিঃসরিত তুচ্ছ তরল পানি থেকে। (সূরা সাজদাহ : ৭-৮)

সুতরাং তার মূল হচ্ছে নিকৃষ্ট মাটি, যা পদদলিত করা হয়। অতঃপর মাটির খামিরা বানানো হয়েছে। এক পর্যায়ে তা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। এরপরও মানুষ কীভাবে অহংকার করে, অথচ নিকৃষ্ট জিনিসের সাথে তার সম্পর্ক? তাকে ডাকা হয় হে মাটি থেকেও নিকৃষ্ট, হে কাদামাটি থেকেও দুর্গন্ধ, হে ভ্রূণ থেকেও নোংরা!

যদি বলা হয়, মাটির সাথে সম্পর্ক তো দূরবর্তী তখন আমরা বলব, তাহলে নিকটবর্তী নিসবত দেখো, তা হয়তো বীর্য বা জরায়ু। এ দিক দিয়েও নিজেকে ছোটো মনে করা উচিত। নিকটবর্তী নিসবত কিছুটা উপরের স্তরের গণ্য হলেও দূরবর্তী নিসবতে তা আর বাকি থাকে না। চিন্তা করা উচিত, পিতার না কোনো মর্যাদা আছে, না দাদার, তাহলে তাদের সন্তানদের মধ্যে সম্মান কোত্থেকে আসবে? মাটি হচ্ছে তার মূল অতঃপর বীর্য থেকে সে সৃজিত। বংশ যদি এমন হয় তাহলে এটা তো অনেক খারাপ। কেননা মানুষ প্রতিনিয়ত মাটির বুকে পা দিয়ে হাঁটতে থাকে। আর বীর্য, তা যদি গায়ে লেগে যায় তাহলে নাপাক হয়ে যায়। যে ব্যক্তি তার বংশের ব্যাপারে অবগত থাকে, সে কখনো অহংকারী হতে পারে না। এ বিষয় অর্থাৎ বংশের পরিচয় ও এর হাকিকত বোঝার পর তার অবস্থা ওই ব্যক্তির মতো হবে, যে তার পিতামাতার কাছ থেকে জানতে পেরেছে যে সে বনি হাশেম বংশ এবং এ নিয়ে সে গর্ব করে চলছে এরপর কতিপয় আদেল ব্যক্তি সংবাদ দিল, সে হিন্দুস্তানী নাপিতের ছেলে এবং লোকেরা এ ব্যাপারে অনেক দলিল প্রমাণ দিল ফলে বিষয়টি সত্য হওয়ার ব্যাপারে তার আর কোনো সন্দেহ থাকলো না। এখন বলুন, এর পরে কি তার আর কোনো অহংকার থাকতে পারে? না, কখনই না বরং তার মনে হবে সে হচ্ছে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ব্যক্তি। আর তার অন্তরে এ পরিমাণ লজ্জা হবে, যে সে কখনো কারও সাথে অহংকার করবে না। এটা হচ্ছে বিচক্ষণদের

অবস্থা, যখন তারা নিজের ব্যাপারে চিন্তা ফিকির করে আর জানতে পারে যে সে মাটি, ভ্রূণ, বীর্য থেকে পর্যায়ক্রমে সৃষ্ট হয়েছে। কেননা তার পিতা যদি নিম্নমাণের পেশার অধিকারী হয় যেমন নাপিত, মুচি তখন সে নিজেকে নীচু স্তরের মনে করবে। আর যখন নিজের সৃজনের ব্যাপারে চিন্তা করবে তাহলে আরও বেশি নীচু মনে হবে।

দ্বিতীয় : রূপ-লাবণ্য

এর চিকিৎসা হলো, মানুষ তার ভিতরের দিকটা বুদ্ধির দৃষ্টিতে দেখবে—জন্তু-জানোয়ারের মতো শুধু বাহ্যিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে না। ভিতরের দিকটার প্রতি লক্ষ করলে এমন তুচ্ছ ঘৃণিত বিষয়াদি চোখে পড়বে, যার ফলে তার রূপের অহংকার মুহূর্তে বিলীন হয়ে যাবে। যেমন মানুষের সর্বাঙ্গ নোংরামিতে ভরা। তার পেটে রয়েছে মল, মূত্রাশয়ে পেশাব, নাকে শ্লেষ্মা, মুখে থুতু, কানে ময়লা, ধমনীতে রক্ত, ত্বকে পুঁজ এবং বগলে দুর্গন্ধ। তারপরও সে দিনে একবার অথবা দু'বার পেটের জঞ্জাল সরাতে পায়খানায় যায়। পায়খানা দেখলেই তো ঘৃণা লাগে, স্পর্শ করা অথবা নাকে ঘ্রাণ নেওয়া তো দূরের কথা। এসব বিষয় মানুষের জন্য অপরিহার্য করে দেওয়া হয়েছে, যাতে সে সর্বদা আপন নাপাকি ও নীচতা হীনতার প্রতি খেয়াল করতে পারে। প্রথমে তাকে সৃজন করা হয়েছে নিকৃষ্ট নাপাক বস্তু থেকে তথা বীর্য, হায়েজের রক্ত দিয়ে এবং সে নাপাক স্থান দিয়ে দুনিয়াতে এসেছে। কেননা সে প্রথমে মেরুদণ্ড থেকে বের হয়েছে অতঃপর পুলিঙ্গ দিয়ে এবং পরে রেহেমে তথা জরায়ু থেকে বের হয়। অতঃপর লজ্জাস্থান দিয়ে, যা থেকে পেশাব বের হয়।

আনাস (রা) বলেন, ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাদের নীচতা ও অপবিত্রতা স্মরণ করাতে গিয়ে বলতেন, স্মরণ রেখো, তোমরা পেশাবের রাস্তা দিয়ে দু'বার নির্গত হয়েছ। (ইবনে আবিদ দুনয়া, তাওয়াযু : ২০০)

এমনিভাবে তাউস (র) ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-কে সদর্পে চলতে দেখে বললেন, এটা কেমন হাটা, যার পেটে রয়েছে মল। এটা ওই সময়ের কথা যখন তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। (ইবনে আবিদ দুনয়া, তাওয়াযু : ২৪১)

এটা হচ্ছে তার শুরু ও মধ্যের অবস্থা। যদি সে একদিনও শরীরের পরিচর্যা ও গোসল না করে তাহলে এমন দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরে যা চতুষ্পদ প্রাণী থেকে বের হয়। কেননা প্রাণী কখনো তার শরীর পরিষ্কারের চিন্তা করে না।

সুতরাং মানুষ যখন চিন্তা করবে যে, সে নোংরা জিনিস থেকে সৃষ্ট, নোংরা বস্তুর মধ্যেই জীবন কাটিয়েছে এবং মৃত্যুর পরও নোংরা বস্তুই হয়ে যাবে, তখন নিজের রূপ-লাবণ্যকে গর্বের বিষয় মনে হবে না। যে সৌন্দর্য হচ্ছে এমন যেমন গোবরে সবুজ ফসল ফলতে দেখতে ভালোই দেখায় অথচ তার মূল হচ্ছে নাপাক। অথবা বনের ফুলের রং, যা এখন ভালোই দেখায়। কিছু দিন পর খড়কুটার ন্যায় বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তদ্রুপ মানুষের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন থাকলে এবং সে দোষ মুক্ত থালেও তার কুৎসিত ব্যক্তির ওপর অহংকার করার কোনো অধিকার নেই। কেননা তার সৌন্দর্য যেমনি সত্তাগত নয় তেমনি ওই ব্যক্তির কুদর্শনও সত্তাগত নয়।

সৌন্দর্য কখনো চিরস্থায়ী থাকে না; বরং সুন্দর ব্যক্তির সর্বদাই এই আশঙ্কা থাকে যে বসন্ত, যখম বা অন্য কোনো রোগের কারণে সৌন্দর্য আবার না হারিয়ে যায়। মোটকথা, এধরণের বিষয়ের জ্ঞান অন্তর থেকে অহংকার দূর করে দিবে।

তৃতীয় : শক্তি ও ক্ষমতা

এর প্রতিকার হচ্ছে, মানুষ স্বভাবত যে সকল রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, সেগুলোর কথা চিন্তা করবে। যেমন— যদি দেহের একটি শিরায়ও ব্যথা দেখা দেয়, তাহলে মানুষ অক্ষমদের চেয়েও অক্ষম হয়ে যায়। আরও চিন্তা করা উচিত, যদি কোনো মশা নাকে অথবা পিঁপড়া কানে প্রবেশ করে, তাহলে এটাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। পায়ে কাঁটা ফুটলেও মানুষ শক্তিহীন হয়ে যায়। একদিনের জ্বরে বহু দিনের শক্তি-সামর্থ্য বিনষ্ট হয়ে যায়। অতএব, যে ব্যক্তি একটি কাঁটার ঘা-ও সহ্য করতে পারে না এবং মশা ও পিঁপড়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, শক্তির দম্ভ করা তার কি শোভা পায়? মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন সে কখনো গাধা, গাভী, হাতি বা ঘোড়ার চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে না। এরপরও এই শক্তির কারণে বড়াই করা কতটুকু যৌক্তিক?

চতুর্থ ও পঞ্চম : ধনসম্পদ ও অনুসারীর আধিক্য

রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ পদপ্রাপ্তিও এই কারণের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রকারের অহংকার সৌন্দর্য বা শক্তির কারণে যে অহংকার সৃষ্টি হয় তার মতো নয়। কারণ, সৌন্দর্য বা শক্তি মানুষের সত্তার অন্তর্গত বিষয় আর এগুলো সত্তার বহিরাগত বিষয়। অহংকারের এই প্রকারটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি ধনসম্পদ নিয়ে বড়াই করে, সে ওই ব্যক্তির মতো, যে তার ঘোড়া বা বাড়ি নিয়ে অহংকার করে। ওই ব্যক্তির ঘোড়া মারা গেলে বা বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেলে সে নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং অহংকার করার মতো কিছুই থাকবে না। আর যে ব্যক্তি রাজা-বাদশাদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদ বা মর্যদা পাওয়ার কারণে অহংকার করে, সে তো তার নিজের কোনো গুণ নিয়ে অহংকার করে না। সে রাজা-বাদশাদের অন্তরের ওপর ভরসা করে অহংকার করে। অথচ তাদের অন্তর খুব দ্রুতই পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, তারা কারও ওপর অসন্তুষ্ট হলে তাকে অপদস্থ করতে কোনো ত্রুটি করেন না। তাছাড়া যে ব্যক্তি নিজের কোনো গুণ ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে অহংকার করে, সে মূর্খ ছাড়া কিছুই নয়।

উদাহরণত, ধনাঢ্যতা ও সম্পদের আধিক্য এমন গুণ যা সত্তার সাথে সম্পর্ক রাখে না। ইহুদিদের মাঝে তার চেয়েও অধিক সম্পদশালী লোক থাকতে পারে। ধিক ওই সম্মানের প্রতি! যে সম্মানে ইহুদিরা আগে থাকতে পারে। লানত ওই মর্যাদার প্রতি! যাকে চোর এক মুহূর্তের মাঝে ছিনিয়ে নিতে পারে। মোটকথা, এগুলো অহংকারের এমন কারণ, যেগুলোর সাথে সত্তার সংশ্লিষ্টতা নেই। আর যে গুণ সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় তার অস্তিত্ব চিরদিন বাকি থাকে না; বরং তা পরকালে বিপদ ও শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এসব নিয়ে অহংকার করা চূড়ান্ত মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। তাছাড়া যে জিনিস মানুষের ইচ্ছাধীন নয়, মানুষ সেই জিনিসের মালিক নয়। আর উপরিউক্ত গুণাবলির কোনোটিই মানুষের ইচ্ছাধীন নয়; বরং তা দাতার ইচ্ছাধীন। তিনি চাইলে তা বাকি রাখবেন অথবা ফিরিয়ে নিবেন। মানুষ তো কেবল দাস মাত্র। যে ব্যক্তি এই সত্য উপলব্ধি করতে পারে সে কখনো অহংকার করে না। এর দৃষ্টান্ত হলো, এক নির্বোধ ব্যক্তি তার শক্তি-সামর্থ্য, সৌন্দর্য, ধনসম্পদ, স্বাধীনতা, ঘোড়া ও দাসদাসীর আধিক্য নিয়ে অহংকার করে। হঠাৎ একদিন দুজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী কোনো

ইনসাফকারী বিচারকের কাছে এই মর্মে সাক্ষ্য দিলো যে, এই ব্যক্তি অমুকের গোলাম। এমনকি তার পিতামাতা ও তার মালিকানাধীন। বিচারক তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করলেন। ফলে মালিক এসে তাকে ও তার যাবতীয় সম্পদ হস্তগত করে নিলো। এমতাবস্থায় সবকিছু হারানোর পরও ওই অহংকারী ব্যক্তি এই ভয়ে থাকে যে, মালিক তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করার কারণে তাকে শাস্তি দিয়ে বসেন কি-না? সে নিজেকে এমন এক জায়গায় আবিষ্কার করে যেখানে সাপ, বিচ্ছু ও অন্যান্য বিষাক্ত কীটপতঙ্গ বিদ্যমান। সে প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর ভয়ে তটস্থ তাকে। সে নিজের জীবন ও সম্পদ কোনোটিরই মালিক থাকে না এবং এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের কোনো পদ্ধতিও তার জানা নেই। এই অবস্থায় থাকার পর নিশ্চয় সে তার ক্ষমতা, ধনাঢ্যতা, শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে গর্ব করবে না; বরং সে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থই মনে করবে।

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকেরা এভাবেই সর্বদা নিজেদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ মনে করে। তারা জানে যে, তারা তাদের সত্তা, দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও ধনসম্পদ কোনোটিরই মালিক নয়। তাছাড়া তারা বিশ্বাস করে যে, তারা প্রবৃত্তি, গুনাহ ও আত্মিক নানা ব্যাধির মাঝে আবদ্ধ, যা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। ফলে তারা ক্ষমতা, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি নিয়ে অহংকার করে না।

এই প্রকারের অহংকারের এটাই একমাত্র চিকিৎসা। ইলম ও আমলের কারণে সৃষ্ট অহংকারের চিকিৎসা এই চিকিৎসা হতে সহজতর। কারণ, এই দুটি নফসের গুণ এবং এর কারণে পুলকিত হওয়াও বৈধ। তথাপি ইলম ও আমলের কারণে অহংকার মূর্খতারই একটি প্রকার।

ষষ্ঠ : ইলম

অহংকারের এই কারণটি সবচেয়ে বিপদজনক এবং এটি এমন এক ব্যাধি যার নিরাময় অনেক সময় দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, আল্লাহ এবং বান্দা সকলের কাছেই ইলমের মর্যাদা রয়েছে। ধনসম্পদ, সৌন্দর্য ও অন্যান্য গুণাবলির তুলনায় ইলমের মর্যাদা অনেক ওপরে; বরং ইলম ও আমলের সামনে এগুলোর কোনো মর্যাদাই নেই। এজন্যই হযরত কাব আহবার (র) বলেন, ধনসম্পদের সীমালঙ্ঘনের ন্যায় ইলমেরও কিছু সীমালঙ্ঘন

রয়েছে। (আর রিআয়াহ : ৪০৬; আযযুহদ, ইবনুল মোবারক : ৫৬; হিলয়াতুল আওলিয়া : ৪ : ৫৫)

ওমর (রা) বলেন, আলেমের পদস্খলনে সমগ্র পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (রিআয়াহ : ৪০৬; যুহদ : ১৪৭৪)

শরিয়তে ইলমের এই পরিমাণ ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, আলেম নিজে বড় ও মূর্খের বিপরীতে শ্রেষ্ঠ মনে না করাটা তার জন্য দুষ্কর।

দুটি বিষয় জানা থাকলেই আলেম অহংকার দমনে সক্ষম হয়,

প্রথমত : আলেম একথা জানবে ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে যে, আলেমদেরকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পছন্দ করেন। এজন্য মূর্খের যেই অপরাধ আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করেন তার দশভাগের একভাগও কোনো আলেম থেকে প্রকাশ পেলে তা ক্ষমা করেন না। যে ব্যক্তি ইলম থাকা সত্ত্বেও কোনো গুনাহ করে, তার গুনাহ আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট। কারণ, সে ইলমের হক আদায় করেনি।

এজন্য রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

يُؤْتٰى بِالْعَالِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ بِالرَّحٰى، فَيَطِيْفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ : مَا لَكَ؟ فَيَقُوْلُ : كُنْتُ اٰمُرُ بِالْخَيْرِ وَلَا أَتِيْهِ، وأَنْهٰى عَنِ الشَّرِّ وَ اٰتِيْهِ.

কেয়ামতের দিন আলেমকে আনা হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, সেখানে তার নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারপাশে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেমন গাধা তার চাক্কির চারপাশে ঘুরতে থাকে, তখন জাহান্নামীরা তার কাছে একত্রিত হয়ে তাকে বলবে, তোমার এই অবস্থা কেন? সে বলবে, আমি সৎকাজের আদেশ দিতাম, কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না এবং অসৎকাজে বাঁধা প্রদান করতাম, অথচ আমি নিজেই তা করতাম। (সহিহ বুখারী : ৩২৬৭)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে আমলহীন আলেমকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা দিয়ে বলেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

যাদের তাওরাতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা তা বহন (অনুসরণ) করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হলো বহু পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে! আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা জুমআ : ৫)

আলোচ্য আয়াতে ইহুদি আলেমগণ উদ্দেশ্য।

অন্য এক আয়াতে বালআম ইবনে বাউরা সম্পর্কে তিনি বলেন,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ.

তাদেরকে ওই (দুর্বল ও লোভী) ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনান, যাকে আমি দিয়েছিলাম আমার নিদর্শনসমূহ। অতঃপর সে তাকে বর্জন করে, পরে শয়তান তার পিছনে পড়ে, আর সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে সেগুলো দিয়ে তাকে উচ্চমর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল ও তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছিল। তার অবস্থা কুকুরের ন্যায়; তার ওপর তুমি বোঝা চাপালেও সে হাঁপাতে থাকে এবং তুমি বোঝা না চাপালেও হাঁপায়। যে সম্প্রদায় আমার নিদর্শনসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তাদের অবস্থাও এমনই। আপনি বৃত্তান্ত বিবৃত করুন, যাতে তারা চিন্তা করে। (সূরা আরাফ : ১৭৫-১৭৬)

এই আয়াতের তাফসিরে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বালআম ইবনে বাউরাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কিতাবের (ইলম) দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে কিতাবের (ইলম) ওপর দুনিয়াবি চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন যে, কুকুর সর্বাবস্থায় হাঁপাতে থাকে। অর্থাৎ, বালআমও কুকুরের মতো।

তাকে হেকমত প্রদান করা হোক বা না হোক। সর্বাবস্থায় সে দুনিয়াবি চাহিদার পেছনে পড়ে থাকে।

আলেমদের বিচারের ভয়াবহতা বোঝানোর জন্য তো কেবল এতটুকুই যথেষ্ট যে, তাদের জবাবদিহিতা কঠোর হবে। কোনো আলেম কি এমন রয়েছে, যে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না। কোনো আলেম এমন নয়, যে সৎকাজের আদেশ করে নিজে তা থেকে বঞ্চিত থাকে? যে আলেম নিজেকে মূর্খের চেয়ে শ্রেয় মনে করে তার এটাও ভাবা উচিত যে, আমার মর্যাদা তার চেয়ে বেশি হলেও এর জন্য আমাকে কঠোর জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। এমন আলেম ওই বাদশার মতো, যার সামনে অগণিত শত্রু এবং প্রতিটি পদক্ষেপে মৃত্যুর আশঙ্কা বিরাজমান। যদি তাকে গ্রেপ্তার করে তার ওপর জুলুম-নির্যাতন করা হয় তাহলে সে ফকির না হওয়ার কারণে আপসোস করবে। এমনিভাবে কেয়ামত দিবসে বহু আলেম মূর্খ না হওয়ার কারণে আপসোস করবে।

এই বিপদ ও আশঙ্কাই আলেমকে অহংকার থেকে বিরত রাখবে। কারণ, সে যদি জাহান্নামীই হয় তাহলে তো শুকরও তার চেয়ে উত্তম। এই যখন আলেমের অবস্থা তখন সে কী নিয়ে অহংকার করবে?

কোনো আলেমের নিজেকে সাহাবিদের চেয়ে উত্তম মনে করা উচিত নয়। অথচ এক সাহাবি বলতেন, হায়! যদি আমার মা আমাকে প্রসব না করতো! (ওমর রা.-এর উক্তি, যুহুদ, ইবনে মোবারককৃত : ২৩৪)

এক সাহাবি মাটি থেকে খড়কুটো নিয়ে বলতেন, হায়! আমি যদি খড়কুটো হতাম। (প্রাগুক্ত, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৫৬২১)

আরেক সাহাবি বলতেন, হায়! আমি যদি পাখি হতাম আর মানুষ আমাকে খেয়ে ফেলতো।

অন্য এক সাহাবি আপসোস করে বলতেন, হায়! আমি যদি উল্লেখ করার মতো কিছু না হতাম। (আবু বকর রা.-এর উক্তি, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৫৫৭৩)

পরিণাম সম্পর্কে ভীত থাকার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম এসব কথা বলতেন। তাঁরা নিজেদেরকে পাখি ও মাটির চেয়েও নগন্য মনে করতেন।

মানুষ যদি কেয়ামত দিবসের ভয়াবহতা ও বিপদাপদ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তাহলে তার অহংকার চিরতরে দূরীভূত হয়ে যাবে এবং সে নিজেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব মনে করবে।

এর উপমা হলো, এক গোলামকে তার মালিক কয়েকটি কাজ করার নির্দেশ দিলো। গোলাম কিছু কাজ করলো, কিছু কাজ ছেড়ে দিলো, কিছু কাজের মাঝে ত্রুটি দেখা দিলো, আবার যে কাজগুলো করেছে সেগুলো আদৌ মালিকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী হয়েছে কি-না এই ব্যাপারে সন্দেহে নিপতিত হলো। ইতোমধ্যে কেউ একজন এসে তাকে জানালো, তোমার মালিক তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তিনি তোমাকে অপমান করে বের করে দিবেন, প্রখর রোদের মাঝে তোমাকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন। যখন তুমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারবে না তখন তিনি তোমার কাজের হিসাব নেওয়া শুরু করবেন। অতঃপর শাস্তির ফয়সালা করবেন। এরপর তিনি তোমাকে জীর্ণশীর্ণ কারাগারে পাঠিয়ে শাস্তি দিতে থাকবেন। এক মুহূর্তের জন্যও তুমি তা থেকে রেহাই পাবে না।

অপরদিকে গোলামও জানে যে, মালিক তার বহু গোলামের সাথে এরূপ আচরণ করেছেন। আবার অনেককে ক্ষমাও করেছেন। কিন্তু সে জানে না, সে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত।

যখন সে এগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তখন নিজের দুর্বলতা বোঝতে পারে। তার অহংকার ও অহমিকা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, তার চেহারায় ভয় ও দুঃখের ছাপ ফুটে ওঠে এবং শাস্তির সময় কেউ তার জন্য সুপারিশ করবে এই আশায় সবার সাথে বিনয় প্রদর্শন করে। এমনিভাবে আলেমের সামনেও চিন্তাভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত। সে যদি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গুনাহ এবং হিংসা, লৌকিকতা ও আত্মম্ভরিতা, জাতীয় বাতেনি গুনাহ নিয়ে এবং এগুলোর পরিণাম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তাহলে নিঃসন্দেহে অহংকার তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত : আলেম একথা জানবে ও মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই অহংকার করার অধিকার রাখেন। যদি অন্য কেউ অহংকার করে তাহলে সে আল্লাহর শাস্তির উপযোগী হবে। আল্লাহ তাআলা বিনয়ীকে পছন্দ করেন। তিনি বলেন, আমার নিকট বান্দার মর্যাদা

ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ সে নিজেকে মর্যাদাহীন মনে করে। যখন বান্দা নিজেকে মর্যাদাবান মনে করে তখন আমার কাছে তার কোনো মর্যাদা থাকে না। সুতরাং আলেমের জন্য আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক। এটা আলেমের অন্তর থেকে অহংকারকে দূর করে দিবে। নবীগণের অন্তরও এর মাধ্যমে অহংকার থেকে মুক্ত থাকতো। কারণ তাঁরা জানতেন, যে ব্যক্তি অহংকারের গুণে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ হতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো, বান্দা যেন নিজেকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে, তাহলে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

প্রশ্ন : তাহলে ফাসেক ও বেদআতীর সামনে বিনয়ী হওয়ার বিধান কী? আলেম ও আবেদ হয়েও তাদের চেয়ে নিজেকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করা কতটা যৌক্তিক? এতে কি ইলম ও আল্লাহ তাআলার ইবাদতের ফযিলত হ্রাস পায় না?

উত্তর : পরিণামের দিক বিবেচনায় এটা সহিহ। এই বিবেচনায় কাফেরের সামনেও অহংকার করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, হতে পারে এই কাফের ইসলাম গ্রহণ করবে, ফলে ঈমানের ওপর তার মৃত্যু হবে। অপরদিকে ওই আলেম পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, ফলে কুফরের ওপর তার মৃত্যু হবে। প্রকৃতপক্ষে বড় তো ওই ব্যক্তি, যে পরকালে আল্লাহ তাআলার নিকট বড় থাকবে। আর যে পরকালে জাহান্নামী হবে, তার চেয়ে কুকুরের মর্যাদা অধিক, যদিও সে নিজেই তা জানে না। বহু মুসলমান ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে হযরত ওমর (রা)-কে তাঁর কুফরের কারণে অবজ্ঞা করতো। অথচ পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিলে তিনি হযরত আবু বকর (রা) ছাড়া অন্যান্য মুসলমানদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন।

সুতরাং বোঝা গেল, পরিণাম সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। আর দুনিয়ার যাবতীয় ফযিলত পরিণামের ওপর নির্ভরশীল।

অতএব, বান্দার জন্য আবশ্যক হলো, সে কারও ওপর অহংকার করবে না, এমনকি কোনো মূর্খ ব্যক্তিকে দেখলে মনে মনে বলবে, এই লোক না জেনে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করে আর আমি জেনে বুঝে আল্লাহর

নাফরমানি করি। কাজেই আমার তুলনায় তার ওযর গ্রহণযোগ্য। আর কোনো আলেমকে দেখলে মনে মনে বলবে, এই লোক যা জানে আমি তা জানি না। কাজেই আমি কীভাবে তার সমান হতে পারি? বয়সে বড় কাউকে দেখলে মনে মনে বলবে, এই ব্যক্তি আমার আগে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করেছে। কাজেই আমি কীভাবে তার সমান হতে পারি? বয়সে ছোট কাউকে দেখলে মনে মনে বলবে, আমি তো তার আগে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করেছি। কাজেই আমি কীভাবে তার সমান হবো? কোনো কাফের বা বেদআতীকে দেখলে মনে মনে বলবে, হতে পারে, তার পরিসমাপ্তি ইসলামের ওপর হবে আর আমার পরিসমাপ্তি তার বর্তমান মাযহাবের ওপর হবে। কারণ, হেদায়াতের সূচনার ন্যায় তার পরিসমাপ্তিও আমার ইচ্ছাধীন নয়।

মোটকথা, পরিণাম নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মাধ্যমে বান্দা অহংকার থেকে দূরে থাকতে পারে। বান্দা এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে যে, আখেরাতের সফলতা ও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মাঝেই রয়েছে পূর্ণতা। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নেয়ামতরাজির কোনো মূল্য নেই।

বস্তুত পরিণাম সম্পর্কিত এই ভীতি অহংকারী ও যার কাছে অহংকার করা হয়, উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্য উভয়ের প্রত্যেকের ওপর আবশ্যক হলো অপরের পরিণাম নিয়ে না ভেবে নিজের পরিণামের চিন্তায় মগ্ন থাকা। এর দৃষ্টান্ত হলো, কয়েকজনকে একটি অপরাধে বন্দি করা হলো এবং তাদের বিরুদ্ধে হত্যার ফয়সালা করা হলো। এমতাবস্থায় তাদের কেউ একে অপরের ওপর অহংকার করার অবকাশ পায় না; বরং প্রত্যেকেই নিজের পরিণাম নিয়ে মগ্ন থাকে।

প্রশ্ন : শরীয়ত বেদআতী ও ফাসেকদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা যায়, তাদের সামনেও বিনয় প্রদর্শন করা উচিত। অথচ ঘৃণা ও বিনয় পরস্পর বিরোধী দুটি জিনিস?

উত্তর : এটি অধিকাংশ মানুষের কাছে একটি জটিল বিষয়। কারণ, আল্লাহ তাআলার জন্য বেদআত ও ফিসকের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার সাথে অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশের মিশ্রণ ঘটে যায়। বহু মূর্খ আবেদ ও অহংকারী আলেম রয়েছে, যারা কোনো ফাসেককে তাদের পাশে বসতে দেখলে

উঠিয়ে দেয় বা নিজেই উঠে চলে যায়। সে এটাকে আল্লাহর জন্য বেদআত ও ফিসকের প্রতি ঘৃণা বলে মনে করে। অথচ এটা বাতেনি অহংকার বৈ কিছুই নয়।

আর এই বিষয়টি জটিল হওয়ার কারণ হলো, আল্লাহর অনুগত বান্দার ওপর অহংকার করা তো সুস্পষ্ট অন্যায়। আর ফাসেক ও বেদআতীর ওপর অহংকার আল্লাহর জন্য তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আল্লাহর জন্য তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা ভালো কাজ। আর এই ঘৃণা পোষণ ও অহংকার একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ তাআলা যাকে তাওফীক দান করেন সেই কেবল উভয়টির মাঝে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়।

এই জটিলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো, কোনো ফাসেক বা বেদআতীকে দেখলে বা তাদেরকে ভালো কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার সময় তিনটি বিষয় মনে রাখতে হবে,

প্রথমত : নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করবে, যাতে নিজের কাছে নিজেকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হয়।

দ্বিতীয়ত : মনে রাখতে হবে, যে ইলম, আমল ইত্যাদির কারণে অহংকার আসে সেগুলো নিজের কামাই নয়; বরং আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কারণেই সে এগুলো পেয়েছে। যখন সে একথাটি বারবার মনে করবে তখন আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের কোনো অবকাশ পাবে না।

তৃতীয়ত : পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করবে। হতে পারে, তার শেষ পরিণাম মন্দ হবে আর ফাসেক ও বেদআতীর শেষ পরিণাম ভালো হবে।

প্রশ্ন : তাহলে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণের পদ্ধতি কী?

উত্তর : শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে। আর একথা মনে করা যাবে না যে, পরকালে সে সফল হবে আর ফাসেক ও বেদআতী ধ্বংস হবে; বরং সর্বদা নিজের গোপনে করা গুনাহের কারণে ভয়ে থাকবে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। উদাহরণটি হলো, এক বাদশার একটি গোলাম ও একজন পুত্র আছে। সে পুত্রকে শিষ্টাচার শেখানোর জন্য গোলামকে নির্দেশ দিলো এবং পুত্র বেয়াদবি করলে তাকে শাস্তি দেওয়ারও অনুমতি দিলো।

এমতাবস্থায় পুত্র কোনো বেয়াদবি করলে গোলামের ওপর আবশ্যক হলো, তাকে শাস্তি দেওয়া ও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। আর এটাই হবে মনিবের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ। কারণ, মনিবই তাকে এরূপ করতে বলেছে। এখানে লক্ষণীয়, গোলাম নিজেকে বড় মনে করে বা অহংকার করে বাদশার পুত্রকে শাস্তি দেয় না; বরং সে জানে বাদশার কাছে তার চেয়ে তার পুত্রের অবস্থান অনেক উর্ধ্বে। কারণ, পুত্র নিঃসন্দেহে গোলামের চেয়ে প্রিয় হয়ে থাকে। অতএব বোঝা গেল, কারও প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করলেই অহংকারী হয় না। এমনিভাবে এটাও হতে পারে যে, বেদআতী ও ফাসেককে দেখে মনে মনে ভাববে, হয়তো পরকালে তার পরিণাম ভালো হবে আর আমার পরিণাম হবে মন্দ। তাদের প্রতি এজন্যই ঘৃণা পোষণ করবে যে, আল্লাহ তাআলাই এই নির্দেশ দিয়েছেন, পাশাপাশি আখেরাতে তার পরিণাম ভালো হতে পারে ভেবে তার সামনে বিনয়ীও হতে হবে। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আলেমগণ এভাবেই ভয় ও বিনয় নিয়ে তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে থাকেন। আর দাম্ভিক ও বিভ্রান্ত আলেমরা পরকালে নিজেদের পরিণাম তাদের চেয়ে ভালো হবে- এটা নিশ্চিত মনে করে অহংকার করে। অথচ এটা চরম বিভ্রান্তি বৈ কিছুই নয়। এটাই আল্লাহর নাফরমান বান্দা ও বেদআতীদের সাথে বিনয় ও ঘৃণা পোষণের পদ্ধতি।

সপ্তম : তাকওয়া ও ইবাদত

তাকওয়া ও ইবাদতের কারণে অন্তরে যে অহংকার আসে তা বান্দার জন্য একটি ভয়াবহ ফেতনা। এর থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায় হলো, বিনয়কে নিজের ওপর আবশ্যক করে নিবে এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে, যে ব্যক্তি ইলমের কারণে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তার ওপর আমার অহংকার করা উচিত নয়। ইলমের ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّ قَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِّهٖ ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন অংশে সিজদাবনত হয় ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখেরাতকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা

করে, সে কি তার সমান, যে তা করে না? বলুন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান?' বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা যুমার : ৯)

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ.

অর্থাৎ, একজন আলেম একজন আবেদের চেয়ে এতটাই শ্রেষ্ঠ, যেমন আমি তোমাদের কোনো সাধারণ সাহাবির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

যদি কোনো আবেদ বলে, এই আয়াত ও হাদিস তো ইলম অনুযায়ী আমলকারী আলেমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আমলহীন আলেমের জন্য এটা প্রযোজ্য নয় তাহলে তাকে বলা হবে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ؕ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

তুমি নামাজ প্রতিষ্ঠা করো দিবসের দুই প্রান্তভাগে ও রাতের প্রথমাংশে। নিশ্চয় সৎকাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেয়। উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য এটা এক উপদেশ। (সূরা হুদ : ১১৪)

তাছাড়া ইলমের কারণে যেমনিভাবে আলেমকে জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি এই ইলম তার জন্য নাজাতের উসিলা ও পাপমোচনের কারণও হতে পারে। হাদিসেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আর আলেমের পরিণাম সম্পর্কে যেহেতু আবেদের জানা নেই, কাজেই তার জন্য আবশ্যক হলো আলেমের সামনে বিনয়ী হওয়া।

প্রশ্ন : বিষয়টি যদি এমনই হয় তাহলে তো আলেমের উচিত নিজেকে আবেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা। কারণ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنٰى رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابِيْ.

একজন আলেম একজন আবেদের চেয়ে এতটাই শ্রেষ্ঠ, যেমন আমি আমার কোনো সাধারণ সাহাবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (জামে তিরমিযী : ২৬৮৫)

উত্তর : এটা তখনই সম্ভব হতো, যদি আলেম তার শেষ পরিণতি সম্পর্কে জানতো। অথচ সে নিজেই তার পরিণাম সম্পর্কে জানে না। হতে পারে,

মৃত্যুর সময় তার অবস্থা আল্লাহ তাআলার কাছে মূর্খ ফাসেকের চেয়েও নিকৃষ্ট হবে। সে এমন একটি গুনাহ করেছে যা তার কাছে ছোট মনে হলেও আল্লাহ তাআলার কাছে গুরুতর। ফলে সে আল্লাহ তাআলার ক্রোধের পাত্রে পরিণত হয়েছে।

এজন্য আলেমের উচিত, অহংকার না করে নিজের ব্যাপারে ভীত থাকা।

বস্তুত আলেম এবং আবেদ উভয়েরই অন্যের কথা না ভেবে নিজের ব্যাপারে তটস্থ থাকা উচিত। এই ভয় সর্বাবস্থায় তাদেরকে অহংকার থেকে দূরে রাখবে।

এই হলো আলেমের সাথে আবেদের অবস্থার আলোচনা। আর আবেদ অনেক সময় আলেম ভিন্ন অন্যদের ওপর অহংকার করে।

আলেম ছাড়া অন্যদের দুই অবস্থা : প্রথমত, তার প্রকৃত অবস্থা অস্পষ্ট থাকবে। আবেদের উচিত, এমন ব্যক্তির সাথে অহংকার প্রদর্শন না করা। কারণ, হতে পারে, সে ওই আবেদের চেয়ে বেশি ইবাদতগুজার, তার গুনাহও আবেদের চেয়ে কম এবং সে আল্লাহর কাছে আবেদের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

দ্বিতীয়ত, যার প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত। এমন ব্যক্তির সাথেও অহংকার করা উচিত নয়। একথা বলার কোনো অবকাশ নেই যে, আমার চেয়ে তার গুনাহের পরিমাণ বেশি। কারণ, হতে পারে আবেদ এমন একটি গুনাহ করেছে, যা ওই ব্যক্তির সারাজীবনের গুনাহের চেয়েও বড়। ওই ব্যক্তি ব্যভিচার, হত্যা, মদপান ইত্যাদি কবীরা গুনাহ করলেও তার ওপর অহংকার করা যাবে না। কারণ, অহংকার, হিংসা, লৌকিকতা, প্রতিহিংসা, ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাস ইত্যাদির মতো অন্তরের গুনাহসমূহ আল্লাহর কাছে গুরুতর। অনেক সময় বান্দার অন্তরে লুকিয়ে থাকা এমন কিছু গুনাহের সৃষ্টি হয়, যা তাকে আল্লাহর ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দেয়। অপরদিকে অনেকে প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হলেও তার অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত, ইখলাস, প্রভৃতি গুণ সুপ্ত থাকে। এসব গুণের বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেন, ফলে কেয়ামত দিবসে ওই আবেদের চেয়ে তার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে থাকবে।

বস্তুত অন্যের চিন্তা না করে নিজের পরিণাম কী হবে তা নিয়ে ভীত থাকাটাই বিচক্ষণতার পরিচয়। কারণ, পরকালে একজন অপরজনের গুনাহের বোঝা বহন করবে না এবং একজনের আযাব অপরজনের আযাবকে হ্রাস করবে না। বান্দা যখন পরকালের এই ভয়াবহতা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ফিকির করবে তখন সে অহংকার করার এবং নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভাবার কোনো সুযোগই পাবে না।

ব্যক্তির বিবেচনায় মানুষ দুই শ্রেণির, ১. তার চেয়ে উত্তম। ২. তার চেয়ে নিকৃষ্ট। উচিত হলো, উভয়ের সামনেই বিনয়ী হওয়া। যে ব্যক্তি উত্তম তার সাথে মিলিত হওয়ার এবং তার মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। আর যে ব্যক্তি তার চেয়ে নিকৃষ্ট তাকে দেখে মনে মনে বলে, হয়তো পরকালে সে নাজাত পেয়ে যাবে আর আমি ধ্বংস হবো। হয়তো সে গোপনে আল্লাহর ইবাদত করে; কিন্তু আমি তা জানি না, হয়তো তার মাঝে এমন কোনো গুণ রয়েছে যা আমি জানি না। আর সেই গুণের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করবেন ও তার ওপর অনুগ্রহ করবেন। আর আমার ভালো কাজগুলো তো প্রকাশ্য। হয়তো এর কারণে আল্লাহ তাআলা আমার ভালো কাজের সওয়াবগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিবেন।

মোটকথা, বান্দা যখন ভালোমন্দ উভয় শ্রেণির মানুষের সামনে বিনয়ী হতে পারবে তখনই তার জ্ঞানবুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করবে এবং যুগের নেতৃত্ব দানে সক্ষম হবে।

বান্দা যখন নিজেকে দুর্ভাগা বলে মেনে নিবে। তখন অহংকার করা কিছুতেই তার জন্য শোভনীয় হবে না। যদি সে সবাইকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করে, নিঃসন্দেহে এটা উত্তম কাজ।

বর্ণিত আছে, একবার এক আবেদ পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, স্বপ্নে তাকে বলা হলো, তুমি অমুক মুচির কাছে গিয়ে নিজের জন্য দুআ চাও। অতঃপর সেই আবেদ মুচির কাছে তার আমল সম্পর্কে জানতে চাইলে মুচি বললো, আমি দিবসে রোযা রাখি ও কাজ করি, অতঃপর উপার্জিত সম্পদের কিছু সদকা করি আর বাকিগুলো আমার পরিবারের পেছনে ব্যয় করি। একথা শুনে আবেদ ফিরে এসে বললেন, এটা নিংসন্দেহে ভালো কাজ, কিন্তু যারা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার

ইবাদতেই লিপ্ত থাকে তারা তো তার চেয়ে উত্তম। অতঃপর দ্বিতীয় দিন আবার তাকে স্বপ্নে বলা হলো, তুমি পুনরায় ওই মুচির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো যে, আপনার মুখে হলুদ রং কেন? আবেদ তার কাছে গিয়ে একথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি যখন কাউকে দেখি তখন মনে মনে বলি, পরকালে সে মুক্তি পাবে আর আমি ধ্বংস হবো। আবেদ মনে মনে বললেন, একারণেই তার এতো মর্যাদা। (রিআয়াহ : ৪১২)

আল্লাহ তাআলার ভয় ও বিনয়ের ফযিলত বর্ণনায় ইরশাদ হচ্ছে,

وَ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَّ قُلُوْبُهُمْ وَ جِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ.

এবং যারা তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে এ বিশ্বাসে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবে। (সূরা মুমিনুন : ৬০)

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ.

নিশ্চয় যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত। (সূরা মুমিনুন : ৫৭)

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

قَالُوْا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ.

এবং বলবে, পূর্বে আমরা স্বীয় পরিবার-পরিজনের মধ্যে (দুনিয়াতে) শঙ্কিত অবস্থায় ছিলাম। (সূরা তূর : ২৬)

ফেরেশতাগণ যাবতীয় গুনাহ থেকে পূতপবিত্র, এরপরও তাঁরা আল্লাহ তাআলার ভয়ে সর্বদা তাঁর গুণগান গাইতে থাকেন। তাঁদের সম্পর্কে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يُسَبِّحُوْنَ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ.

তারা দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, কখনো শৈথিল্য করে না। (সূরা আম্বিয়া : ২০)

অতএব, যখন আল্লাহ তাআলার ভয় ও বিনয় বান্দা থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় তখনই বান্দা অহংকারী হয়ে ওঠে। আর অহংকার ধ্বংসের কারণ। পক্ষান্তরে বিনয় ও নম্রতা সৌভাগ্যের সোপান। অন্তরে অহংকার পোষণ ও সবাইকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখার কারণে বান্দার যে ক্ষতি হয়, বাহ্যিক আমল দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়।

এসকল জ্ঞান অহংকারের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। তবে এসকল জ্ঞান থাকার পরও অনেকে অহংকার থেকে মুক্ত থাকার দাবি করে। অথচ সে মিথ্যা দাবিদার। যখনই অহংকারের কোনো কারণ তার সামনে আসে তখন সে তার অঙ্গীকারের কথা বেমালুম ভুলে যায় এবং অহংকারে লিপ্ত হয়। এমন ব্যক্তির জন্য কেবলমাত্র মারেফতই যথেষ্ট নয়; বরং সেই মারেফত অনুযায়ী আমলই তাকে অহংকার থেকে মুক্তি দিতে পারে।

নফস যখন পাঁচটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তখন সে প্রকৃত বিনয়ী হতে পারবে।

প্রথম পরীক্ষা : সমকালীন কোনো ব্যক্তির সাথে কোনো একটি মাসআলায় বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার পর যদি ওই প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে হক কথা প্রকাশ পায় এবং নফসের সেই হক কথা মেনে নিতে কষ্ট হয় ও হক কথা বলার পরও নফস তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে বাধা দেয় তাহলে বুঝতে হবে, নফস অহংকারের দোষে দুষ্ট। তাই আল্লাহ তাআলাকে ভয় করতে হবে এবং নফসের চিকিৎসায় মনোযোগী হতে হবে। আর এই চিকিৎসার পদ্ধতি হলো, প্রথমে নফসকে বারবার নিজের হীনতা এবং অশুভ পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে। একথা মেনে নিবে যে, অহংকার আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য শোভনীয় নয়। নফসকে সত্য স্বীকার করতে এবং সত্য বলার কারণে ওই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রশংসা করতে বাধ্য করবে, নিজের অপারগতা মেনে নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে উদ্দেশ্য করে বলবে। আপনার কথাই সঠিক। আমি এ ব্যাপারে উদাসীন ছিলাম। আমাকে সতর্ক করায় আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! হেকমত তো মুমিনের কাঙ্ক্ষিত বস্তু, যার কাছে সে তা পাবে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

বান্দা যখন এই কাজগুলো যথাযথভাবে পালন করবে তখন এগুলো তার অহংকারের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে এবং সত্যকে স্বীকার করা তার জন্য সহজ হয়ে যাবে। যদি সমকালীন ব্যক্তিদের সামনে সমকালীন কারও প্রশংসা করা তার জন্য কষ্টকর হয় তাহলে বুঝতে হবে, অহংকার তার পিছু ছাড়েনি। আর যদি এমন হয় যে, একাকী থাকাকালে তার প্রশংসা করতে কষ্ট হয় না; কিন্তু লোকসম্মুখে কষ্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে, তার মাঝে অহংকার না থাকলেও সে লৌকিকতার দোষে দুষ্ট। এমন

ব্যক্তির কর্তব্য হলো, প্রথমে নিজের লৌকিকতার চিকিৎসা করা। মানুষের কাছে কোনো কিছুর প্রত্যাশা না করা এবং নফসকে একথা বোঝানো যে, আল্লাহর সন্তুষ্টিই প্রকৃত সফলতা, মানুষের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টিতে কিছু আসে যায় না।

আর যদি একাকী থাকাকালে বা লোকসম্মুখে সর্বাবস্থায় তার প্রশংসা করা কষ্টকর হয় তাহলে বুঝতে হবে, সে অহংকার ও লৌকিকতা উভয় দোষে দুষ্ট। কাজেই তার ওপর আবশ্যক হলো, উভয়টির চিকিৎসা করা। কারণ উভয়টিই তার ধ্বংসের কারণ।

দ্বিতীয় পরীক্ষা : সমকালীন আলেমদের সাথে কোনো সভা সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার পর তাদেরকে নিজের সামনে যেতে দেওয়া ও নিজে তাদের পেছনে বসা যদি তার জন্য কষ্টকর হয় তাহলে বুঝতে হবে তার মাঝে অহংকার বিরাজমান। এমন ব্যক্তির কর্তব্য হলো, এই কাজগুলো বারবার করা। এর মাধ্যমেই তার অহংকার দূর করা সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে শয়তান মানুষকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। আর তা এভাবে যে, ওই ব্যক্তি একেবারে পেছনের কাতারে বসে এবং তার সমকালীন ব্যক্তিদের মাঝে তার চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদেরকে বসতে দেয়। সে এটাকে বিনয় মনে করে। অথচ এটা অহংকার বৈ কিছুই নয়। অহংকারীরা এটাকে বিনয় মনে করে। কারণ তারা ভাবে, তারা উত্তম হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে ছোট করে তাদেরকে জায়গা করে দিচ্ছে। তাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক, এটা মূলত বিনয়ের নামে অহংকার, এমন ব্যক্তির উচিত হলো, সমপর্যায়ের লোকদেরকে আগে বসতে দিয়ে নিজে তাদের পরেই বসা, একেবারে পেছনের কাতারে বসবে না।

তৃতীয় পরীক্ষা : দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের দাওয়াত কবুল করা এবং বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের প্রয়োজনে নিজে বাজারে যাওয়া। যদি তার কাছে কষ্টকর মনে হয় তাহলে বুঝতে হবে, সে অহংকারী। বস্তুত এসব কাজ তো সৎস্বভাবের পরিচয় বহন করে। এর প্রতিদানও ব্যাপক। কাজেই অন্তরে বিদ্বেষ থাকলেই কেবল এসব কাজকে ঘৃণা করা সম্ভব। অতএব, বারবার একাজগুলোর পুনরাবৃত্তিই এই অহংকারের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে।

চতুর্থ পরীক্ষা : বাজার থেকে নিজের, নিজের পরিবারের বা বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন করে নিয়ে আসবে। নফস যদি তার এই কাজকে ঘৃণা করে তাহলে বুঝতে হবে সে অহংকার অথবা লৌকিকতার দোষে দুষ্ট। যদি রাস্তায় একাকী থাকাকালে তার কাছে কাজটি কষ্টকর হয় তাহলে সে অহংকারী। আর লোকসম্মুখে তা কষ্টকর মনে হলে সে রিয়াকারী। অহংকার ও রিয়া উভয়টিই অন্তরকে ধ্বংসকারী ব্যাধি। আপসোস! মানুষ দেহের চিকিৎসা নিয়ে পড়ে আছে কিন্তু অন্তরের চিকিৎসা সম্পর্কে উদাসীন। অথচ দেহের রোগব্যাধি সর্বোচ্চ মৃত্যু পর্যন্তই নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্তরের সুস্থতা ছাড়া পরকালে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

'(সেদিন সে ব্যক্তিই কেবল উপকৃত হবে) যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।' (সূরা শুআরা : ৮৯)

বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (র) একটি লাকড়ির বোঝা মাথায় নিলে লোকেরা বললো, আপনার গোলাম ও সেবকরা কি যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, অবশ্যই, কিন্তু আমি আমার নফসকে যাচাই করতে চাই যে, সে একাজকে অপছন্দ করে কি-না। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৩ : ৪১৬)

ভেবে দেখুন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (র) তাঁর সংকল্পের ওপর নির্ভর করেননি ; বরং তিনি পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করেছেন যে, তার সংকল্প সত্য কি-না।

হাদিসে এসেছে,

مَنْ حَمَلَ الْفَاكِهَةَ أَوِ الشَّيْءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ফল অথবা অন্য কিছুর বোঝা মাথায় নিবে, সে অহংকার থেকে মুক্ত থাকবে। (বাইহাকী, শুআবুল ঈমান : ৭৮৫৩)

পঞ্চম পরীক্ষা : নিম্নমানের কাপড় পরিধান করবে। অন্তর যদি লোকসম্মুখে এরূপ কাপড় পরাকে অপছন্দ করে তাহলে তা রিয়া। আর যদি একাকী থাকাকালে তা অপছন্দ করে তাহলে তা অহংকার।

বর্ণিত আছে, ওমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর একটি চটের পোশাক ছিল, তিনি রাতে সেটা পরিধান করতেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন : ৮ : ৪০৫)

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

مَنِ اعْتَقَلَ الْبَعِيْرَ وَلَبِسَ الصُّوْفَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ.

যে ব্যক্তি উটকে আটকে রাখে এবং পশমের পোশাক পরিধান করে সে অহংকার থেকে মুক্ত থাকে। (মারিফাতুস সাহাবা : ৪১২; রিআয়াহ : ৪১২)

অন্য হাদিসে তিনি বলেন,

اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ اٰكُلُ بِالْأَرْضِ وَأَلْبَسُ الصُّوْفَ وَ أَعْقَلُ الْبَعِيْرَ، وَأَلْحَقُ أَصَابِعِيْ، وأُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

আমি আল্লাহর বান্দা। মাটিতে বসে আহার করি, পশমের পোশাক পরিধান করি, উট বেঁধে রাখি, খাওয়ার পর আঙুল চেটে খাই, গোলামের দাওয়াত কবুল করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। (রিআয়াহ : ৪১২; ইতহাফ : ৮ : ৪০৫-৪০৬)

বর্ণিত আছে, একবার কেউ একজন আবু মুসা আশআরী (রা)-কে বললো, কিছু মানুষ ভালো কাপড় না থাকার কারণে জুমার নামায আদায় করে না। একথা শুনে তিনি একটি আবা পরিধান করে লোকদের সামনে নামায আদায় করেন।

মোটকথা, এগুলো এমন ক্ষেত্র যেখানে রিয়া এবং অহংকার একত্র হতে পারে। যদি তা লোকসম্মুখে হয় তাহলে তা রিয়া। আর যদি একাকী থাকাকালে হয় তাহলে অহংকার। আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ কোনটি তা জানে না, সে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে না। আর যে তার রোগ সম্পর্কে জানে না, সে তার চিকিৎসাও করতে পারে না।

বিনয় অর্জনের চূড়ান্ত সীমা

অন্যান্য সকল গুণের মতো বিনয়েরও তিনটি স্তর রয়েছে। যে স্তরটি বাড়াবাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যায় সেটা অহংকার। যে স্তরটি স্বল্পতার দিকে নিয়ে যায় সেটাকে বলে অপমান ও লাঞ্ছনা। আর উভয়টির মধ্যবর্তী স্তরটিকে বলা হয় বিনয়।

উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণ হলো, অপমান ও লাঞ্ছনা ব্যতিরেকে বিনয় অবলম্বন করা। আর বাকি স্তর দুটি নিন্দনীয়। আল্লাহ তাআলাও সব বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাকেই পছন্দ করেন। যে ব্যক্তি তার সমপর্যায়ের লোকদের আগে যেতে চায় সে অহংকারী। আর যে তাদের পেছনে থাকে সে বিনয়ী।

বিনয়ের অর্থ হলো, প্রাপ্য সম্মান অন্যের জন্য ছেড়ে দেওয়া। যদি কোনো আলেমের কাছে একজন মুচি আসে আর আলেম তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিজের জায়গায় ওই মুচিকে বসায়, তার জুতা সোজা করে দেয় এবং তার পেছনে পেছনে তার বাড়ি পর্যন্ত যায় তাহলে এটা বিনয় নয়; বরং এটা নিজেকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা বৈ কিছুই নয়। এটা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। আল্লাহ তাআলা ইনসাফ করাকে পছন্দ করেন। আর ইনসাফ হলো প্রাপককেই তার প্রাপ্য হক দেওয়া। কাজেই আলেমের তার সমপর্যায়ের বা মর্যাদায় নিকটবর্তী লোকদের সাথেই বিনয় অবলম্বন করা উচিত। আর সাধারণ মানুষের সাথে আলেমের বিনয় অবলম্বনের পদ্ধতি হলো, হাসিমুখে তাদের সাথে কথা বলবে, নম্রভাবে কুশলাদি বিনিময় করবে, তাদের দাওয়াত কুবল করবে এবং তাদের প্রয়োজন পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। আলেম নিজেকে তাদের চেয়ে উত্তম মনে করবে না; বরং নিজের পরিণাম নিয়ে ভীত থাকবে। তাদেরকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবে না। কারণ, সে নিজেই তার পরিণাম সম্পর্কে অবগত নয়। মোটকথা, বিনয় অর্জনের জন্য আবশ্যক হলো, নিজের সমপর্যায়ের বা তার চেয়ে কম মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের সাথে বিনয় অবলম্বন করবে। যাতে ওই প্রশংসনীয় গুণটি তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় এবং অহংকার চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যখন বিনয় অবলম্বন তার অভ্যাসে পরিণত হবে তখন সে বিনয়ের গুণে গুণান্বিত হতে পারবে, আর যদি বিনয় অবলম্বন

করা তার জন্য কঠিন হয়। এরপরও সে বিনয় অবলম্বন করে তাহলে সে ভানকারী হবে, বিনয়ী নয়। কারণ গুণ তো সেটাই যার মাধ্যমে কোনো কষ্ট, বিনয় অবলম্বন করতে করতে সে নিজের মর্যাদা ও অবস্থানের কথা বেমালুম ভুলে যায় তাহলে এটাও এক প্রকার সীমালঙ্ঘন। নিজেকে এতটা নীচু করা উচিত নয়। বরং কিছুটা হলেও বড় মনে করা উচিত। যাতে ইনসাফের স্তরে পৌঁছা যায়। মুমিনের নিজেকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত মনে করা জায়েয নেই।

বস্তুত কৃপণতার চেয়ে অপব্যয় যেমনিভাবে মানুষের কাছে প্রশংসনীয় তেমনিভাবে বিনয়ের ক্ষেত্রে নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা অহংকার করার চেয়ে কম দুষনীয়। অপব্যয় ও কৃপণতা দুটিই নিন্দনীয় বিষয়, তথাপি অপব্যয়ের তুলনায় কৃপণতা বেশি নিন্দনীয়। তদ্রূপ অহংকার ও নিজেকে একেবারেই তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করা উভয়টিই নিন্দনীয়। কিন্তু অহংকারের চেয়ে নিজেকে হীন মনে করা কম নিন্দনীয়। তবে সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, প্রতিটি জিনিসকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তার যথাযথ স্থানে রাখাই প্রশংসনীয় কাজ।

আত্মতৃপ্তি

এ পর্বে আত্মপ্রীতির নিন্দা ও এর কারণে আপতিত মুসিবত এবং আত্মপ্রীতির প্রকৃত স্বরূপ ও এর সীমা এবং এর প্রতিকার ও প্রকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আত্মপ্রীতির নিন্দা ও মুসিবত। আত্মোৎফুল্লতার নিন্দা কুরআন ও হাদিস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا.

হুনায়নের যুদ্ধের দিনেও যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি। (সূরা তাওবা : ২৫)

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

وَ ظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا.

তারা ভেবেছিল, তাদের দুর্গসমূহ তাদের রক্ষা করবে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে। কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমনভাবে এলো যে তারা ভাবতেও পারেনি। (সূরা হাশর : ২)

এ আয়াতে কাফেরদের দুর্গ নিয়ে আত্মপ্রসাদের নিন্দা করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

যদিও তারা মনে করে, তারা সৎকর্মই করছে। (সূরা কাহফ : ১০৪)

এটাও আমলের কারণে আত্মপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত। এমনও হয় যে মানুষ এমন আমলের কারণে গর্ব করছে যে ক্ষেত্রে সে ভুল করছে।

এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) তিনটি বিষয়কে ধ্বংসকারী বলে অভিহিত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আত্মপ্রসাদ। (তাবারানী আওসাত : ৫৪৪৮; হিলয়াতুল আওলিয়া : ২ : ৩)

এ উম্মতের শেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি আবু সালাবাকে বলেন, যখন তোমরা দেখবে কৃপণতার আনুগত্যতা করা হচ্ছে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করা হচ্ছে আর প্রত্যেকে নিজের মতামতকেই ভালো মনে করছে তখন তুমি নিজের ব্যাপারে যত্নবান হও। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৩৪১; জামে তিরমিযী : ৩০৫৬; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০১৪)

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, দুটি বিষয় খুবই ক্ষতিকর— একটি হতাশা, অপরটি আত্মোৎফুল্লতা। (রিআয়াহ : ৩৩৬) এ কথা বলার কারণ এই যে, দুটি বিষয় দ্বারাই সৌভাগ্য হাসিল হয়— একটি হচ্ছে চেষ্টা ও অধ্যবসায়, অপরটি কর্মতৎপরতা। নিরাশ ব্যক্তি চেষ্টা করে না, আর যে আত্মোৎফুল্লতায় লিপ্ত, সে নিজেকে সৌভাগ্যশালী বলে বিশ্বাস করে। তাই লাভ করা থেকে বিরত থাকে। বিদ্যমান বস্তুর তালাশ করা হয় না। অসম্ভব বিষয় কেও তালাশ করা হয় না। আত্মপ্রীতিকারী সফলতা নিজের মনে করে আর হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তি মনে করে তা তার জন্য অসম্ভব। ফলে সম্ভব ও অসম্ভব এ দুব্যক্তির মাঝে একত্রিত হয়ে গেল।

আল্লাহ বলেন,

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ، هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র মনে করো না। মুত্তকিদের সম্পর্কে তিনি অধিক অবগত। (সূরা নাজম : ৩২)

ইবনে জুরাইজের মতে এর অর্থ- কেউ কোনো সৎকাজ করে যেন এ কথা না বলে যে, সে এটি করেছে। যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন, নিজেকে নেককার বলে বিশ্বাস করো না। এটা আত্মোৎফুল্লতা। উহুদ যুদ্ধে হযরত তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে দুশমনের আঘাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁর গায়ের ওপর পড়ে গিয়েছিলেন, যেন দুশমনদের বর্শার আঘাত তাঁর নিজের গায়েই লাগে। এর ফলে তাঁর হাতের তালু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল এবং নবীজী (স) অক্ষত ছিলেন। (সহিহ বুখারী : ৩৭২৮)

এ ছিল এক মহৎ প্রচেষ্টা। তাঁর দৃষ্টিতেও পরবর্তীতে এর যথেষ্ট মাহাত্ম্য ছিল। হযরত উমর (রা) নিজের অন্তরচক্ষু দ্বারা তাঁর এ আত্মোৎফুল্লতা জেনে নেন এবং বলেন, নবী কারীম (স)-এর জন্যে তালহার হাত ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পর থেকে তার মধ্যে আত্মোৎফুল্লতা দেখা যাচ্ছে। البأو (বাউ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে আত্মপ্রীতি। কিন্তু এ ব্যাপারে বর্ণিত নেই যে তিনি তা প্রকাশ করেছেন বা কোনো মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করেছেন আর যখন পরামর্শের সময় হলো, ইবনে আব্বাস (রা) তাকে বললেন, তালহার তুলনায় তোমার অবস্থান কোথায়? তিনি বললেন, এ তো এমন ব্যক্তি যার মধ্যে অহমিকা রয়েছে।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এমন পুণ্যবান সাহাবীও যখন প্রীতি থেকে বাঁচতে পারলেন না, তখন দুর্বলচিত্তের মানুষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে তাদের কী অবস্থা হবে।

মুতাররিফ (র) বলেন, আমি যদি পুরো রাত নাক ডেকে ঘুমাই এবং ভোরে এ গাফলতির জন্য দুঃখ করি, তবে তা সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ে ভোরে আত্মতৃপ্তিতে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে যথেষ্ট উত্তম। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ২০০)

রাসূলে কারীম (স) বলেন,

لَوْلَمْ تُذْنِبُوْا لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَاهُوَ اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ الْعُجْبَ الْعُجْبَ.

অর্থাৎ, তোমরা যদি পাপ না কর, তাহলে আমি তোমাদের জন্য এর চেয়েও ভয়ানক বিষয়ের আশঙ্কা করি। সেটা হলো আত্মপ্রীতি। (মুসনাদে বাযযার : ৬৯৩৬)

এখানে আত্মপ্রসাদকে সকল গুনাহের চেয়ে বড় বলা হয়েছে। বিশর ইবনে মানসুর (র) সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকতেন। ফলে তাঁকে দেখলে আল্লাহ ও কিয়ামতের কথা মনে হতো। একদিন তিনি দীর্ঘসময় নামায পড়লেন। এক লোক পিছন থেকে তাকে দেখল। সালাম ফিরিয়ে তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি আমার যে অবস্থা দেখছ, এতে আশ্চর্যান্বিত হয়ো না। অভিশপ্ত ইবলীসও ফেরেশতাদের মধ্য থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইবাদত করেছিল। কিন্তু তার পরিণাম কী হয়েছে, তাতো তুমি জানোই।

আয়েশা (রা)-কে কেউ প্রশ্ন করল, মানুষ কখন খারাপ হয়? তিনি বললেন, যখন সে নিজেকে উত্তম ভাবতে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى.

তোমরা অনুগ্রহ প্রকাশ করে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দানকে মিটিয়ে দিয়ো না। (সূরা বাকারা : ২৬৪)

অনুগ্রহ প্রকাশ হচ্ছে দানকে বড় মনে করার ফল। বলাবাহুল্য, কোনো আমলকে বড় মনে করাই আত্মপ্রসাদ বা আত্মপ্রীতি। অতএব জানা গেল যে, আত্মপ্রীতি নিশ্চিতই মন্দ কাজ।

আত্মোৎফুল্লতার কুফল

আত্মোৎফুল্লতা অহংকারের অন্যতম কারণ। তাই আত্মোৎফুল্লতা যদি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত হয়, তাহলে এর কারণে মানুষ অনেক পাপকে স্মরণই করে না। যদিও বা স্মরণ করে, তবে তাকে সগীরা গুনাহ বা ছোট অপরাধ ভেবে তা মোচনে তৎপর হয় না; বরং ভাবতে থাকে যে, এসব তো মাফই হয়ে যাবে। তাছাড়া মানুষ নিজের ইবাদত ও আমলকে অনেক বড় মনে করে তাতে খুশি থাকে, আল্লাহর প্রতি অনুগ্রহ মনে করে এবং আল্লাহর নিয়ামত ভুলে যায়। কেউ যখন নিজের আমলের কারণে উৎফুল্লতায় মগ্ন হয়, সে তখন সেই আমলের বিপদ সম্পর্কে একদম বেখবর হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমলের বিপদ সম্পর্কে বেখবর থাকে, তার চেষ্টা-প্রচেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কেননা, বাহ্যিক আমল পাক-সাফ না হলে তা কম উপকারী হয়ে থাকে। যে লোক বেশি ভয় করে, সে সেই আমলের বিপদ তালাশ করে। যে আত্মোৎফুল্লতায় লিপ্ত, সে অনর্থক নির্ভীক হয়ে থাকে। সে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এজন্যই সে নিজের প্রশংসা নিজেই গায়। যে লোক নিজের মতামত ও বুদ্ধিমত্তার ব্যাপারে আত্মতৃপ্ত, সে পরামর্শ গ্রহণ ও জিজ্ঞাসা করে জেনে নেওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে। সে নিজের চেয়ে বড় জ্ঞানী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করাকে দূষণীয় মনে করে এবং কোনো পরামর্শদাতার কথা মূল্যায়ন করে না; বরং অন্যকে মূর্খের ন্যায় মনে করে। তার নিজস্ব মতামতটি যদি দীনি বিশ্বাস সম্পর্কিত হয়, তবে এর কারণে সে চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়। যদি সে তার নিজেকে দোষারোপ করত, সে নিজের মতো সঠিক মনে করতো না এবং কুরআনের আলোয় আলোকিত হতো এবং ওলামায়ে কেরাম থেকে সাহায্য নিতো এবং ইলমের কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক রাখতো এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করতো, এরূপ করলে সে হকের দ্বারপ্রান্তে চলে যেত। এটা ও এই জাতীয় বিষয়াদি আত্মপ্রীতির মুসিবত। এই মুসিবতের মধ্য থেকে বড় মুসিবত হচ্ছে, চেষ্টা-প্রচেষ্টায় অলসতা করে এ ধারণা করে যে সে তো সফলকাম। তার আর চেষ্টার প্রয়োজন নেই। এটা নিঃসন্দেহে ধ্বংসাত্মক বিষয়।

আত্মতৃপ্তির পরিচয়

যে-কোনো ভালো কাজের মোহ থাকাই আত্মপ্রীতি। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে পূর্ণতার গুণ আছে বলে জানে, তার তিনটি অবস্থা হতে পারে। (১) সেই পূর্ণতার গুণটি লুপ্ত হওয়ার অথবা বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে। এ অবস্থায় আত্মোৎফুল্লতা হবে না। (২) লুপ্ত বলা হবে না। (৩) লুপ্ত হওয়ারও ভয় থাকবে না এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত বলেও বিশ্বাস করবে না; বরং সেটিকে নিজের কৃতিত্ব ও গুণ মনে করেই তুষ্ট হবে। একেই বলা হবে আত্মপ্রীতি। অতএব, আত্মপ্রীতির সংজ্ঞা এ দাঁড়ালো যে, কোনো পূর্ণতার গুণকে বড় মনে করে তুষ্ট হওয়া এবং সেটি যে আল্লাহ

তাআলার পক্ষ থেকে একটি অনুগ্রহ, একথা একদম ভুলে যাওয়া। এর সাথে যদি আল্লাহর ওপর প্রতিদান দেওয়া অধিকার হয়ে গেছে বলে মনে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে, তাহলে তাকে বলা হবে গর্ব, যা আত্মপ্রীতির উপরের স্তর। দুনিয়াতেও এমনটি হয় যে, এক ব্যক্তি কাউকে কোনো কিছু দিয়ে সেটাকে খুব বড়ও মনে করে। এতটুকুতে শুধু আত্মোৎফুল্লতা হয়। কিন্তু যদি সে এ দেওয়ার বদলে তার নিকট কোনো খিদমত আশা করে, তবে একে বলা হয় গর্ব। এর সাথে যদি এটাও যুক্ত হয় যে সে মনে করে, আল্লাহর কাছে তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, ফলে দুনিয়াতে আমলের দ্বারা মর্যাদা কামনা করে। তার ওপর কোনো অপছন্দনীয় বিষয়কে সে অকল্পনীয় মনে করে। একে বলা হয় আমল দ্বারা গর্বকারী বা দম্ভকারী।

এমনিভাবে অন্য ব্যক্তিকে কিছু দান করে এবং সেটাকে বড় মনে করে এবং অনুগ্রহ করছে মনে করে, ফলে সে আত্মপ্রীতিকারী হয়ে যায়। আর যদি তার ওই কাজের ফলে খেদমতের প্রত্যাশী হয় বা নিজের প্রয়োজনে কাজে না আসাকে খারাপ মনে করে তাহলে এটাকে অহমিকা বলা হয়।

আল্লাহ বলেন, وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ "বেশি প্রাপ্তির আশায় কারও প্রতি অনুগ্রহ করো না।" (সূরা মুদ্দাসসির : ৬)

এ আয়াতের তাফসীরে কাদাতাহ (রা) বলেন, নিজ আমল দ্বারা গর্ব করো না। হাদিস শরীফে আছে— দাম্ভিকের নামায তার মাথা অতিক্রম করে না; অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। মোটকথা, যে দম্ভ প্রকাশ করে, সে আত্মোৎফুল্লতাও অনুভব করে। কিন্তু যে আত্মোৎফুল্লতা অনুভব করে, তার গর্ব করতে হয় না। কেননা, আত্মোৎফুল্লতা হয় শুধু নিয়ামতকে বড় জানা এবং নিয়ামতদাতাকে ভুলে যাওয়ার দ্বারা। এতে প্রতিদান আশা করার শর্ত নেই। অপরদিকে প্রতিদান আশা করা ব্যতীত গর্ব হয় না। সুতরাং কেউ যদি কবুল হওয়ার আশায় দোয়া করে, এরপর কবুল না হওয়াকে মনে মনে খারাপ বিশ্বাস করে, তাহলে সে দাম্ভিকদের মাঝে গণ্য হবে। যদি কোনো ব্যক্তি দুআ করলো কিন্তু তা কবুল না হওয়ায় অসন্তুষ্ট হলো বা অবাক হলো এটা হচ্ছে আত্মপ্রীতি। কেননা, ফাসেকের দুআ কবুল না হওয়ার ওপরই আশ্চর্য প্রকাশ করা হয় না বরং কবুল হওয়ার ওপরও আশ্চর্য প্রকাশ করা হয়। এসব বিষয় হচ্ছে অহংকারের কারণ।

আত্মোৎফুল্লতা থেকে বাঁচার উপায়

এটাতো সবাই জানে যে, প্রত্যেক রোগের প্রতিকার হবে তার কারণের বিপরীত কারণকে সামনে আনা। আত্মপ্রীতির কারণ যেহেতু অজ্ঞতা, তাই তার প্রতিকার হবে সেই ইলম, যা অজ্ঞতার বিপরীত। আত্মপ্রীতি এমন সব কাজেও হয় যা বান্দা করতে সক্ষম। যেমন, ইবাদত, সদকা, জিহাদ, রাজনীতি, ইসলাহ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এবং এমন কাজের ক্ষেত্রেও হয় যেখানে বান্দা অক্ষম। যেমন সৌন্দর্য, ক্ষমতা এবং বংশ ইত্যাদি। বান্দা যেসব কাজে সক্ষম সেসব ক্ষেত্রে আত্মপ্রীতি বেশি করে থাকে যেসব কাজে অক্ষম সে সবের তুলনায়। মানুষ তার পরহেযগারি ও আমলের কারণে যে আত্মপ্রীতি করে থাকে এর দুটি কারণ হতে পারে। ১. আত্মপ্রীতিকারী ব্যক্তি ওই ইবাদতের কেন্দ্র। ২. ওই ইবাদত সে নিজে করেছে। তার সক্ষমতা ও শক্তির ফলে তা অস্তিত্বে এসেছে। সুতরাং যদি আত্মপ্রীতিকারীর আত্মপ্রীতির কারণ প্রথমটা হয় অর্থাৎ, সে আমলের মারকায তাহলে এটা জাহালাত বা মূর্খতা। কেননা কোনো মারকায বা স্থানের কোনো কিছু আবিষ্কার ও অর্জনে কোনো হাত নেই। কেননা সে অন্যের আদেশে পরিচালিত হয়। তাই এমন বস্তুর ওপর কীভাবে আত্মপ্রীতি করা যেতে পারে, যে না কোনো কিছু নিজের স্বাধীন মতো করতে পারে, না অর্জন করতে পারে আর যদি দ্বিতীয় কারণে অর্থাৎ, ওই সব আমল তার ইচ্ছায় প্রকাশ পাচ্ছে ফলে আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে ওই শক্তি, স্বাধীনতা, ইচ্ছা, অঙ্গ, যার দ্বারা সে আমল করেছে তা কোথা থেকে এসেছে? যদি এসব কিছু আল্লাহর নিয়ামত হয় যা তার প্রাপ্য না হওয়া সত্ত্বেও সে পেয়েছে তাহলে আত্মপ্রীতি আল্লাহর দয়া,মায়া, দানের ওপর হওয়া উচিত।

এবিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা উচিত। যেমন বাদশাহ তার গোলামদের দিকে তাকালেন এরপর একজনকে মুক্ত করে দিলেন, না তার সৌন্দর্যের কারণে, না তার খেদমতের কারণে, না বিশেষ কোনো গুণের কারণে। কাজেই যাকে মুক্ত করা হয়েছে তার আশ্চর্য হওয়া উচিত বাদশাহের অনুগ্রহের ওপর এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার ওপর। সুতরাং এক্ষেত্রে তার আত্মপ্রীতির রোগে ভেসে যাওয়া কীভাবে সম্ভব? তার এক্ষেত্রে কোনো ভাবেই আত্মপ্রীতি দেখানো উচিত নয়।

তবে গোলাম এই বিষয়ের ওপর আত্মপ্রীতি প্রকাশ করতে পারে যে বাদশাহ অনেক ন্যায়পরায়ন, কারও ওপর জুলুম করে না। যদি আমার মধ্যে কোনো ভালো গুণ না দেখেন তাহলে আমাকে এই পুরষ্কার কেন দিলেন। এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, ভিন্নভাবে তোমার মাঝে কোনো গুণ নেই আর যদি কোনো গুণ থেকে থাকে তা হচ্ছে বাদশাহ তার পুরষ্কারের যোগ্য তোমাকে মনে করেছেন। অন্য কোনো ব্যক্তিকে এই পুরষ্কারে ভূষিত করেননি। আর যদি বাস্তবে তোমার কোনো গুণ থেকে থাকে তাহলে সেটা কি বাদশাহর থেকে প্রাপ্ত না অন্য কারও থেকে প্রাপ্ত। সুতরাং যদি ওই গুণ বাদশাহের পক্ষ থেকে পেয়ে থাকে তাহলে আত্মপ্রীতির কী আছে?

বাদশাহ প্রথমে তোমাকে ঘোড়া দিয়েছে তখন তুমি আত্মপ্রীতি দেখাওনি। এরপর যখন তোমাকে গোলাম দিয়েছেন তখন তুমি বলতে লাগলে, আমার কাছে ঘোড়া ছিল তাই বাদশাহ আমাকে গোলাম দিয়েছেন।

অন্যদের কাছে ঘোড়া ছিল না তাই তারা গোলাম থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, ঘোড়াও তো বাদশাহর প্রদত্ত। বাদশাহ চাইলে দুইটি এক সাথেও দিতে পারতেন। এখন তিনি পৃথক পৃথক দিয়েছেন। এটা তার পরিচালনার কৌশল মাত্র। এতে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? তুমি ঘোড়ার মালিক হয়ে আত্মপ্রীতি দেখাচ্ছো অথচ তোমার বাদশার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে তিনি তোমাকে অনুগ্রহ করেছেন।

আর যদি ওই গুণ বা বৈশিষ্ট্য বাদশাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে পেয়ে থাকে তাহলে আত্মপ্রীতি প্রকাশ করতে পারে। এজন্য যে, এটা বাদশাহ থেকে প্রাপ্ত নয়। বর্ণিত বিষয় দুনিয়ায় বাদশার বিষয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে কিন্তু সর্বময় ক্ষমতাধর আল্লাহর ক্ষেত্রে হতে পারে না, যিনি বাদশাহদের বাদশাহ, সব কিছুর স্রষ্টা। যেমন, বান্দা যদি তার ইবাদতের ওপর এজন্য আত্মপ্রীতি করে যে আমি যেহেতু আল্লাহকে ভালোবাসি তাই তিনি আমাকে ইবাদতের তাওফিক দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার অন্তরে ভালোবাসা কে দিয়েছেন? সে বলবে, আল্লাহ তাআলা। আমরা তাকে বলব, ভালোবাসা ও ইবাদত উভয়টিই আল্লাহর নিয়ামত। তোমার কোনো অধিকার না থাকা সত্ত্বেও তোমাকে তিনি দিয়েছেন। এই নিয়ামতের ওপর এদিক থেকে গর্ব করা উচিত নয় যে, আমাকে দেওয়া

হয়েছে বরং গর্ব এজন্য করতে হবে যে এটি আল্লাহর নিয়ামত, আল্লাহ দান করেছেন। তিনি তোমাকে সৃজন করেছেন। এরপর তোমার ভিতর বিভিন্ন গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। সক্ষমতা দান করেছেন। তাওফিক দিয়েছেন। সুতরাং আবেদের তার ইবাদতের জন্য, আলেমের তার ইলমের কারণে, ধনী ব্যক্তির তার সম্পদের কারণে, সুদর্শন তার সৌন্দর্যের কারণে গর্ব ও আত্মপ্রীতি প্রকাশ করা উচিত নয়। কেননা, এসব নিয়ামত আল্লাহ প্রদত্ত। সে শুধু ওই নিয়ামতের মহল বা পাত্র। তা আল্লাহর অনুগ্রহে, তার নিজের যোগ্যতার জন্য নয়।

কেউ যদি এই প্রশ্ন করে যে, আমি আমার আমল থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারবো না। কেননা, যখন আমি কোনো আমল করি, এর সওয়াব ও প্রতিদানের আশা রাখি। সুতরাং যদি ওই কাজ বা আমল আমার না হয় তাহলে সওয়াবের প্রত্যাশী হওয়ার অর্থ কী? যদি সৃজনের দিক দিয়ে ওই আমল আল্লাহরই হয়ে থাকে তাহলে আমাকে কেন সওয়াব দেওয়া হবে? আর যখন আমল আমার শক্তিতেই হয়েছে, তাই আমি কেন গর্ব করতে পারবো না?

এর দুটি উত্তর রয়েছে। ১. স্পষ্ট হক। ২. যার মাঝে শিথিলতা রয়েছে। প্রথমটির বিশ্লেষণ হচ্ছে, তোমার সক্ষমতা, তোমার ইচ্ছা, তোমার সব আমল আল্লাহর মাখলুক। সুতরাং যখন তুমি কোনো আমল করো, নামায পড়, মাটি নিক্ষেপ করো, তা তুমি করো না বরং আল্লাহ তাআলা করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى.

আপনি যখন নিক্ষেপ করেছিলেন তখন আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহই নিক্ষেপ করেছিলেন। (সূরা আনফাল : ১৭)

এটাই সত্য কথা। অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের এমন মুশাহাদা হয়েছে, যা মানুষের চক্ষু মুশাহাদা করতে পারে না। আল্লাহ প্রথমে তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এরপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন, শক্তি দান করেছেন এরপর তোমাকে ইলম ও আকল দান করেছেন। এরপর কোনোটা তোমার থেকে চাইলেও পৃথক করতে পারবে না। তোমার শরীরের যে শক্তি, তা আল্লাহর

সৃষ্টি। এতে তোমার কোনো হাত নেই। যতক্ষণ অঙ্গে শক্তি এবং অন্তরে ইচ্ছাশক্তি দান করেননি ততক্ষণ পর্যন্ত নড়াচড়ার শক্তি প্রদান করেননি। উদ্দিষ্ট বিষয়টি আগে সৃষ্টি করেছেন, এরপর ইচ্ছাশক্তি সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে ইলমের স্থান বা পাত্র অন্তর সৃষ্টি করার পূর্বে ইলমকে সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তাআলা সৃজনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ রেখেছেন। ফলে মানুষ মনে করে, সে তার কাজের স্রষ্টা। অথচ এটা তার ভুল ধারণা। আর বাকি থাকলো আল্লাহর সৃষ্টি করার ফলে বান্দা সওয়াব কেন পাবে? তো এর উত্তর আমি শোকরের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে, যদি তুমি এই ধারণা রাখো যে আমল তোমার শক্তিতে অস্তিত্বে এসেছে। তাহলে প্রশ্ন হবে, এই শক্তি কোথা থেকে পেলে? তোমার অস্তিত্ব ব্যতীত ও তোমার কুদরত, ইচ্ছা এবং ওই সমস্ত জিনিস যার মাধ্যমে ইবাদত অস্তিত্বে এসেছে, এসব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে, কোনো মানুষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত নয়। আমল যদি শক্তির চাবির দ্বারা বিদ্যমান হয় তাহলে এর চাবি তো আল্লাহর হাতে। সুতরাং আল্লাহ যদি তোমাকে এই চাবি না দান করেন তাহলে আমল করা যাবে না। ইবাদত, যার দ্বারা পরকালের মুক্তি। আর এর মাধ্যম হচ্ছে শক্তি, ইচ্ছা, ইত্যাদি এসব আল্লাহর অধীনে, বান্দার অধীনে নয়। যদি তোমার কোনো খাযানা কোনো কেল্লায় আবদ্ধ থাকে আর এর চাবি রক্ষীর কাছে থাকে, এখন তুমি কি তোমার ওই খাযানা চাবি ছাড়া হস্তগত করতে পারবে? কখনোই না। হাজার বছর ওই কেল্লার দরজায় পড়ে থাকলেও তা হস্তগত করতে পারবে না। এমনকি একটি দিরহামও না। কিন্তু যদি রক্ষী তোমাকে চাবি দিয়ে দেয় তাহলে শুধু দেখতেই না বরং যত খুশি নিতে পারবে। এ উদাহরণের আলোকে বলব, খাযানা তোমার আমল দ্বারা হাসিল হয়েছে অথবা রক্ষীর সুযোগ দেওয়ার কারণে।

এক্ষেত্রে রক্ষীর চাবি দেওয়ার কারণে কি গর্ব করবে, না একারণে গর্ব করবে যে তুমি নিজে কেল্লায় প্রবেশ করে খাযানা নিয়েছো? জাহেরিভাবে তো তুমি রক্ষীর অনুগ্রহের কথাই বলবে। চাবি দিয়ে তালা খোলা ও খাযানা হতে নেওয়া তো সবাই পারবে। মুশকিল বিষয় ছিল চাবি পাওয়া। রক্ষী যদি চাবি না দিতো তাহলে কখনো সম্পদ অর্জন করা যেত না।

ইবাদতের অবস্থা ঠিক এরূপই। যখন তোমাকে শক্তি দেওয়া হয়েছে এবং ইচ্ছা দেওয়া হয়েছে। সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করা হয়েছে এবং সকল আসবাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে নতুবা ইবাদত অস্তিত্বে আসত না। আর এসব কিছু আল্লাহ তাআলাই দিয়েছেন। এসবের ক্ষেত্রে তোমার কোনো দখলই নেই। এখন অবাক করার বিষয় হচ্ছে, এরপরও তুমি গর্ব বোধ করো ও আত্মপ্রীতি দেখাও।

আল্লাহর নিয়ামত ও দয়ার ওপর গর্ব করো না, যাঁর কারণে এসব কিছু হচ্ছে। তিনি তোমাকে ইবাদতের তাওফিক দিয়ে ফাসেকদের দলভুক্ত করেননি। ফাসেকদের জন্য শাস্তি রেখেছেন আর তোমাকে তা থেকে দূরে রেখেছেন। খারাপ সংস্রব থেকে দূরে রেখেছেন, তাদের কল্যাণ থেকে দূরে রেখেছেন আর তোমার জন্য সব দরজা খুলে দিয়েছেন। এসব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তোমার পূর্বের কোনো ভালো কাজের দখল নেই; বরং এর পুরোটাই আল্লাহর মেহেরবানি। তিনি তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। নেক কাজের জন্য চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমার সক্ষমতার ওপর আল্লাহর তাওফিক রয়েছে। যখন আল্লাহ তাআলা তোমার দ্বারা কোনো আমল নিতে চান তখন তোমার অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করে দেন। কাজেই যেই সত্তা তোমার অন্তরে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন তিনিই প্রশংসার যোগ্য। সুতরাং কাজের কর্তা একমাত্র আল্লাহই।

কিছু বদনসিব ব্যক্তি, যাদের আল্লাহ তাআলা ইলম ও আকল বা মেধা দান করেছেন, তারা সম্পদ না পাওয়ার কারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং কোনো জাহেল-গাফেল ব্যক্তিকে সম্পদশালী দেখে এ অভিযোগ করে যে আমাদের ইলম ও মেধা থাকা সত্ত্বেও আমরা বঞ্চিত। এমনকি এক বেলার খাবারও সহজে পাই না। আর ওই জাহেল গাফেল সম্পদে মত্ত। এসব লোক মনে করে, আল্লাহর এ বণ্টন ন্যায়সঙ্গত নয়; বরং জুলুমের কাছাকাছি। অথচ তার জানা নেই যে যদি তাকে সম্পদ ও মেধা এক সাথেই দেওয়া হতো তাহলে জাহেরিভাবে তা জুলুমের সাদৃশ্য হতো। কেননা, ওই সময় সংকীর্ণ ব্যক্তি অভিযোগ করতো, হে আল্লাহ! তুমি সম্পদ ও মেধা উভয়টাই তাকে দান করেছ আর আমাকে দুইটা থেকেই বঞ্চিত রেখেছ। আমকে তো একটা হলেও দিতে পারতেন।

আলী (রা)-এর কাছে কেউ একদিন এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি উত্তর দিলেন— তার মেধাও রিযিকের মধ্যে গণ্য। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হচ্ছে, মেধাবি দরিদ্র ব্যক্তি যখন কোনো জাহেলকে নিজের চেয়ে ভালো অবস্থায় দেখে তখন তার সার্বিক অবস্থা ওই ব্যক্তির অবস্থার সাথে পরিবর্তন করতে চায় না। অর্থাৎ নিজের দরিদ্রতা ও মেধা ওই ব্যক্তির হবে আর ওই ব্যক্তির জাহালাত ও সম্পদ তার হবে। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় তার ওপর আল্লাহর নিয়ামত বেশি। তাহলে কেন সে অবাক হয়? এমনিভাবে সুন্দরী মেয়ে লাবণ্যহীন মেয়ের গায়ে অলংকার দেখে বলে আমি সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও ওই অলংকার থেকে বঞ্চিত অথচ ওই মেয়ে অসুন্দরী হওয়ার পরও অলংকার পরিধান করে ঘুরছে। কী পরিমাণ অবাক হওয়ার বিষয় যে ওই বোকা মেয়ের জানা নেই সৌন্দর্যও সম্পদ বরং সবচেয়ে দামি সম্পদ। যদি তাকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয় দরিদ্রতার সাথে সৌন্দর্য আর অসৌন্দর্যতার সাথে সম্পদ এর মধ্যে থেকে কোনটা নিতে চাও তাহলে সে অবশ্যই সৌন্দর্যকেই প্রাধান্য দেবে। তাহলে বোঝা গেল, তার ওপর আল্লাহর নিয়ামত বেশি।

কোনো আকেল দরিদ্র ব্যক্তির এই ফরিয়াদ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে কেন বঞ্চিত রেখেছো এবং জাহেলকে দুনিয়া দিয়েছো? তার একথা ওই ব্যক্তির মতো হলো, যে বাদশাহের পক্ষ থেকে ঘোড়া হাদিয়া পেয়ে বলল, হে বাদশাহ আমাকে গোলাম কেন দেননি। ঘোড়াতো আমার কাছেই আছে। বাহ্যত বাদশাহ! এ কথাই বলবে যে, আমি যদি তোমাকে ঘোড়া না দিতাম তাহলে তুমি গোলাম পাওয়ায় অবাক হতে না। আমি তোমাকে ঘোড়া দিয়েছি, তুমি কি এই নিয়ামতকে অন্য নিয়ামত পাওয়ার মাধ্যম মনে করছ এবং অন্য আরেকটি নিয়ামত পাওয়ার জন্য দলিল বানাচ্ছ? এটা ওহাম জাহেলদের চরিত্র। এধরনের ওহামকে দূর করার পথ হচ্ছে, নিজের অন্তরে এবিষয়ের খেয়াল করবে যে, বান্দা এবং তার সব আমল এবং সমস্ত গুণাবলি আল্লাহর নিয়ামত। কোনো অধিকার ছাড়াই তাকে দেওয়া হয়েছে। এধরণের চিন্তাভাবনা দ্বারা অন্তর থেকে আত্মপ্রীতি দূর হয়ে যাবে এবং অন্তরে বিনয় সৃষ্টি হবে এবং অন্তরে এই ভয় কাজ করবে যে না জানি এই নিয়ামত হারিয়ে ফেলি। যার অন্তরে এই বিশ্বাস

বদ্ধমূল হয়ে যাবে, সে কখনো নিজের ইলমের ওপর গর্ব করবে না। যেহেতু সে জানে, তার এই নিয়ামতের উৎস হচ্ছে আল্লাহ তাআলা।

দাউদ (আ) একদা আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, কোনো দিন এমন যায় না যে দাউদের পরিবারের কোনো ব্যক্তি রোযাদার না এবং কোনো রাত এমন যায় না যে দাউদ-পরিবারের কেউ রাত্রিজাগরণ করেনি। এই কথা তিনি গর্ব করে বলেছিলেন, এরপর ওহি নাযিল হয়, হে দাউদ! এই ইবাদত তাদের কীভাবে হলো? এটা তো আমার তাওফিকের ফলে হয়েছে। যদি আমার তাওফিক না পেতে তাহলে না সারাদিন রোযা রাখতে পারতে, না রাতভর ইবাদত করতে পারতে। অচিরেই আমি তোমাকে তোমার নিজের ওপর ছেড়ে দিবো।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, দাউদ (আ)-এর সাথে যে মুআমালা করা হয়েছে এর কারণ এটাই ছিল যে তিনি তার পরিবারের আমল গর্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। তাইতো আল্লাহ তাকে তার নিজের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। দাউদ (আ) আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! বনি ইসরাঈল ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব (আ)-এর মধ্যস্থতা দিয়ে কেন দুআ করতেন। ইরশাদ হলো, আমি তাদের পরীক্ষা করেছিলাম। তারা অটল ছিল। তিনি এরপর বললেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার পরীক্ষাও নিয়ে নেন। আমিও ধৈর্যধারণ করব। তার এই প্রকাশভঙ্গিতে এক ধরনের আত্মপ্রীতি ছিল। এরপর ওহি আসল, হে দাউদ! আমি যখন ওইসব বান্দাদের পরীক্ষা নিয়েছিলাম তখন তাদের বলে দেইনি যে কোন ধরনের পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং কোন মাসে নেব এবং কোন দিনে। কিন্তু আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমি আপনাকে এবছরই এবং এমাসে পরীক্ষা নিব। আগামিকাল আপনার স্ত্রীর মাধ্যমে পরীক্ষা নেব, সতর্ক থাকবেন। ফলে তাই হলো।

সাহাবিগণ নিজেদের শক্তির ওপর গর্ব করেছিলেন হুনাইন যুদ্ধে এবং আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ ভুলে গিয়ে বলছিলেন, আজ আমরা সংখ্যার কারণে পরাজিত হব না। কেননা আমাদের সংখ্যা আজ অনেক। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে নিজেদের ওপর ছেড়ে দিলেন। ফলে যা ঘটেছিল আল্লাহ কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْـًٔا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ.

এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনেও যখন তোমাদের উৎফুল্ল করেছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য; কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়েছিল। তারপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (সূরা তাওবাহ : ২৫)

ইবনে উইয়াইনা (র) বর্ণনা করেন, আইয়ুব (আ) আবেদন করেন যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই মুসিবতে ফেলেছেন এমতাবস্থায় যে আমি আপনার সামনে আমার বাসনা কুরবান করে দিয়েছি এবং আমার সব আমল আপনার সন্তুষ্টির অনুগামী। মেঘের থেকে আওয়াজ আসল, হে আইয়ুব! একথা তুমি কীভাবে বলছো? এই আওয়াজ শুনার পর আইয়ুব (আ) মাথায় মাটি দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! যা কিছু আছে সব তোমার থেকেই পেয়েছি। আল্লাহর ওহি তাকে জাগিয়ে তুলেছে এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, বান্দার সব আমল আল্লাহর তাওফিক দ্বারাই হয়ে থাকে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا.

তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারতে না। (সূরা নূর : ২১)

রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবিদের বলেছেন,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يُنْجِيْهِ عَمَلُهُ، قَالُوْا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: " لَا، وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ.

কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। তারা বললেন, আপনাকেও না? তিনি বললেন, আমাকেও না। তবে আল্লাহ যদি তার রহমত ও করুনা দ্বারা ঢেকে নেন তাহলে। (সহিহ বুখারী : ৫৬৭৩; সহিহ মুসলিম : ২৮১৬)

এরপর থেকে সাহাবিরা মাটি, পশুপাখি হয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা করতেন। কেননা তাদের তো হিসাব নেই।

কাজেই কীভাবে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি অহংকার করতে পারে তার আমল দ্বারা। সুতরাং এটাই হচ্ছে অন্তরের আত্মপ্রীতির মূলৎপাটনকারী। যখন অন্তরে এ ধারণা গেঁথে যাবে যে সে যেসব নিয়ামত ভোগ করছে সেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন সে সর্বদা এই ভয় করতে থাকে যে, না জানি এই নিয়ামত কবে আমার থেকে চলে যায়। বরং যখন সে কাফের ও ফাসেকদের দিকে তাকাবে এবং দেখবে, কোনো অপরাধ ব্যতীতই তাদের থেকে ঈমান ও আনুগত্যের নিয়ামত ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। অতঃপর সে চিন্তা করবে যে সত্তা কোনো কিছুর পরোয়া ব্যতীত নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে পারেন এবং কোনো মাধ্যম ছাড়াই দান করতে পারেন, তিনি কোনো দান করে তা আবার নিয়েও যেতে পারেন। কখনো এমন হয় যে মুমিন কাফের হয়ে মারা যায় আর কাফির মুমিন হয়ে মৃত্যুবরণ করে আর ফাসেক আনুগত্যকারী হয়ে। এ ধরনের চিন্তা অন্তরে আত্মপ্রীতির রাস্তা একেবারেই বন্ধ করে দেয়।

অজ্ঞতাবশত যে সমস্ত বিষয় নিয়ে মানুষ আত্মোৎফুল্লতায় লিপ্ত হয়, সেগুলো মোটামুটি আট প্রকার।

১. রূপ, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব ইত্যাদি নিয়ে আত্মোৎফুল্লতা অনুভব করা এবং সৌম্য আকৃতি ও সুন্দর চেহারা এবং আওয়াযের কারণে গর্ব করা। মোটকথা, সে তার নিজের সৌন্দর্যের দিকে তাকায় কিন্তু এটা যে আল্লাহর নিয়ামত তা ভুলে যায় অথচ তার এসব কিছু যে কোনো সময় শেষ হয়ে যেতে পারে।

এর চিকিৎসা তাই, যা আমরা রূপ-লাবণ্য নিয়ে অহংকার করার ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ, নিজের আদি-অন্ত অপবিত্রতার কথা চিন্তা করবে এবং অনুধাবন করবে যে, এর আগে কত অপরূপ সৌন্দর্যশালী মাটিতে মিশে গেছে এবং কবরে তাদের দেহ কেমন দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে।

২. শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে আত্মোৎফুল্ল হওয়া। যেমন— কুরআনে উল্লিখিত আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেছিল, مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً 'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কে?' যেমনিভাবে উয চাইছিল মুসা (আ)-এর বাহিনীর ওপর পাহাড় উচিয়ে রেখে দিবে এবং নিজের শক্তি দ্বারা তাদের ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু কিছু দুর্বল হুদহুদ পাখি যার ঠোঁট নরম হয়ে থাকে

তারা ওই পাহাড়ে এত বড় একটি ছিদ্র করল যে ওই পাহাড় উযের গলায় বেড়ি হয়ে গেল। কখনো কখনো মুমিনও নিজের ক্ষমতার ওপর ভরসা করে। যেমন সুলায়মান (আ) ইরশাদ করেছিলেন, আমি এক রাতে শত মহিলার সাথে রাত্রিযাপন করব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেননি, ফলে তিনি যে সন্তানের প্রত্যাশা করেছিলেন তা থেকে বঞ্চিত হন।

এমনিভাবে দাউদ (আ) পরীক্ষার সময় অটল থাকার দাবি করেন। কেননা তার নিজের শক্তির ওপর ভরসা ছিল। কিন্তু যখন এক মহিলার পরীক্ষায় নিপতিত হলেন তখন অটল থাকতে পারলেন না। আত্মপ্রীতির কারণে যুদ্ধে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া ও দুশমনকে মারা ও ধ্বংস করে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার বাসনা জাগে।

এর প্রতিকার হচ্ছে যা আমরা উল্লেখ করেছি। এক দিনের জ্বর তাকে একদম শেষ করে দেয় এবং শক্তি একদম শেষ হয়ে যায়। যদি তার শক্তির ওপর গর্ব হয় তাহলে হতে পারে আল্লাহ তাআলা সামান্য একটি মুসিবতের মাধ্যমে তার শক্তি শেষ করে দিবেন।

এর প্রতিকার হলো এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা যে, একদিনের জ্বরে শক্তিশালী মানুষ শক্তিহীন হয়ে যায়। তবে মানুষের আর কিসের শক্তির বড়াই। শক্তিমান একমাত্র মহান আল্লাহ। যিনি চিরঞ্জীব।

৩. নিজের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা নিয়ে আত্মোৎফুল্লতা অনুভব করা। এর ফলে মানুষ নিজের মতামতকে অটল রাখতে প্রাণপণ প্রয়াস চালায় এবং তার বিরুদ্ধে যে বলে, তাকে অজ্ঞ মনে করে । এর চিকিৎসা হলো, স্রষ্টার পক্ষ থেকে যে বুদ্ধিমত্তা দান করা হয়েছে, সেজন্য তাঁর শোকর আদায় করবে এবং চিন্তা করবে যে, তার মস্তিষ্কে একটু রোগ দেখা দিলে এমন পাগল হয়ে যেতে পারে, যার পেছনে শিশুরা হাসাহাসি করবে। এছাড়া নিজের বুদ্ধিমত্তা ও জ্ঞান-গরিমাকে খুবই যৎসামান্য মনে করবে। জেনে রাখো, তোমাদের যে ইলম প্রদান করা হয়েছে তা খুবই অল্প। যদিও তোমাদের কাছে বিস্তৃত মনে হয়। মানুষের জানা থেকে না জানার পরিমাণই বেশি। অনেক বিষয় যা শুধু অন্যরা জানে সে জানে না। যখন মানুষের ইলম অন্য মানুষের তুলনায় এ অবস্থা, তাহলে তার ইলম আল্লাহর ইলমের মুকাবিলায় কী অবস্থা হবে?

নিজের আকল ও ইলমকে অসম্পূর্ণ ভাবাই জ্ঞানীর পরিচয়। বোকারা নিজের চেয়ে বড় জ্ঞানী কাউকে মনে করে না। অথচ লোকেরা তার বোকামির কারণে হাসে। তুমি আত্মপ্রীতি দেখিয়ে বোকাদের তালিকাভুক্ত হয়ো না। অসম্পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি নিজের জ্ঞানের সল্পতা অনুধাবন করতে পারে না। সে তার বোকামির কারণে নিজেকে সবচেয় জ্ঞানী মনে করে। উত্তম হচ্ছে নিজের জ্ঞানের কম-বেশি নিজের কাছেই রাখবে, কারও কথায় কান দিবে না। কেননা, যে তোমার পক্ষে কথা বলে সে তোমার প্রশংসাই করবে ফলে আরও আত্মপ্রীতি ও গর্ব বৃদ্ধি পাবে।

মনে রাখবে, বুদ্ধিমত্তায় যার দোষ থাকে, সে নিজে কখনো ওই দোষ জানতে পারে না।

৪. বংশমর্যাদা নিয়ে আত্মপুলক অনুভব করা। যেমন অনেক সৈয়দ বংশীয় আত্মঅহংকারী মনে করে, বংশীয় গরিমা এবং পূর্বপুরুষদের দৌলতে পার পেয়ে যাবে। আবার অনেকে মনে করে, তারা ছাড়া আর সব মানুষ তাদের দাস-দাসী। এর চিকিৎসা করতে হলে একথা চিন্তা করতে হবে যে, আমি কর্ম ও চরিত্রে বংশের কৃতী পুরুষদের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। তা সত্ত্বেও মনে করি যে, তাঁদের স্তরে পৌঁছে গেছি। এটা শুধুই মূর্খতা। আমার গুরুজনদের মধ্যে তো আত্মপুলক ছিল না। বরং তারা নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ এবং সকল মানুষকে তাদের চেয়ে বড় মনে করতেন। আল্লাহর আনুগত্য ও উত্তম অভ্যাস দ্বারাই তো তারা গৌরব হাসিল করেছিলেন— বংশমর্যাদা দ্বারা নয়। অতএব, আমাকেও সেই গৌরবের অধিকারী হতে হবে। বংশ ও গোত্রের দিকে তাদের সমপর্যায়ে রয়েছে এমন ব্যক্তি, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনেনি। তারা আল্লাহর কাছে কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট এবং শুকর থেকেও খারাপ। তাইতো আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ أُنْثٰى.

হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। (সূরা হুজুরাত : ১৩)

বংশের দিক দিয়ে পার্থক্য এবং বংশের ফায়েদা কী তা উল্লেখ করেছেন,

وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا.

অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে। যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পারো। (সূরা হুজুরাত : ১৩)

গৌরব তো হাসিল হয় আল্লাহভীতির মাধ্যমে; বংশমর্যাদা দিয়ে নয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ.

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত : ১৩)

রাসূলুল্লাহ (স)-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষের মধ্যে সম্মানি ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কে? এর উত্তরে বলেননি, যিনি আমার বংশের হবে বরং বলেছেন, যে মৃত্যুর কথা বেশি স্মরণ করে এবং পরকালের জন্য খুব প্রস্তুতি নিতে থাকে।

উল্লিখিত আয়াতের প্রেক্ষাপট হচ্ছে, মক্কা বিজয়ের দিন বেলাল (রা) আযান দিলে হারেছ ইবনে হিশাম, সুহাইল ইবনে উমর ও খালেদ ইবনে উসাইদ অবাক বিস্ময়ে বলল, এ কাফ্রি ক্রীতাদস আযান দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ.

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত : ১৩)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জাহেলী যুগের বংশ গৌরবের প্রথা বাতিল করেছেন। তোমরা সবাই আদমের সন্তান আর আদম (আ) মাটি থেকে তৈরি। (সুনানে আবু দাউদ : ৫১১৬)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, হে কুরাইশ দল! লোকেরা পরকালে আমল নিয়ে আসবে না; বরং তোমরা কাঁধে করে দুনিয়া নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মদ মুহাম্মদ বলে ডাকতে থাকবে। আমিও এরূপই উত্তর দেবো। অর্থাৎ বিমুখ হয়ে থাকবো। অতপর তাদের এটা বুঝিয়ে দাও যে, তারা যদি দুনিয়ার দিকে দাবিত হয় তাহলে তাদের বংশ কোনো কাজে আসবে না।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন

وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ.

(হে নবী!) আপনি নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন। (সূরা শুআরা : ২১৪)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি এ আদেশ নাযিল হলে তিনি প্রত্যেককে নাম ধরে ডাকলেন। এমনকি বললেন, হে মুহাম্মদ কন্যা ফাতেমা এবং সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব! তোমরা নিজের জন্য নিজেই আমল করো। এটা মনে করো না যে, আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব। যে ব্যক্তি এসব বিষয় চিন্তা করবে, সে কখনো বংশমর্যাদার অহমিকা প্রকাশ করবে না। যদি আমি বিনয় ও নম্রতার ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করি তাহলে ঠিক আছে। নতুবা আমি নিজেই আমার উচ্চবংশের জন্য বদনামের কারণ এবং পূর্বপুরুষদের কলংকের কারণ। আমি নিজেই আমার অবস্থা দ্বারা নিজের বংশের দুর্নাম করছি। কেননা আমি ভালো বংশের কিন্তু তাদের বিনয়, নম্রতা আমি অনুসরণ করছি না।

এখন কেউ যদি বলে, রাসূলুল্লাহ (স) ফাতেমা ও সাফিয়্যা (রা)-কে বলেছিলেন, তোমরা আমার বংশের সাথে সম্পর্ক রাখো। কিন্তু একারণে আমি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারবো না। অবশ্য তোমাদের সাথে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। আমি এই সম্পর্কের অধিকার সজীব রাখার চেষ্টা করব।

বনু সুলাইমের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, তারা তো আমার সুপারিশের প্রত্যাশী। আবদুল মুত্তালিবের বংশের লোকেরা কী করবে না?

এ দুটি বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর নিকটবর্তী আত্মীয়দের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করবেন। সুতরাং এ দিক থেকে যদি বনু হাশেম তাদের বংশের কারণে এ ধারণা করে যে তাদের বংশ তাদের মুক্তির জন্য মাধ্যম হবে তাহলে সমস্যা কোথায়?

এর উত্তর হচ্ছে, প্রত্যেক মুসলমানই রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুপারিশের আশা রাখে। সে হিসেবে বনু হাশেমও রাখতে পারে। শর্ত হচ্ছে, সে আল্লাহর শাস্তির ভয় করতে হবে।

শাফাআতের দিক দিয়ে গুনাহ দুই প্রকার। কিছু গুনাহ এমন, যা আল্লাহর গজবের কারণ হয়। এধরনের গুনাহের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা জায়েয নয়। আর কিছু গুনাহ এমন রয়েছে, যা সুপারিশের কারণে মাফ করে দেওয়া হবে। যেমনটি দুনিয়ার রাজা— বাদশাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিছু কিছু অপরাধ বাদশার এমন ক্রোধের কারণ হয় যে কাছের মানুষরাও সুপারিশ করতে ভয় পায়। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার কিছু নাফরমানি এমন রয়েছে, যা সুপারিশ দ্বারা মাফ হবে না। শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى.

বরং তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য, যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। (সূরা আম্বিয়া : ২৮)

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ.

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? (সূরা বাকারা : ২৫৫)

لَّا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِىَ لَهٗ قَوْلًا.

দয়াময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন সে ব্যতীত কারও সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না। (সূরা ত্বহা : ১০৯)

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ.

ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোনো উপকারে আসবে না। (সূরা মুদ্দাসসির : ৪৮)

বোঝা গেলো, কিছু গুনাহ এমন রয়েছে, যে ক্ষেত্রে সুপারিশের কোনো সুযোগ নেই। তাই পরিণামের ভয় করা উচিত। যদি প্রত্যেক গুনাহের ক্ষেত্রে সুপারিশ গ্রহণ করা হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (স) কুরাইশদের আনুগত্যের আদেশ দিতেন না এবং না ফাতেমা (রা)-কে গুনাহ থেকে নিষেধ করতেন। বরং তাদের অনুমতি দিয়ে দিতেন যে, তোমরা দুনিয়ার মজা ভোগ করতে পারো। আর পরকালে আমি সুপারিশ করে বাঁচিয়ে নেবো। ফলে পরকালের স্বাদও ভোগ করতে পারবে।

গুনাহের সাগরে ডুবে থাকা আর সুপারিশের মাধ্যমে মুক্তি পেয়ে যাওয়ার আশা করা ওই অসুস্থ ব্যক্তির মতো, যে নিষিদ্ধ বিষয় থেবে বেঁচে থাকে না আর না ওষুধ সেবন করে। সে তার অভিজ্ঞ বিচক্ষণ ডাক্তারের ওপর ভরসা করে যে সে তো আমার খুব খেয়াল রাখে। কাজেই ওষুধ না খেলেও আমার কোনো ক্ষতি হবে না। আমার ডাক্তার আমাকে বাঁচিয়ে নেবে। এটা নিতান্তই জাহালত। সুস্থতার জন্য চেষ্টা অসুস্থ ব্যক্তিকেই করতে হবে। এমনই হচ্ছে আত্মীয় ও নিকটবর্তীদের অবস্থা এবং নবী ও নেক লোকেদের সুপারিশের বিষয়টি। যদি সে নিজের জন্য কোনো কিছু না করে থাকে তাহলে কারও সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না।

অপরদিকে সুপারিশের আশায় পরকালের ভয় থেকে নির্ভিক হয়ে যাওয়া মুমিনের শান নয়। সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের তাকওয়া, বিনয় থাকা সত্ত্বেও সর্বদা ভয়ে থাকতেন। আর পরকালের হিসাব থেকে বাঁচার জন্য এই আশা করতেন যে, যদি তারা পাখি, প্রাণী ইত্যাদি হয়ে যেতেন অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বিশেষভাবে তাঁদের জন্য এবং আমভাবে সকল মুসলমানের জন্য সুপারিশ করার ওয়াদা করেছেন। তারা রাসূলের এই কথার ওপর ভরসা করে বসে থাকেননি; বরং জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমল করেছেন এবং ভয়ও করেছেন। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের যদি এ অবস্থা হয় তাহলে লোকেরা কীভাবে সুপারিশ পাওয়ার আশায় অহংকার, আত্মপ্রীতিতে লিপ্ত হতে পারে, যারা না রাসূলের সাহাবির মর্যাদা অর্জন করেছে, না সুপারিশ পাবার কোনো অধিকার রয়েছে।

৫. অত্যাচারী রাজা-বাদশাহর বংশের লোক বলে আত্মপ্রীতি অনুভব করা। এটাও চরম অজ্ঞতা এবং এর প্রতিবিধান এই যে, সেই রাজা-বাদশাদের অত্যাচারের কথা চিন্তা করবে এবং এর কারণে তারা যে আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়ে জাহান্নামের খড়ি হয়ে গেছে এ কথাও চিন্তা করবে। কিয়ামতে তাদের করুণ একটি চিত্রও কল্পনা করবে যে, তারা যেসব লোকের ওপর অত্যাচার করেছিল, তারা তাদের জড়িয়ে ধরবে এবং ফেরেশতাগণ মাথার চুল ধরে উপুড় করে টেনে দোযখে নিয়ে যাবে। এটা কল্পনা করলে নিজেই আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে এবং বলবে— শূকর ও কুকুরের সাথে আত্মীয়তা করা ভালো— এদের সাথে নয়। মোটকথা, অত্যাচারী রাজা-

বাদশাদের বংশধরকে যদি আল্লাহ তাআলা অত্যাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, তবে তারা তার জন্য শোকর করবে। তাদের পিতৃপুরুষ মুসলমান হলে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে।

৬. অধিক সন্তানসন্ততি, চাকর-বাকর ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আত্মপুলক অনুভব করা। যেমন, হুনায়ন যুদ্ধে মুসলমানরা নিজেদের সৈন্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় বলেছিল, আজ আমরা পরাজিত হব না। এর প্রতিকার এটা ধ্যান করা যে, সব মানুষ আল্লাহর অক্ষম-অপরাগ বান্দা। কেউ নিজের লাভ-ক্ষতির মালিক নয়। আল্লাহ বলেন—

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ.

আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে! (সূরা বাকারা : ২৪৯)

সুতরাং সে কীভাবে অধিক সন্তান ও খাদেমের কারণে গর্ব করতে পারে? সে যখন মারা যাবে, সবাই তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। লাঞ্ছিত অপদস্থ অবস্থায় তাকে দাফন করানো হবে। তার সঙ্গে না তার সন্তান যাবে, না তার পরিবারে কেউ, না তার বন্ধু, আত্মীয়। তারা সকলে তাকে অর্পন করবে সাপ-বিচ্ছু পোকা-মাকড়ের খাবারের জন্য। তারা কেউ তার কোনো ফায়েদা দিবে না। অথচ এ সময় তাদের সাহায্য বেশি প্রয়োজন। এমনিভাবে তারা পরকালেও পলায়ন করবে। আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ. وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيْهِ. وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيْهِ.

সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতার কাছ থেকে এবং তার মাতা, তার পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে। (সূরা আবাসা : ৩৪-৩৬)

এখন ভাবুন, ওই ব্যক্তি, যে আপনার কঠিন পরিস্থিতিতে পালিয়ে যাবে এবং কোনো কাজে আসবে না। সুতরাং তাদের নিয়ে গর্ব করার কী আছে। তারা না কবরে ফায়দা দিবে, না কিয়ামতের দিন, না পুলসিরাতের সময়। তখন শুধু আমল ও আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহই কাজে আসবে।

৭. ধনসম্পদ নিয়ে আত্মপুলক অনুভব করা। যেমন— রাসূলুল্লাহ (স) একবার দেখলেন, এক ধনী ব্যক্তির নিকট এক ফকির এসে বসতেই সে

তার কাপড় গুটিয়ে নিল। নবীজী (স) ধনী লোকটিকে বললেন, তুমি কি ভাবছো যে, তার দরিদ্রতা তোমার মধ্যে সংক্রমিত হয়ে যাবে? হ্যাঁ, এটা ছিল ধনসম্পদের আত্মপুলক। এর প্রতিবিধান এই যে, ধনসম্পদের বিপদাপদ, এতে অন্যের হকের আধিক্য, ফকিরদের ফযিলত এবং জান্নাতে তাদের অগ্রগামিতার কথা চিন্তা করবে। আরও চিন্তা করবে যে, সকালে ধনসম্পদ আসে, বিকালে চলে যায়। এর কোনো মৌলিকতা নেই। অনেক কাফের অঢেল ধনসম্পদের মালিক। এক ব্যক্তি পরিধেয় পোশাকের কারণে নিজের ভিতর গর্ব বোধ করছিল তখন আল্লাহ তাআলা মাটিকে আদেশ দিলেন। ফলে সে মাটির নিচে ধসে গেল এবং কিয়ামত পর্যন্ত এমনি অবস্থায় নিচের দিকে যেতেই থাকবে। (সহিহ বুখারী : ৫৭৮৯)

এই হাদিসে আত্মপ্রীতির শাস্তির বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে।

আবু যর (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে বললেন, হে আবু যর! তোমার মাথা উঠাও। আমি আমার মাথা উঠালাম। তখন ভালো পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। অতঃপর বললেন, মাথা উঠাও। আমি মাথা উঠালাম। তখন এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার গায়ে পুরাতন কাপড় ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে আবু যর! এটা আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং এ ব্যক্তি জমিনের বুকে আল্লাহর পছন্দনীয় ব্যক্তি।

সম্পদের ক্ষতি, দুনিয়ার অনিষ্টতা ও দুনিয়াবিমুখতার পর্বে আমরা যা কিছু উল্লেখ করেছি তাতে ধনীদের তুচ্ছ ও দরিদ্রদের মর্যাদার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই মুমিন তার সম্পদের মাধ্যমে কীভাবে গর্ব করতে পারে? বরং তার তো ভয়ে থাকা উচিত যে সম্পদের যে হক রয়েছে তা সে সঠিকভাবে আদায় করতে পারছে কি না। অর্থাৎ, সৎ পথে উপার্জন ও বৈধ খাতে তা ব্যয় হচ্ছে কি-না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার পরিণাম লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা। কাজেই সে কীভাবে আত্মপ্রীতি ও গর্ব দেখায়।

৮. নিজের ভ্রান্তমত নিয়ে আত্মপুলক অনুভব করা। এ ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেন—

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا.

কাউকে যদি তার মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয় এবং সে একে উত্তম মনে করে, (সে ব্যক্তি কি তার সমান যে সৎকর্ম করে?) (সূরা ফাতির : ৮)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

তারা মনে করে, তারা সৎকর্মই করছে। (সূরা কাহফ : ১০৪)

নবী কারীম (স) ইরশাদ করেন— এ উম্মতের শেষ যুগে ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপ্রীতি হবে। এ সর্বনাশা বদ স্বভাবের কারণে পূর্ববর্তী উম্মতগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। কেননা, এর কারণেই নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়েছে। সকলেরই বিশ্বাস যে, সে-ই খুব জ্ঞানী। এরপর সে তার মত ও পথ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। জগতে অনেক বিদআতী ও পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নিজ নিজ বিদআত ও পথভ্রষ্টতাকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকে। এর কারণ এটাই যে, তারা নিজেদের ভ্রান্ত মত নিয়ে আত্মপুলকে মত্ত।

বিদআত নিয়ে আত্মপুলকের অর্থ এই যে, যে বিষয়ের প্রতি মোহ ও মন ধাবিত হয়, তাকে ভালো ও সত্য বলে মনে করা। এ প্রকার আত্মপুলকের প্রতিবিধান তুলনামূলক কঠিন। কারণ, যার মতামত ভ্রান্ত, সে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে। সুতরাং সে যাকে অসুখ বলেই মনে করে না, তার চিকিৎসা কীভাবে করবে? কিন্তু যারা সাধক তারা মূর্খতা সম্পর্কে অবহিত করতে পারে এবং তা দূর করতে পারে। যদি সে অজ্ঞতা নিয়েও আত্মপুলকতা লাভ করতে থাকে, তবে সাধকের কথায়ও কান দেবে না। বরং সাধককেও দোষী জ্ঞান করবে। এমতাবস্থায় তার চিকিৎসা কী করে হবে? এরও একটি মোটামুটি চিকিৎসা আছে। তা এই যে, প্রত্যেকেই নিজ মতকে অভ্রান্ত মনে করবে না; বরং বিশ্বাস করবে যে, তার মতও ভুল হতে পারে।

নিজের মতের ওপর ধোঁকা খেয়ো না। তবে যদি কুরআন, সুন্নাহর স্পষ্ট দলিল অথবা সঠিক আকলি দলিল থাকে, যার মাঝে দলিল হওয়ার শর্তসমূহ বিদ্যমান। মানুষ শরিয়তের দলিল ও শর্তসমূহ এবং ভুল হওয়ার

স্থানের ব্যাপারে জন্মগত মেধা ছাড়া পরিচয় লাভ করতে পারে না এবং এর জন্য আরও প্রয়োজন বিচক্ষণতা, কঠোর পরিশ্রম, কুরআন সুন্নাহর অধ্যয়ন, দীর্ঘসময় জ্ঞানী ব্যক্তিদের সাহচর্য। এরপরও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সত্য ওই ব্যক্তির সাথে রয়েছে, যে পূর্ণজীবন ইলমের জন্য বিলীন করে দিয়েছে।

এছাড়া বিরোধপূর্ণ মাযহাবগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবে না; বরং বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ এক। তাঁর কোনো শরীক নেই। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। তাঁর রাসূলুল্লাহ (স) সত্য। তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তা সত্য এবং অনুসরণ করবে সালাফের সুন্নত এবং কিতাব ও সুন্নায় বর্ণিত বিষয়ে ঈমান রাখবে, কোনো সংশয় ও প্রশ্ন ব্যতীত; বরং বলবে, ঈমান এনেছি এবং সত্যায়ন করেছি এবং তাকওয়া অবলম্বন করবে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, মুসলমানদের ওপর মেহেরবানি করবে। যদি সে মাযহাব ও পক্ষপাত নিয়ে ডুবে থাকে তাহলে সে অজান্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ বিধান হচ্ছে ইলম ব্যতীত অন্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তির জন্য। আর যে ইলম নিয়ে মগ্ন থাকতে চায় তার প্রথম কাজ হচ্ছে দলিল ও তার শর্তসমূহ জানা। বিশ্বাস ও দৃঢ়তা অর্জন কঠিন। তবে যাদের আল্লাহ নূর দ্বারা শক্তিশালী করেছেন তাদের জন্য সহজ। তাদের পরিমাণ কমই। আল্লাহ আমাদের সকলকে যাবতীয় ভ্রষ্টতা থেকে হিফাজত করুন!

[একাদশ খণ্ড সমাপ্ত]

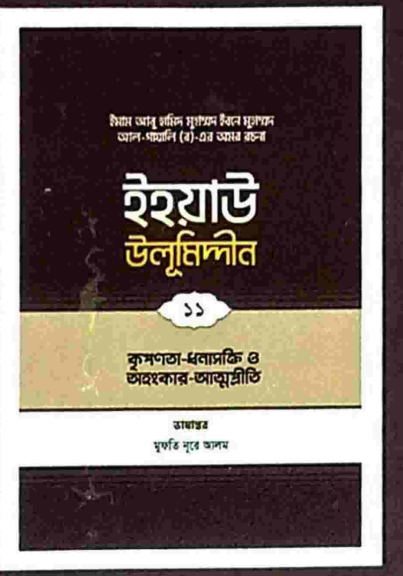

ISBN : 978-984-558-026-7

দারুত তাকবীর

কর্পোরেট অফিস : ৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা) ভি আই পি রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ০৯৬১০৬৬৬০০৬, ০১৯৯১-১৮১২০৪
বিক্রয় : বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৯৩৮-৮৫৫৯৯২, ০১৯৩৮-৮৫৫৯৭৯, ০১৯৩৯-৯১৯৩২১
ই- মেইল : info@daruttakbeer.com

10114012940140208-7736

পরিবেশক : বাংলাপ্রকাশ
৩৮/২-খ, তাজমহল মার্কেট (নিচ তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইনে পরিবেশক : BOIBAZAR.com
Hotline No: 09611262020

রকমারি.com